ইসলামের দৃষ্টিতে

শান্তি ও যুদ্ধ

মূল : মজিদ কাদ্‌দুরী

অনুবাদ : অধ্যাপক হাসান জামান

গ্রন্থাকার পরিচিতি

১৯০৯ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর ইরাকের মসুলে মজিদ কাদ্‌দুরীর জন্ম হয়। ১৯৩২ সালে তিনি বৈরুতে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি. এ. এবং ১৯৩৮ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যয়নকাল শেষ হওয়ার পর তিনি তাঁর স্বদেশ ইরাকে ফিরে যান এবং বাগদাদের আইন কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই শিক্ষাকেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং যথাক্রমে ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি জোন্স হপ্‌কিন্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সম্পর্কিত উচ্চতম শিক্ষা-সংস্থার একটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। মধ্যপ্রাচ্য-সংস্থার গবেষণা ও শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর হিসেবেও কাদ্‌দুরী কাজ করেন। ১৯৪৬ সালে সানফ্রান্সিসকোয় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ-সম্মেলনে তিনি ইরাকী প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ইরাক সরকার চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 'রাফিদাইন' পদক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। ১৯৫৪ সালে কাদ্‌দুরী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ওয়ার এ্যান্ড পীস ইন দি ল' অফ ইসলাম' (ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ) এবং 'ইন্ডিপেনডেন্ট ইরাক' ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছে।

মজিদ কাদ্‌দুরী রচিত

ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ

মজিদ কাদ্‌দুরী রচিত

ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ

অনুবাদ : অধ্যাপক হাসান জামান

পুনর্দর্শন ঃ মওলানা মুস্তাফীজুর রহমান

স্বত্ব
প্রকাশক

জ্ঞান বিতরণী প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১০

প্রচ্ছদ
সুব্রত সাহা

প্রকাশক
মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১৭১৩৯৬৯

অক্ষরবিন্যাস
এন জেট কম্পিউটার
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা) ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ডি. এ. অফসেট প্রিন্টার্স
২৭, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (নীচতলা), ঢাকা
১৯১, মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
২০০ টাকা U.S $ 5.00

This is an authorized Bengali titled Islamer Dristite Shanti O Judda translation of War & Peace in the Law of Islam by Majid Khadduri. Bengali translation Professor Hasan Zaman, Published by Mohammad Shahidul Islam, Gyan Bitaroni, 38/2-Ka Banglabazar, Dhaka-1100, Tel : 71713969

ISBN: 984-8747-61-3

প্রকাশকের কথা

'ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ' গ্রন্থখানি মজিদ কাদ্দুরী রচিত 'ওয়ার অ্যান্ড পীস ইন দি ল অফ ইসলাম' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। বঙ্গানুবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ড. অধ্যাপক হাসান জামান। গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের জুন মাসে। ঢাকাস্থ তৎকালীন ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশনসের সহায়তায় গ্রন্থখানি প্রকাশ করে দারুল উলুম ইসলামিক একাডেমী। অনূদিত এ গ্রন্থখানি এখন দুস্প্রাপ্য।

ইসলামের আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটা সামগ্রিক রূপ এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি ও যুদ্ধের প্রশ্নটি এখনো নানাভাবে আলোচিত হয়। এ বিষয়টি এ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে। এতে অনেকের ভুল ধ্যান-ধারণার অবসান হবে নিঃসন্দেহে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রাথমিক ইতিহাস ও এর ধারাবাহিক অগ্রগতির সাথে ইসলামের সমাজ-ব্যবস্থার শুরু ও বিকাশের যোগসূত্র গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ গ্রন্থে। সামাজিক অগ্রগতির ধারায় যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়ে ইসলাম ধর্মের নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে যে দিকনির্দেশ আছে তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অজানা ওই বিষয়গুলো জানার জন্য এ গ্রন্থখানির অবদান তুলনাহীন।

দুস্প্রাপ্য এ গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যাপারে বিশিষ্ট অনুবাদক ও লেখক জনাব আবু জাফরের প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই। গ্রন্থখানি প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমরা মরহুম অধ্যাপক ড. হাসান জামানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

আমাদের দেশের খ্যাতিমান লেখকগণের দুস্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি পুনঃপ্রকাশের প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এ গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হলো। আমরা সহৃদয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করছি।

অনুবাদক পরিচিতি

ড. হাসান জামান (১৯২৮—১৯৮১)। পুরো নাম আবুল হাসান মুহাম্মদ নুরুজ্জামান। শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি মাগুরা জেলার তারা উজিয়াল গ্রামে। ১৯২৮ সালের ১ জানুয়ারি তিনি ঝিনাইদহ জেলার কাঁচেরকোল গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যশোহর শহরের পুরাতন কসবায় তাঁর পৈত্রিক বাড়ি আছে। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ মুসা; তিনি ছিলেন রেজিস্ট্রার অফ অ্যাস্করেন্সেস।

অধ্যাপক হাসান জামান নড়াইল হাইস্কুল, যশোহর জিলা স্কুল ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে অ্যাস্টারিস্ক (Asterisk) নম্বর (শতকরা ৭৫ ভাগের অধিক নম্বর) এবং কয়েকটি বিষয়ে লেটার মার্কসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে আই এ পাশ করে প্রথম গ্রেডের বৃত্তি ও কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে অ্যান্ডারসন গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। তিনি ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে বি. এ. (সম্মান) (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্ত র্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। রক ফেলার ফাউন্ডেশনের ফেলো (১৯৬১—৬৪) হিসেবে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Rise of the Muslim Middle Class as Political Factor in India and Pakistan (1854—1947) শীর্ষক গবেষণামূলক সন্দর্ভ রচনার জন্য পি. এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে তিনি ১৯৫২ সালের ২২ জানুয়ারি লেকচারার পদে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৫৪ সালের ২১ জানুয়ারি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার এবং ১৯৬৫ সালে 'রীডার' হন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তান কাউন্সিলের ঢাকাস্থ অফিসে ভাইস চেয়ারম্যান এবং জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার পরিচালক হিসেবে ডেপুটেশনে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভিন্ন মতাদর্শের কারণে তিনি কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৭২ সালের ১২ মে তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালে তিনি সৌদী আরব যান এবং জেদ্দায় অবস্থিত বাদশাহ আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট (Assosiate) নিযুক্ত হন। গবেষণা কাজের জন্য তিনি মাঝে মাঝে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। ১৯৮১ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেদ্দা ফেরার পথে তিনি লন্ডনে মারা যান (২৪ আগস্ট)। তাঁকে মক্কায় দাফন করা হয়।

ড. হাসান জামান একজন মননশীল লেখক ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি সব সময় বাঙালি মুসলমানদের স্বাধীন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে আছে ঃ পলিটিক্যাল সাইন্স অ্যান্ড ইসলাম, দি সিকিউলার স্টেট অ্যান্ড ইসলাম, বেঙ্গলি এ্যাজ এ ভিকল অব অ্যাবস্ট্রাক্ট থট, দি কনসেপ্ট অব মাইনরিটি, ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ (অনুবাদ), কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম, সমাজ-সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইসলামী অর্থনীতি, শতাব্দী পরিক্রমা (সম্পাদনা), অমর একুশে (সম্পাদনা), প্রোডিউস অব পেরিস (সম্পাদনা) ইত্যাদি।

আমাদের কথা

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গতিধারা এবং এর ক্রমবিকাশের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শনের ওপর এই শতকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রখ্যাত ইরাকী রাষ্ট্রদর্শনবেত্তা মজিদ কাদ্‌দুরীর War and Peace in the Law of Islam (ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ) বইটি নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান অবদান।

রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার গোড়ার ইতিহাস এবং এর ক্রমপ্রসারের ধারার সঙ্গে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন ও বিকাশের যোগসূত্রের ধারাবাহিক পর্যালোচনাই এই বইটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে কাদ্‌দুরী প্রমাণ করেছেন যে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ইতিহাসে পাশ্চাত্য দার্শনিক টমাস হবসের তিনশ' বছর আগে মুসলিম সমাজ-বিজ্ঞানী ইবনে খালদুনই মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ-ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন।

ইসলামের আন্তর্জাতিক রূপ ও ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটা সামগ্রিক ছবি এ বইটিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া, বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি ও যুদ্ধের প্রশ্নটি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সমাজ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতির আদি ইতিহাস থেকে শুরু করে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এতে সন্নিবেশিত হয়েছে ঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের আইনগত ভিত্তি, আল্লাহ-প্রদত্ত সার্বজনীন আদর্শ রাষ্ট্রতন্ত্র, আইনের প্রকৃতি ও উৎস এবং ঐতিহ্যগত আইন ও ইসলামী আইনের ব্যবধান, ইসলামী আইনের স্বরূপ, ইসলামী আইন ও সার্বজনীন সামাজিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে জেহাদ ও জেহাদের তাৎপর্য এবং জেহাদ ও সাধারণ যুদ্ধের পার্থক্য, ইসলামী রাষ্ট্রের দেশরক্ষা-ব্যবস্থা, যুদ্ধ-পরিচালনার পন্থা, সেনা সংগঠন, নৌ-যুদ্ধ পরিচালনা ও মুসলিম সামুদ্রিক আইন, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি এবং যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ বণ্টনের নীতি, যুদ্ধবন্দী ও দাসদের প্রতি ব্যবহার এবং বন্দী-মুক্তি ও দাস-মুক্তির নীতি, যুদ্ধ-সমাপ্তির নীতি, শান্তি-আইনের সংজ্ঞা ও নীতি, 'দারুল হারব' ও 'দারুল ইসলামে'র সংজ্ঞা দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সম্পর্ক, বিভিন্ন জাতির সাথে স্বাক্ষরিত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং বিভিন্ন যুগের খলিফাগণ ও রাষ্ট্র প্রধানদের ঐতিহাসিক সনদসমূহের বিবরণ, কিতাবী (গ্রন্থধারী ধর্মীয় সম্প্রদায় ঃ ইহুদী, খৃস্টান প্রভৃতি), হারবী (দারুল হারব বা অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক) ও জিম্মীদের (নিরাপত্তার সামগ্রিক অধিকারপ্রাপ্ত দারুল ইসলামের নাগরিক) সাথে সম্পর্ক, বৈদেশিক নাগরিকদের নিরাপত্তার সনদ বা পাসপোর্ট, অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকদের কার্যক্রম, সন্ধি ও সন্ধির আইনগত ভিত্তি, ইসলামী রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নীতি, আন্তর্জাতিক

কূটনৈতিক সম্পর্ক, ইসলামী রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ইসলাম ও নিরপেক্ষতা, বিশ্ব-রাজনীতির বিবর্তনের ধারায় ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবর্তিত নীতি, বিশ্বের সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে মুসলিম রাষ্ট্রের ভূমিকা, আধুনিক রাজনৈতিক গতিধারা এবং আইন ও রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদের নীতি ও ইসলাম প্রভৃতি।

অন্যান্য সাধারণ সূত্র ছাড়াও মজিদ কাদ্দুরী তাঁর এ বইটির বিষয়-বস্তু, প্রামাণ্য-সূত্র ও তথ্যাদি প্রধানতঃ গ্রহণ করেছেন কোরআন, হাদিস, ইসলামী ইতিহাস, রাষ্ট্রদর্শন, অর্থনীতি, সমরনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, বিভিন্ন মাযহাবী বিধান ও ফিকাহ্ শাস্ত্র হতে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সুন্নাহ ও বিভিন্ন সনদ, সাহাবী ও খলিফাদের কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সময়কার প্রবর্তিত আইনের বিধান ছাড়াও ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মালিক. ইমাম শাফেয়ী, ইমাম ইবনে হামবল, ইমাম বোখারী, ইমাম মোসলেম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইবনে খালদুন, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হিশাম, বালাযুরী, আবু রুশদ, মাওয়ার্দী, নাসাফী, তাবারী, সারাখসী, ওয়াকিদী, ইয়াকুবী, তুরতুশী শায়েবানী প্রমুখ প্রখ্যাত ইসলামী শাস্ত্রবেত্তা ও দার্শনিক মনীষীদের লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থাদি এবং অভিমত হতেও তথ্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে।

তবে, এ প্রসঙ্গে এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলামী আইন ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্পর্কে মজিদ কাদ্দুরী বিভিন্ন মতের বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, বিভিন্ন দলিল ও সনদের তাৎপর্য সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, বহু ক্ষেত্রেই তাঁর সাথে আমাদের ইসলামী চিন্তাবিদগণ হয়তো একমত হতে পারবেন না। কারণ জাতিতে আরব, আরব তাহজিব-তমদ্দুনের অনুসারী এবং ইসলাম সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন হলেও কাদ্দুরী ধর্মের দিক থেকে ঈসায়ী; কাজেই ইসলামী জীবন-দর্শনের তাৎপর্য অনুধাবনে তাঁর সঙ্গে যে ইসলাম-মতাবলম্বী দার্শনিক ও রাষ্ট্রবেত্তাদের কিছুটা মতভেদ থাকবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু তবু সল্প-পরিসরে সুসমঞ্জস পর্যালোচনার মাধ্যমে ইসলামের সামগ্রিক মূল্যবোধের বিচারের দিক থেকে এটি যে একটি অসাধারণ সৃষ্টি, তা অনস্বীকার্য। আমরা মনে করি, আমাদের সুধীসমাজ, চিন্তাবিদ ও আইনবিদগণ, বিশেষ করে ইসলামী চিন্তাবিদগণ এবং রাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর ছাত্রগণও বইটি হতে বহু মূল্যবান তথ্য ও জ্ঞানানুশীলনের যথেষ্ট খোরাক পাবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক জনাব হাসান জামানের হাতে বইটির অনুবাদও আশানুরূপ হয়েছে বলে আমরা মনে করি। বাংলা ভাষায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ অবদানটির অনুবাদ নিঃসন্দেহে আমাদের সাহিত্যের একটি বিরাট সংযোজন। সুধী সমাজে বইটির যথার্থ কদর হবে বলে আমরা মনে করি।

ঢাকা
২২শে জুন, ১৯৬০।

ডিরেক্টর, ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশান্স,
ঢাকা।

পেশ কালাম

ইসলাম মানব-সমাজের পক্ষে একটা কল্যাণকর কর্মপন্থা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আমলে উহার পরিপূর্ণতা ঘটিলেও উহার ব্যাপ্তি এবং বিস্তৃতি প্রকাশ পায় তাঁহার ওফাতের পর। বাস্তবক্ষেত্রে উহা একটি মাযহাব, রাষ্ট্র ও তৎসমন্বয়ে উদ্ভূত একটা তমদ্দুন। এই ত্রিবিধ-ধারায়ই উহার সত্যিকার রূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে — গড়িয়া উঠিয়াছে উহার বিরাট গৌরবের সৌধ।

মূলতঃ এই বিধানের বাস্তবায়নের ব্যবস্থা যেমন হইয়াছিল হযরতের জামানায়, তেমনি উহার নীতি ও বিধি সম্পর্কীয় হুকুম-আহকামের বিস্তৃতি দেখিতে পাওয়া যায় পরবর্তীকালে বিভিন্ন জনপদে এশায়াতে-ইসলামের সাথে। এই বাস্তবায়নের বিধিই সাধারণতঃ এলমে ফিকহ নামে অভিহিত। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জামানায় এই শাস্ত্রের বীজ অঙ্কুরিত হইলেও উহা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে তারপর। শেষ পর্যন্ত উহাই ইসলামের কার্যবিধির রূপ গ্রহণ করে। এই সকল বিধি-বিধানের বেলায় কোন কোন আনুষঙ্গিক বিষয়ে ইমাম ও চিন্তানায়কদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলেও মৌলিক বিষয়সমূহে কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ছিল ঐক্য। প্রাথমিক জামানায় মদীনা, মক্কা, মিসর, বসরা, ইয়ামন, সিরিয়া প্রভৃতি দেশেই এই এলেমের চর্চা আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে সারা মোসলেম জাহানেই উহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

এই প্রসঙ্গে ইমাম মালেক ইবনে আনাস, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইদরীস-শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবু ইউসুফ মোহাম্মদ ইয়াকুব, ইমাম মোহাম্মদ, ইমাম যফর প্রমুখ ইমাম ও মোজতাহেদগণের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি—ইসলাম একটা ধর্ম, রাষ্ট্র এবং তমদ্দুন। এর কতকগুলো সত্যিকার ও কল্যাণকর আইন-কানুন রহিয়াছে। হযরতের ওফাতের সাথে সাথে পৃথিবীর তিনটি মহাদেশে এর বিস্তৃতি ঘটে। সুতরাং, স্বভাবতঃই এর একটা বহির্দেশ সম্পর্কীয় বিভাগ উদ্ভুত হয়। দুনিয়ার কোন কল্যাণকর বিধি-ব্যবস্থাই কেবল হিতপদেশে কার্যকরী হইতে পারে না! ইসলামের ক্ষেত্রেও এই কথা সত্যি। এই কারণেই ইসলামে জেহাদ বা ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের অনুমতি রহিয়াছে—যা অবস্থা বিশেষে অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়ে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, ইসলামে যেমন ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের স্বীকৃতি রহিয়াছে, তেমনি আবশ্যকমত সুলহে বা সন্ধির কথাও রহিয়াছে। এই জেহাদ

এবং সুলহে তথা যুদ্ধ এবং শান্তির পরিপ্রেক্ষিতেই দারুল-ইসলাম, দারুল-হারব, দারুস-সুলহে, দারুল-আমান, জিজিয়া, খারাজ, ওশোর ইত্যাদি পরিভাষার সৃষ্টি হয়। ইসলামের বিধান পুস্তকসমূহে এই সব পরিচ্ছেদের ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হইয়াছে।

আল-কোরআনই ইসলামী আইন-কানুনের বুনিয়াদ। পরবর্তীকালে হাদিসসমূহে উহাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অতঃপর এলমে ফিকহে উহা নিছক বিধানের আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই শাস্ত্রে বিভিন্ন ইমাম ও মোজতাহেদগণের মতে উহা দেখা দেয় বিভিন্ন আকারে।

কিতাবুল জেহাদ বা ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের কথা যে কোন হাদিসগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য বাব (অধ্যায়)। যে কোন হাদিসের কিতাবে আমরা জেহাদ প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের সন্ধান পাই ঃ সমরোপকরণের ব্যবস্থা, জেহাদ উপলক্ষ্যে বিদেশ ভ্রমণের নিয়ম, কাফেরদের নিকট পয়গামে-ইসলাম সম্পর্কীয় পত্র প্রেরণ, যুদ্ধক্ষেত্রের নিয়মসমূহ, যুদ্ধবন্দী সম্পর্কীয় বিধান, আল-আমান বা অভয় দান, গনিমতের মাল বণ্টন করা, জিজিয়া, সুলহে বা শান্তিচুক্তি, আরব উপদ্বীপ হইতে ইহুদীগণকে বহিষ্কার করার কথা ইত্যাদি বিষয়সমূহ।

হাদিসের কিতাবসমূহের উপরোল্লিখিত বাবসমূহ হইতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইসলামে যেমন আবশ্যকমত ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের অনুমতি রহিয়াছে তদ্রূপ সময়মত দুশমনের সাথে সুলহে বা সন্ধি করার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

এই বিষয়টি পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে আলোচনায় আসিয়াছিল বিভিন্ন দেশে—বিশেষতঃ ইউরোপে ইসলামের বিস্তৃতির সাথে। বলাবাহুল্য, সবদেশেই বিশেষ করিয়া ইউরোপে এ ব্যাপারে পূর্ব হইতে অল্প-বিস্তর বিধিবিধান প্রচলিত ছিল।

সেই সময় স্বভাবতঃই এই দুই রকমের বিধানের মধ্যে একটা সমঝোতার সওয়াল উঠে। এবং প্রশ্নটা দেখা দিয়াছিল এইরূপে যে, কোন্ বিধি কল্যাণকর এবং চিরস্থায়ী? তখন বিচার-বিবেচনায় দেখা গেল যে, ইসলামী আইন-কানুনসমূহ আপন মহিমায় মহীয়ান এবং কল্যাণ-প্রশ্নে চিরঞ্জীব। বিস্তারিত

এই প্রসঙ্গে মজিদ কাদ্দুরীর War and Peace in the Law of Islam নামক কিতাবে এই বিষয়ে বিস্তারিত ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে। ইতিপূর্বে কায়রো এবং তেহরান হইতে পুস্তকখানার যথাক্রমে আরবী এবং ফারসী তর্জমা প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তকখানার আলোচ্য বিষয়সমূহের প্রতি নজর করিলেই উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। পুস্তকের আলোচ্য-বিষয়সমূহের মূল উৎস আরবী কিতাবসমূহ। পুস্তকের আন্তর্জাতিক খ্যাতির মূল কারণ উহার বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা-পদ্ধতি। লেখক একজন অমুসলমান। তাঁহার রচনায় মুসলিম লেখকদের মত ভক্তিরস না থাকিলেও স্পষ্ট বিদ্বেষের কোন প্রমাণও লক্ষিত হয় না। কোথাও তাহা প্রচ্ছন্ন আকারে থাকিলেও পাঠকবৃন্দ উদার-চিত্তে তাহা গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। এই সকল রচনার উদ্দেশ্য যাহাই হয় না কেন, উহার ফলে ইসলামী বিষয়সমূহের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়।

কিতাবখানার বাংলা তর্জমা করিয়াছেন অধ্যাপক হাসান জামান। জনাব হাসান জামানের কেবল চিন্তাই স্বচ্ছ নহে, বরং ভাষাও জোরাল এবং সাবলীল। স্থানীয় ফ্রাঙ্কলিন কর্তৃপক্ষ পুস্তকখানার বাংলা তর্জমা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের একখানা মাগরেবী পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওয়াকেফ হওয়ার মওকা দিলেন। এই কাজের জন্য তাঁহারা মোবারকবাদের যোগ্য।

আমরা কিতাবখানার প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

আরজ গোযার
মুস্তাফীজুর রহমান (মমতাযুল মোহাদ্দেসীন)
মোদারেস, আলীয়া মাদ্রাসা, ঢাকা।

ঢাকা ঃ
২২ শে জানুয়ারী, ১৯৫৯ ইং।

---

* মরহুম মওলানা মুস্তাফীজুর রহমান (মমতাযুল মোহাদ্দেসীন) এই বইটির পুনর্দর্শনের কাজ করেন। কিন্তু আমাদের কি দুর্ভাগ্য! বইটি প্রকাশের পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন (ইন্না লিল্লাহে....)। এখন বইটি প্রকাশকালে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর এই মহত্তর প্রচেষ্টার কথা স্বীকার করতে যেয়ে ইসলামী সাহিত্য-সাধনা তথা সামগ্রিকভাবে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা তাঁর শূন্যতা গভীরভাবে অনুভব করছি। বিয়োগ-ভারাক্রান্ত মনে আমরা তাঁর পবিত্র রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

বিষয় সূচী

প্রথম খণ্ড

মুসলিম আইনের মৌলিক চিন্তাধারা

প্রথম অধ্যায়
রাষ্ট্রনীতি

সমাজ ও রাষ্ট্র

গ্রীক দার্শনিকদের মত মুসলিম চিন্তাবিদরাও একথা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন যে, মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব। শুধু সমাজবদ্ধভাবেই সে বেঁচে থাকতে পারে। একমাত্র আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর কেউ একা বাস করতে পারে না। মানুষের জন্ম হয়েছে একত্রে সমাজবদ্ধভাবে বাস করার জন্য। রাসূলুল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জামানা থেকে শুরু করে (৬৩২ খৃস্টাব্দ) ইবনে খালদুন অবধি (১৪০৬ খৃস্টাব্দ) সব মুসলিম চিন্তানায়কই ব্যক্তির দাবী-দাওয়া, কর্তব্য ও আনুগত্যকে সব সময়েই বৃহত্তর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। হাদিসে কথিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মুসলিম সমাজকে একটি অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ঃ দৃঢ়-সংবদ্ধ ইটের সমষ্টি যেন এক সুসংবদ্ধ প্রাচীর রচনা করে রয়েছে। আল-কোরআনে মুসলিম সমাজকে সুমহান আল্লাহর কর্তৃত্বের সার্বজনীন আনুগত্য দ্বারা আবদ্ধ একটা পৃথক জাতি (উম্মা) বা ভ্রাতৃত্ব ("ইখওয়াত")-রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উম্মা বা ইখওয়াতের প্রত্যয় হল ইসলামী-ভিত্তি। আর এ সমাজের অন্যতম সদস্য হওয়ার ওপরেই মু'মিনের পার্থিব সমৃদ্ধি ও পারলৌকিক মুক্তি বা নাজাত নির্ভর করে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও মদিনাবাসীদের সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, তাতে মুসলিম সমাজকে "অন্যান্য আর সব জাতি থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র জাতি"রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এ সমাজে গোষ্ঠীগত তথা সর্বপ্রকার আনুগত্যের ওপরে স্থান ছিল মুসলিম ইখওয়াত বা ভ্রাতৃত্বের। চুক্তিটার অপর এক অংশে লেখা ছিল ঃ "আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত নিরাপত্তা দীনহীন ক্ষুদ্রতম মু'মিনের প্রতিও সমানভাবে প্রযোজ্য। ইখওয়াতের সদস্যদের মধ্যে কোন সামাজিক বিভেদ বা ভেদ-বিচার নেই। কারণ, যদিও আল্লাহ তোমাদের নর-নারী এবং বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন, তবু পুণ্যপ্রাণতা ও তাকওয়া ভিন্ন তিনি তাদের মধ্যে আর কোন পার্থক্যের স্বীকৃতি দেন নি।" উম্মা সম্পর্কীয় এ প্রত্যয়ের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বীজ লুকিয়েছিল। বিষয়টা পরে আলোচনা করা যাবে।

পৈত্রিক, আচারগত বা ধর্মীয় বন্ধন যাই থাকুক না কেন, প্রাচীন সমাজের ইতিহাস থেকে একথা সহজেই জানতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে গোষ্ঠীগত সংহতির ওপরেই সব চাইতে বেশী জোর দেয়া হত। তখনকার দিনে ব্যক্তির মূল্য ছিল নিতান্ত সামান্য। কারণ, জীবিকা সংস্থানের ব্যাপারে ব্যক্তি ছিল একেবারেই অক্ষম। বহিঃশত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতাও তার ছিল না। কেবলমাত্র নিজের পরিবার বা গোষ্ঠীগত আচার ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে সে নিজেকে রক্ষা করবার ভরসা

পেত। আদর্শ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় আল-ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খৃস্টাব্দ) এমন এক সমাজব্যবস্থার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যার কল্যাণে ব্যক্তি দৈহিক ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

আল-ফারাবী বলেন ঃ মানুষের জন্য যা খুব বেশী দরকারী, তা অন্যের সাহায্য ছাড়া অর্জন করার ক্ষমতা তার নেই। এটা খুবই স্বাভাবিক। মানুষ যদি তার স্বভাবকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করতে চায়, তবে তাকে সমাজ বা কওমের একজন হিসেবেই বাস করতে হবে এবং সমাজের আর দশজনের সঙ্গে তাকে সহযোগিতা করতে হবে।

জীবন-যুদ্ধে জয়ী হবার জন্যই যে কেবল সমাজ মানুষের জন্য অপরিহার্য তাই নয়, একমাত্র সমাজব্যবস্থার মাধ্যমেই কর্তৃত্বের ভূমিকা সম্ভব হতে পারে। অর্থাৎ কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা ব্যতীত সমাজ বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। ইসলামী সমাজ বা উম্মার প্রত্যয়ের পেছনের সার্বভৌম আইনপ্রণেতা আল্লাহর দেয়া কতকগুলো নির্দেশনামা ধরে নেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার এগুলোই মৌলিক আইন বা গঠনতন্ত্রের মূল ভিত্তি বলে বিবেচিত হয়। এ আইনকে অপরিহার্য বলে মনে করা হয়েছে; কারণ, ক্ষমতা ছাড়া মানবসমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। যদিও মানুষ স্বভাবতঃ সামাজিক জীব, তবু সে সব সময়ে সদাচারী হতে পারে না। তাইত' আল্লাহ ঘোষণা করেছেন — "মানুষ একে অপরের দুশমন; একজনকে দিয়ে আর একজনকে আল্লাহ যদি ঠেকিয়ে না রাখতেন, তবে দুনিয়াটা দুর্নীতিতে ভরে যেত।" ক্ষমতার মাধ্যমেই মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। আর আইনের মারফত সে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সহজ-সরল পথ-নির্দেশ করাই আইনের কাজ। 'শরিয়ত কথাটির অর্থও ত' তাই। ক্ষমতা হল আইনের বাস্তব রূপায়ণের মৌলিক ও কার্যকরী সমর্থন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খৃস্টাব্দ) ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শেষটায় মন্তব্য করেছেন ঃ

"মানুষের পক্ষে সমাজ-বন্ধন বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ, মানুষকে এমনভাবে পয়দা করা হয়েছে, যার ফলে খাদ্য ব্যতীত সে জীবন-ধারণ করতে পারে না। একজন যতটা খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে, তা তার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এজন্যই তাকে আর দশজনের সঙ্গে মিলিত হতে হয়, যাতে করে সমবায়ের ভিত্তিতে তারা যথেষ্ট ও প্রয়োজনের চাইতে বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। নিজেকে রক্ষা করার জন্যও তার অন্যের সাহায্যের দরকার। আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ প্রতিটি জীবকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া সৃজনধর্মী মন ও হাতের সাহায্যেই শিল্পের কলা-কৌশলের উৎকর্ষ সাধিত হয় আর এর মাধ্যমেই হাতিয়ার তৈরি করা হয়। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের রক্ষণাবেক্ষণে যে কাজ করে, মানুষের পক্ষে হাতিয়ারের রয়েছে সেই একই ভূমিকা। আর দশজনের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে যেমন মানুষ জীবন-ধারণের উপযোগী যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না, তেমনি আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ার না থাকলে সে কেমন করে হিংস্র পশুর কবল থেকে রক্ষা পাবে? হাতিয়ার ও অস্ত্র-শস্ত্রের উদ্ভাবন না হলে গোটা মানবজাতিটাই হয়ত নিশ্চিহ্ন

হয়ে যেত। সহযোগিতার মাধ্যমেই জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করা ও আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ার তৈরি করা সম্ভবপর হয়েছে। এভাবেই মানবজাতি বেঁচে থাকে ও আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তাই সমাজ-ব্যবস্থা মানুষের জন্য খুব বেশী দরকারী। সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।

"মানুষের সমাজ প্রতিষ্ঠার পর তাদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়ায়। কারণ, আক্রমণ ও নিপীড়নের পশুসুলভ প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। অতীতে যে সব হাতিয়ার দিয়ে হিংস্র পশু থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষা করত, তা এখন অকেজো হয়ে পড়ল। প্রতিটি মানুষই ত' এখন তা সমানে ব্যবহার করতে পারে। তাই নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে লাগল। যাতে করে একে অপরকে আক্রমণ করতে না পারে, সেজন্য একটি লোককে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে হল। এই ক্ষমতার নামই 'মূলক' বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাষ্ট্র মানুষের পক্ষে স্বভাবজাত—তার জীবন-ধারণের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অপরিহার্য।"

মুসলিম চিন্তাবিদরা সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তার উপপদ হিসেবে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেও জুড়ে দিয়েছেন। কারণ, রাষ্ট্র ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব নেই। একথা যদিও সত্য যে, মানবসমাজ পত্তনের পূর্বে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নি, তবু রাষ্ট্রের ওপরেই সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে। মানুষের আক্রমণাত্মক ও অশুভ প্রবণতার ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। নৈরাজ্যসুলভ এ প্রবৃত্তি যদি প্রশমিত করা না হত, তবে সমাজ ধ্বংস হয়ে যেত। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, এ ধারণাটা কয়েক শতাব্দী পর ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি তাঁর 'সামাজিক চুক্তির নীতি'র পেছনে মানুষের অশুভ প্রবৃত্তি ও প্রবণতার কথা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ এ চুক্তির ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অংশবিশেষ বৃহত্তর কর্তৃত্বের নিকট সমর্পণ করতে বাধ্য হল। হবসের সামাজিক চুক্তির মত কোন নীতি বা থিয়োরীর মধ্যে ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক অবদান খুঁজে পাওয়া যাবে না। একথা সত্য যে, হবস মানুষের প্রবৃত্তিগুলোর যথাযথ বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সামাজিক তাৎপর্যটুকু দেখাতে পারেন নি। ইবনে খালদুন হবস থেকে তিনশ' বছর আগেই মানুষের সমাজতাত্ত্বিক সম্পর্ক সুস্পষ্টরূপে ধরতে পেরেছিলেন।

প্রাথমিক ইসলামী যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে খুব বড় একটা পার্থক্য ছিল না। তখন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রায় একার্থবোধকই ছিল। "রাষ্ট্র" কথাটি আল-কোরআনে পাওয়া যায় না। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সময়েও ঠিক রাষ্ট্র কথাটি প্রচলিত ছিল না। অবশ্য আল-কোরআনে সুনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার উল্লেখ আছে। আর এ ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে আল্লাহর ওপরে। আল্লাহর ক্ষমতা শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার উৎস ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অংশবিশেষ। রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হোক আর না হোক, মানুষের সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদেই সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল।

রাষ্ট্রের আইনগত ভিত্তি

ইসলামের মতে আদিম যুগে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির বসবাস ছিল এবং প্রতিটি জাতির মধ্যে একটা করে আল্লাহর দেয়া বিধানও বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক জাতির কাছে আল্লাহ তাঁর বিধান দিয়ে এক একজন পয়গম্বর পাঠান। তার ফলে এ সব জাতির সঙ্গে আল্লাহর একটা সরাসরি চুক্তি সম্পাদিত হয়। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) আগমনের অব্যবহিত পূর্বে দুনিয়ার অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তখন কেবলমাত্র একটি কেন্দ্রীভূত সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল না; নানান জাতির সমাবেশে তখন এক বিচিত্র মানবসমাজের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি জাতিকে তার নিজ নিজ চুক্তি মেনে চলতে হত ও স্বজাতীয় পয়গম্বরের প্রতি আনুগত্য দেখাতে হত। কিন্তু এরা একে একে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করতে থাকে এবং নবীদের বিধি-বিধান বিনষ্ট ও বিভ্রান্ত করে ফেলে। যদিও এ অবস্থার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে প্রায়ই সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তবু তাতে বিশেষ কোন ফায়দা হয় নি। অতপর আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে একটি সুসংগঠিত ও সুসংহত সমাজব্যবস্থা কায়েম করবার জন্য শেষনবী হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) প্রেরণ করলেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রথম দিকে তাঁর নিজের জাতির প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন। তারপর তাঁর বিধান মেনে নেবার জন্য অন্য সব জাতিকেও আহ্বান জানালেন। এমনি করে ইসলাম নামে পরিচিত হযরত মুহাম্মদের (সঃ) শিক্ষাবিধান সমগ্র মানবসমাজের জন্য সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ধর্ম বা জীবনদর্শনরূপে গণ্য হল।

হযরত মুহাম্মদের (সঃ) নবুয়ত থেকেই বোঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালা বার বার মানুষের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চেয়েছেন। যারা হযরতের আহ্বানে সাড়া দিলেন, কেবলমাত্র তাঁরাই আল্লাহর দিক থেকে সত্যিকার মু'মিন বলে গণ্য হলেন। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হল, আল্লাহ'র ইচ্ছার ওপর আত্মসমর্পণ বা আনুগত্য। এজন্যেই আল্লাহর এক নাম "মালিক"। আর এ থেকেই আল্লাহতায়ালা ও তাঁর অধীনস্থ মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের আসল প্রকৃতি বুঝতে পারা যায়। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা একটি চুক্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। চুক্তিটি অবশ্য দুটো সমস্থানীয় দলের মধ্যে সম্পাদিত হয়নি। আল্লাহতায়লার প্রতি আনুগত্যের ভিতিতেই এ চুক্তি সম্ভব হয়েছে। মানুষের সঙ্গে আল্লাহর চুক্তির প্রকৃতিও এরই মধ্যে নিহিত আছে। কেবলমাত্র ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারেই যে একথা সত্য, তা নয় — ইসলামী আইনের বেলায়ও এটা সমানভাবে প্রযোজ্য। চুক্তি জিনিসটি ইসলামী আইনে একদলের প্রস্তাব ও অন্য আর একদলের স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে না। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর নিজের জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রতিটি মানুষের কাছে হযরত ইসলামের জীবনাদর্শ পেশ করেন। যাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের তাগিদে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর আত্মসমর্পণ করলেন। পরবর্তী যুগে ইসলামী সমাজে প্রতিটি মুসলমানের ব্যাপারে—তা তিনি ধর্মান্তরিত মুসলমান হোক আর না হোন—ব্যক্তিগত আনুগত্যমূলক চুক্তির ভিত্তিটা ধরে নেয়া হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পেছনে কি একটি চুক্তি ছিল, না দুটি? একক চুক্তির নীতিতে বলা হয় ঃ সাধারণ মানুষ সম্মিলিতভাবে সমাজব্যবস্থার পত্তন করে। আল-ফারাবী ও হবসের মতে, সার্বজনীন চুক্তির মাধ্যমে পরস্পরবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগণ সার্বভৌম শাসকের আনুগত্য মেনে নেয় চিরকালের জন্য। আবার দু'টি চুক্তির নীতিতে বলা হয়েছে ঃ প্রথম চুক্তি সম্পাদিত হবার পরে সমাজ কায়েম হলে পুনরায় আর একটি চুক্তির দ্বারা শাসক নিযুক্ত করা হয়। শাসককে অবশ্য কতগুলো শর্ত ও পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়। এখন প্রশ্ন হল, এ দুই প্রকারের চুক্তির মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র কোন্ পর্যায়ে পড়ে? ইনজিলের রাষ্ট্রনীতির আলোকে ইহুদীদের জাতীয় চুক্তিকে একক চুক্তি বলেই ধরে নিতে হবে। এ চুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর পূর্ণ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মদের (সঃ) রাষ্ট্র ও তাঁর পরবর্তী খলিফাদের রাষ্ট্রের মধ্যে এ ব্যাপারে বিশেষ কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। অবশ্য একথা সত্য যে, যদিও আল্লাহ্ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসক নন, তবু উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহকে সার্বভৌম বলে মনে করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) শাসনব্যবস্থায় কেবল শাসনবিভাগ নয়, আইন ও বিচার বিভাগও একীভূত ছিল। স্বয়ং আল্লাহর বার্তাবাহক হিসেবে শাসনব্যবস্থার সমস্ত ক্ষমতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে ঃ সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত ছিল একমাত্র আল্লাহর ওপরেই; আর আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করবার জন্য আইনের প্রয়োগ ও রূপায়ণের বিষয়টি দেয়া হয়েছিল হযরত মুহাম্মদের (সঃ) হাতে। রাষ্ট্রের নামকরণের দিক থেকেও শাসক ও শাসন-কর্তৃত্বের উৎস হলেন আল্লাহ; আর সরকার পরিচালনার ভার পড়ল হযরতের ওপর।

হযরতের মৃত্যুর পর পয়গম্বরী রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটল। পরবর্তী যুগে শাসনকর্তা নিয়োগের কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা হযরত নির্ধারিত করে দিয়ে যান নি। আল্লাহর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হযরতের অবর্তমানে আল্লাহর সঙ্গে চুক্তি কি বাতিল হয়ে গেছে?— এমনি ধারা অনেক বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হল। এ বিষয় নিয়ে ইসলামী সমাজে দুটো দল মাথা তুলে দাঁড়াল। একদল যুক্তি দেখিয়ে বললেন, হযরতের প্রতি ত' তাঁদের প্রকৃত আনুগত্য ছিল না—তাঁদের প্রত্যক্ষ আনুগত্য ছিল একমাত্র আল্লাহর প্রতি। তাই পরবর্তী যুগে শাসনকর্তা নিয়োগ করে আল্লাহর নির্দেশাবলী রূপায়ণের পন্থা নির্ধারণের বিষয়টি তাঁরা খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন। অন্য দলটিতে ছিল বেদুঈনরা। তারা সরদারের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের গোত্রীয় নীতি পালনে অধিক অভ্যস্ত ছিল। তারা বলতে লাগল ঃ হযরতের ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতি তাদের আনুগত্যের অবসান হয়েছে। মদিনার নবনিযুক্ত শাসন-কর্তৃপক্ষকেও তারা অমান্য করতে চাইল।

এ সব বাক-বিতণ্ডার অবসানে সমঝোতার ভেতর দিয়ে এক নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হল। অবশ্য, এ বিরোধের অবসান ঘটানোর ব্যাপারে শক্তির প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। শাসনব্যবস্থার প্রধান হিসেবে হযরতের স্থান দখল

করলেন তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি। কিন্তু আল্লাহর দেওয়া বিধান আল্লাহর নিকট থেকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া ও রূপায়িত করা, হযরতের এ কাজ থেকে তিনি রেহাই পেলেন। খলিফা ঘোষণা করলেন যে, তাঁর কাজ হবে শুধু আল্লাহর দেয়া বিধান কার্যকরী করা ও সে অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। ফলে আইনগত ও শাসন-ক্ষমতা যে কেবল আলাদা হয়ে গেল, তাই নয়—দার্শনিক বিচারে দেখা যায় যে, আল্লাহর দেয়া আইন প্রণয়নের পর্যায়ও শেষ হল। খলিফার বিচার-ক্ষমতা আইনের ব্যাখ্যার মধ্যে সীমিত হয়ে এল। কিন্তু তাঁর নতুন আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা আর রইল না। এখন দেখা যাক, এ নতুন পরিস্থিতিতে ইসলামী রাষ্ট্রে চুক্তির ভিত্তিটার কতখানি রদ-বদল হয়েছে?

মনে রাখা দরকার যে, একক চুক্তির নীতিতে জনগণকে একেবারে নিষ্ক্রিয় বলে মনে করা হয়েছে। হযরতের পরবর্তী যুগে গণমান্য মুসলমানদের দ্বারা খলিফা নির্বাচন শাসন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা মনোনয়নের ব্যাপারে গণতন্ত্রের পত্তন করেছিল। ফলে প্রথম চুক্তির সঙ্গে আর একটি নতুন চুক্তি সন্নিবেশিত হয়—মুসলিম সমাজ (উম্মা) ও খলিফা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। আল্লাহর বিধান কার্যকরী করার জন্যই খলিফাকে নিযুক্ত করা হল। প্রথম ও দ্বিতীয় চুক্তি—এ দুটোর সম্মেলনে এক পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হল। ফলে আল্লাহর প্রতি জনগণের আনুগত্য নতুন করে কার্যকরী হল। আবার সমগ্র জনগণের আনুগত্যের মতোই খলিফা আল্লাহর সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং সে চুক্তি অনুযায়ী কর্তব্য সমাধা করতেও তিনি বাধ্য ছিলেন।

এ প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে যে, খলিফা কার কাছে সরাসরি দায়ী ছিলেন? আল্লাহর কাছে না জনগণের কাছে? দ্বি-চুক্তির নীতি অনুসারে ক্ষমতার ওপর কয়েকটি বিশেষ শর্ত ও পরিসীমার ভিত্তিতে শাসককে নিযুক্ত করা হয়। কাজেই যে খলিফা হযরতের মতোই ক্ষমতা (পয়গম্বরী ও মৌলিক আইনগত ক্ষমতা ভিন্ন) ভোগ করেন, তাঁকেও জনগণের কাছে দায়ী থাকতে হয় আল্লাহর দেয়া বিধান কার্যকরী করার বিষয়ে বিশ্বস্ত তার নজির হিসেবে। কিন্তু খলিফা যদি সুষ্ঠুভাবে তাঁর কর্তব্য সমাধা করতে না পারেন, তবে কি তাঁকে পদচ্যুত করা চলবে? মুসলিম আইন ও ধর্ম-শাস্ত্রবিদগণ এ-ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। আল-মাওয়ার্দী (৯৭৪-১০৫৮ খৃস্টাব্দ) আদর্শস্থানীয় খলিফার প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও কার্যধারা বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, যদি খলিফা যথাযথরূপে তাঁর কর্তব্য সমাধা না করেন বা কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হন, তবে খলিফার মত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার তাঁর কোন অধিকার নেই। মাওয়ার্দী অবশ্য দেখান নি যে, কোন্ সুষ্ঠু আইনগত পদ্ধতির মাধ্যমে খলিফাকে অপসারণ করা হবে। একমাত্র খারেজীরা খোলাখুলিভাবে বিপ্লবের নীতি ঘোষণা করেছেন। তাঁদের মতে খিলাফত হল দ্বিতীয় চুক্তিভিত্তিক সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। এ চুক্তি অনুসারে যে খলিফা তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করেন, তাঁকে পদচ্যুত বা নিবৃত্ত করার ক্ষমতা জনগণের রয়েছে। কারণ, নির্বাচন করার ক্ষমতা আছে

একমাত্র তাদেরই। এর বিরুদ্ধে এক পাল্টা মত পেশ করেছেন আল-আশারী (মৃত্যু ৯৩৫ খৃস্টাব্দ)। তিনি গণ-বিপ্লবের দাবী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। খলিফা তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করলেও জনগণ তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগত থাকতে বাধ্য। খলিফার প্রতি আনুগত্যের দাবী খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আল-আশারী বলেন ঃ

"আমরা মুসলমানদের ইমামদের (খলিফাদের) ও তাঁদের ইমামতের মঙ্গলাকাঙ্খী। তাঁরা সত্য-ভ্রষ্ট হয়েছেন, এ অজুহাতে যারা তাঁদের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান অনুমোদন করে, তাদের আমরা ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত করছি। তাঁদের (ইমামদের) বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান আমরা অনুমোদন করি না। গৃহযুদ্ধে পক্ষাবলম্বন না করারই আমরা পক্ষপাতী।"

পরবর্তী যুগে মুসলিম ব্যবস্থাপকদের মধ্যে খলিফার পদমর্যাদা বৃদ্ধি এবং গোলযোগ ও অরাজকতার আশংকায় তাঁর ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেবার অধিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আইন-শৃংখলা রক্ষার তাগিদে কোন কোন চিন্তানায়ক যে কোন শাসককেই মেনে নেবার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। সে শাসক চরিত্রবান বা ন্যায়পরায়ণ হোন বা না হোন, তাতে কিছুই আসে যায় না। ফিতনা' বা গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে আল-কোরআনে যে সতর্কবাণী রয়েছে, তারই নজির দিয়ে এ ধরনের শাসনকে সহজে মেনে নেবার সপক্ষে যুক্তি দেয়া হয়েছে। আইনজ্ঞগণ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বার বার বলেছেন যে, শৃংখলামূলক স্বৈরতন্ত্র ও অসাধুতা অরাজকতার চাইতে বহুগুণে শ্রেয়। প্রতিষ্ঠিত শাসকের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে বদরউদ্দীন ইবনে জামআর (মৃত্যু ১৩৩৩ খৃস্টাব্দ) মতের চাইতে বেশী সঙ্গত উদাহরণ আর নেই। ক্ষমতা লাভের পদ্ধতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"নেতৃত্বহীন অবস্থায় কোন অযোগ্য ব্যক্তিও যদি শক্তিবলে ও বায়াত ব্যতীত ক্ষমতা লাভ করেন, তবে তাঁর ইমামত অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত হবে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য মুসলিম জাতির ঐক্য রক্ষার্থ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হবে। তিনি অত্যাচারী, পাপাচারী ও অশিক্ষিত হতে পারেন, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। যদি এই শক্তিধর ইমাম অন্য এক ইমামের বিরোধিতার সম্মুখীন হন এবং শেষোক্ত ইমাম প্রথম ইমামকে শক্তিবলে পরাজিত করেন, তবে শেষোক্ত ইমাম মুসলমান জাতির স্বার্থ ও ইসলামের ঐক্যের তাগিদে সর্বসম্মত ইমাম হিসেবে গণ্য হবেন।" ইবনে উমরের একটি উক্তি থেকেও এর প্রমাণ মেলে। তিনি বলেছেন ঃ

"যিনি বিজয়ী হবেন, আমরা তাঁরই পক্ষে থাকব।"

আল্লাহ-প্রদত্ত সার্বজনীন আদর্শতন্ত্র

যে সব রাষ্ট্রে আদি ও মহান খোদায়ী উৎস থেকে পাওয়া পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা একীভূত করা হয়, তাকে অনেক সময় ভুল করে 'থিওক্রেসী' বলে অভিহিত

করা হয়েছে। যে রাষ্ট্রে ধর্মীয় ও পার্থিব—এ দু'ভাগে ক্ষমতা বিভক্ত হয়েছে, সে রাষ্ট্রকেও কোন কোন লেখক থিওক্রেসীর আওতায় ফেলেছেন। কারণ, তাঁদের মতে সব রকমের ধর্মীয় রাষ্ট্রই থিওক্রেসীর পর্যায়ে পড়ে। একথা অবশ্য ধরে নেয়া হয় যে, পার্থিব ক্ষমতা ধর্মীয় ক্ষমতা দ্বারাই সমর্থিত হয়। যে ক্ষমতা আল্লাহর নিকট থেকে সরাসরি উদ্ভূত হয় ও স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রযুক্ত হয়, আর যে ক্ষমতা আল্লাহর দেয়া বিধান থেকে উদ্ভূত হয়, তাঁর প্রতিনিধির (পার্থিব শাসক) দ্বারা বাস্তবায়িত হয় এবং শাসক ও জনগণ উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে—এ দুই ক্ষমতার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। ক্ষমতার মৌলিক উৎস ও প্রয়োগের মধ্যে তফাতটুকুই প্রমাণ করে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের পূর্বকথিত আলোচনার সঙ্গে 'থিওক্রেসী' কথাটির কোন সামঞ্জস্য নেই।

ইসলামী রাষ্ট্র তা হলে কোন্ পর্যায়ে পড়বে? আরাস্তুর মতে, সার্বভৌম ক্ষমতা যদি যুক্তির মাধ্যমে বা শক্তিবলে এক ব্যক্তির করায়ত্তে আসে, তবে তাকে রাজকীয় বা সংকীর্ণ দলীয় শাসক বলে ধরে নিতে হবে। আর জনগণ যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলে বিবেচিত হয় এবং সে ক্ষমতা যেখানে তাদের সম্মতিভিত্তিক হয়, তবে সেখানেই পাওয়া যাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাইডার স্মিথ বলেন ঃ

"একটি রাষ্ট্রকে তখনই থিওক্রেসী বলা চলবে, যখন তা দেবতা বা দেবতাগণ দ্বারা শাসিত হয়।"

'অক্সফোর্ড অভিধান' থিওক্রেসীর সংজ্ঞা দিয়েছে এ ভাবে ঃ

"থিওক্রেসী এমন এক সরকার, যেখানে আল্লাহকেই বাদশাহ বা প্রত্যক্ষ শাসনকর্তা হিসেবে গণ্য করা হয়।"

ফ্লেভিয়াস জোসেফাস থিওক্রেসী বলতে খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর ইসরাইলীয় রাষ্ট্রকেই বুঝেছেন। জোসেফাস বলেন ঃ

"আচার-ব্যবহার ও আইন-কানুনের ব্যাপারে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এগুলোকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যেতে পারে—কোন কোন আইনবেত্তা বাদশাহী শাসন, কেউ-বা সংকীর্ণ দলগত কর্তৃত্ব, আবার কেউ বা গণতান্ত্রিক সরকার অনুমোদন করেছেন। কিন্তু মূসা (আঃ) আমাদের সরকারকে থিওক্রেসী বা আল্লাহর সরকার বলে সাব্যস্ত করেছেন। এ সরকারের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতা আল্লাহর ওপরেই আরোপ করা হয়। হযরত মূসা (আঃ) সমগ্র ইহুদী জাতিকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যাতে করে তাঁরা একমাত্র আল্লাহকেই সর্বময় কর্তা বলে মনে করে।"

ওয়েলহ'সেন জোসেফাসের মত মেনে নিয়ে আরব রাষ্ট্রকেও এই একই আওতায় এনে শামিল করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কেবলমাত্র কাগজে-কলমেই ইসরাইলীয় থিওক্রেসী বিদ্যমান ছিল; ইহুদীদের পতনের যুগেই কেবল আমরা আদর্শ ইহুদী রাষ্ট্রের নজির পাই। আদতে রাজনীতির সঙ্গে খৃস্টান ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য খৃস্টান ধর্মে ক্রমশঃ এ প্রথা স্থায়ী হয়ে পড়ে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাঁর হাতেই থাকুক না

কেন, তাঁকেই আল্লাহর অনুমোদিত শাসন কর্তৃপক্ষ বলে ধরে নিতে হবে। রাষ্ট্রশক্তি যখন খৃস্টান ধর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিল, তখন রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়ল চার্চের সমর্থন। আর আল্লাহর আইন রূপায়িত করাই হয়ে গেল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। খৃস্টান ধর্ম ও রাষ্ট্রশক্তি তখন পরস্পরের সাথে এত নিবিড়ভাবে জড়িত হয়ে গেল যে, তার ফলে খৃস্টান ধর্ম খৃস্টীয় গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হল।

এ কথাটা মনে রাখা দরকার যে ইহুদী ধর্ম, খৃস্টান ধর্ম ও ইসলামে আল্লাহকে মানুষের প্রত্যক্ষ শাসক বলে মনে করা হয় নি। তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফারাই ছিলেন প্রকৃত শাসক। তাই আল্লাহর আইন বা পবিত্র বিধানই শাসন-ক্ষতার উৎসরূপে গণ্য হত। এসব ধর্মীয় ব্যবস্থা—যা শাসন ক্ষমতা রূপায়িত করার ব্যাপারে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, তাই হল আল্লাহর আইন। আল্লাহর বিধানের স্থান রাষ্ট্রেরও অনেক ওপরে—এ বিধান রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাই বলা চলে যে, আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা করেন না—তাঁর দেয়া আইনের দ্বারাই শাসন পরিচালনা করা হয়, এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ধরনের সরকারকে আল্লাহর শাসন না বলে আইনানুগ সরকার (Nomocracy) বলাই বেশী ঠিক বলে মনে হয়। অক্সফোর্ড অভিধানে আইনানুগ সরকারের এ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে ঃ আইনগত বিধানের ওপর যে সরকার গড়ে উঠে অর্থাৎ সমাজে আইনের রাজত্ব। ইসরাইলীয়, খৃস্টীয় ও ইসলামী রাষ্ট্রগুলো আল্লাহর আইন ও বিধানের ওপর স্থাপিত ছিল। তাই এ রাষ্ট্রগুলোর নাম দেয়া যেতে পারে, আল্লাহর আইনানুগ সরকার।

ইসলামী রাষ্ট্রকে কি আল্লাহর আইনানুগ জাতীয় রাষ্ট্র, না সার্বজনীন রাষ্ট্ররূপে মনে করতে হবে? হযরত মুহাম্মদ (সঃ) শুধু আরব জাতিকেই সত্য ধর্মের পথে নিয়ে এসেছিলেন, না গোটা দুনিয়ার প্রতিই ছিল তাঁর উদাত্ত আহ্বান—ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপটি নিহিত রয়েছে এ প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই। এ ব্যাপারে যদিও পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধের সুরাহা হয় নি, তবু রাষ্ট্র যখন আল্লাহর দেয়া নতুন আমানত বাস্তবায়িত করার উপায় বৈ আর কিছু নয়, তখন ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র তামাম দুনিয়ার কল্যাণেই নিয়োজিত হয়েছে, কেবল আরব জাতির জন্য নয়—নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে। অবশ্য আল-কোরআনে কোন কোন নির্দেশের মধ্যে আরবীয় ভাবধারার গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ নজরে পড়ে। বিশেষ লক্ষ্য করবার যে, প্রথম দিকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আরবীয় আচার-ব্যবহার অনেকাংশে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আল-কোরআনে গোড়া থেকেই সার্বজনীন রাষ্ট্রের আইনগত ভিত্তি স্বীকৃত হয়েছিল, আল্লাহর দৃষ্টিতে সব গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক সাম্য ও একই রাষ্ট্র প্রধানের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে।

খৃস্টান ধর্মের মত ইসলামও এমন এক সমাজে উদ্ভূত হয়েছিল, যেখানে সংকীর্ণ ভাবধারা ও স্থান-কেন্দ্রিক সংকীর্ণতার ছিল কায়েমী আসন। এ দুটো ধর্ম এ অবস্থার প্রতিবাদ হিসেবেই জন্ম নিয়েছে। তাই গ্রীকজগতে প্রচলিত সার্বজনীন ভাবধারার মূল্যবোধ তাদের সম্বল হল। আলেকজান্দার কর্তৃক মানবজাতির ঐক্য প্রচারিত হবার সময় থেকে যে ধারা চলে আসছিল, ক্রমে তাই সংকীর্ণ পথ পেরিয়ে সার্বজনীন

ভাবধারায় এসে রূপ পেয়েছিল, স্টোয়িকগণ সার্বজনীন মূল্যবোধের মাধ্যমে যে দার্শনিক তত্ত্বের পত্তন করেছেন, তা আলেকজান্দারের ভাবধারাকে সুপ্রসারিত করেই সম্ভব হতে পেরেছে। রোমানদের হাতে আলেকজান্দারের ভাবধারা ও স্টোয়িক-দর্শন সুসম জীবন ব্যবস্থাতে পরিণত রূপ লাভ করেছে। এসব ভাবধারার প্রভাবের ফলেই খৃস্টান ধর্ম ও ইসলামের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। এ অবস্থায়ই ইসলামকে সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করতে হয়েছে। আরব-বিজয়ের পরবর্তীযুগে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে গ্রীক ভাবধারায় সম্পৃক্ত হয়। এসব মূল্যবোধ গৃহীত হবার পূর্বেই আমরা দেখতে পাই, ইহুদী রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিবর্তন। স্বাভাবিকভাবেই তা ছিল সংকীর্ণপন্থী। ইহুদীদের আল্লাহর বিশেষ অনুগৃহীত জাতি বলে মনে করা হয়। ইহুদী রাষ্ট্রকে সার্বজনীন রাষ্ট্র বলা চলে না—সে রাষ্ট্র ছিল জাতীয় রাষ্ট্র।

সার্বজনীন ইসলামী রাষ্ট্র পাশ্চাত্যের খৃস্টীয় গণতন্ত্রের মতোই মানবজাতিকে জাতীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এক মানবসমাজ বলে ধরে নিয়েছিল। এ সমাজের ছিল এক আইন, আর একই শাসক। কারণ, আল-কোরআনের এক নির্দেশেই বলা হয়েছে যে, একের বেশী আল্লাহ থাকলে নিখিল বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ইসলামী রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও একক। এর সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় যে, এ রাষ্ট্র কোন দ্বিতীয় সার্বজনীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যদিও ইসলাম খৃস্টান ধর্ম ও ইহুদী ধর্মকে মেনে নিয়েছে, তবু ইসলাম ও খৃস্টান রাষ্ট্র দুটি সার্বজনীন রাষ্ট্র হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশিভাবে বাস করতে পারে নি।

আইনের দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে বাস্তব ঐক্য বিদ্যমান। কিন্তু এ ঐক্য খৃস্টান-গণতন্ত্রের নেই। মধ্যযুগে ইউরোপে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, তাকে একদিক দিয়ে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পরস্পর সংঘর্ষ বলা যেতে পারে। ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যের ফলে ইসলামী রাষ্ট্র সহজেই এ সংঘর্ষ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে এক হিসেবে খলিফা —পোপ ও সম্রাট উভয়ই ছিলেন। তাঁর প্রধান কাজ ছিল, ইসলামকে সার্বজনীন আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করা ও আল্লাহপ্রদত্ত আইন বাস্তবে রূপায়িত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আইনের প্রকৃতি ও উৎস

আচারগত আইন ও ইসলামী আইন

প্রাক-ইসলামী আইনের সঙ্গে ইসলামী আইনের কোন সম্পর্ক নেই বলে মুসলিম আইনবিদগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারণ, ইসলামী আইন হল আল্লাহ-প্রদত্ত বিধান। কেউ কেউ এতদূর বলেছেন যে, আল-কোরআনে সর্ববিষয়ের বিশদ বর্ণনা থাকায় ইসলাম প্রাক-ইসলামী যুগের আইনের সকল বিধানই বাতিল করে দিয়েছে। আবার অনেকে, বিশেষ করে মালিকী ও হানাফী আইনবিদগণ প্রাক-ইসলামী যুগের আইন-কানুন ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে কেবলমাত্র সেগুলোই গ্রহণ করেছেন, যেগুলো আল্লাহর আইন দ্বারা বাতিল হয়ে যায় নি। শেষোক্ত অর্থাৎ হানাফী ও মালিকী আইনবিদেরা প্রাক-ইসলামী যুগের আইন অংশতঃ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত আইনবিদগণ প্রাক-ইসলামী যুগের সব রীতি-নীতি বাতিল করে দিতে চেয়েছেন। অবশ্য এ দুদলের মধ্যে মূলতঃ কোন বৈসাদৃশ্য বা বিরোধ নেই— একথা প্রমাণ করার জন্য ইবনে খালদুন "বাতিলকরণ" কথাটির জায়গায় "বিকল্পীকরণ" কথাটির প্রবর্তন করেছিলেন। প্রাক-ইসলামী আইনের মূল্যমান নির্ধারণ না করেই তিনি একথা বলেছেন। ইসলামী আইনের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে কোন দলের আইনবিদেরাই যথাযথ ব্যাখ্যা পেশ করেন নি। অবশ্য ইসলামী আইন যে আরবদের আচার-ব্যবহার থেকেই বিবর্তিত হয়েছে, তাঁর যথেষ্ট নজির পাওয়া যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিজিত দেশের আচার-ব্যবহার ইসলামী আইনের সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়েছিল। ভিন্নতর ধর্মীয় ব্যবস্থার ইতিহাসেও আমরা এই একই ব্যাপার দেখতে পাই।

আচারগত আইনের ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল আইনগত ও নৈতিক নির্দেশাবলী। এগুলোই 'ঐতিহ্যগত সুন্না' (Customary Law) নামে অভিহিত। আরব জাতির পূর্বপুরুষদের আচার-ব্যবহার থেকেই এ প্রাচীন 'সুন্নার' উৎপত্তি হয়ে ছিল; আর বাস্তব রূপায়ণের মধ্যেই নিহিত ছিল এর আইনগত ভিত্তি। প্রাক-ইসলামী আরবের সামাজিক কাঠামো এবং এমন কি মক্কা ও মদিনার মত বড় বড় শহরও সম্পূর্ণরূপে নাগরিক পরিবেশে গড়ে ওঠে নি। তাই এসব স্থায়ী বাসিন্দাদের আচার-ব্যবহারের প্রকৃতি গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক বেদুঈনদের আচার থেকে খুব বেশী পৃথক ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি জনপদের খৃস্টান ও ইহুদীরা তাদের স্বীয় আইন দ্বারা পরিচালিত হত। এদের বাদ দিলে আরবে পৌত্তলিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কাজেই মূলতঃ এ

ঐতিহ্যবাদ ইসলামভিত্তিক ছিল না; যাযাবর ও আধা-যাযাবর বেদুঈনদের প্রয়োজন ও আনুগত্যের ওপরেই ছিল এর ভিত্তি।

রাজনৈতিক ঐক্যের স্বল্পতা ছিল এ সমাজের বৈশিষ্ট্য। সব গোষ্ঠীগত সমাজ-ব্যবস্থারই এই দশা। "সাইয়িদ" বা গোষ্ঠীর সরদার নিয়োগ করার সময় সরদারের বয়স, বংশ-মর্যাদা, মেধা সুখ্যাতির মূল্য ছিল সব চাইতে বেশী। গোষ্ঠীর লোকদের বিশ্বাস ও সম্মানভাজন হওয়ার ওপরেই তাঁর শাসন ক্ষমতা নির্ভর করত। কারণ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তখন যেমন দুর্বল ও শিথিল ছিল, তেমনি তার ক্ষমতাও ছিল সীমাবদ্ধ। আচারগত আইনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসা করা সরদারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। আর গোষ্ঠীগত জনমতের ভয়ে এগুলো সবাই মেনে চলত। কিন্তু আচারগত আইনের বাইরে কোন হুকুম জারী করার ক্ষমতা সরদারের ছিল না। কারণ, আইন-প্রণয়নের ক্ষমতার এখতিয়ার তাঁর ছিল না —তাঁর হাতে ছিল কেবলমাত্র গোষ্ঠীর শাসন কর্তৃত্ব। অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সরদারই নিজের গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতেন। কূটনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারে গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সার্বভৌম-ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার কেবল তাঁরই ছিল। কাজেই আরবীয় ঐতিহ্যগত 'সুন্না' হল এক প্রাচীন সমাজব্যবস্থার সাধারণ আইন। অপেক্ষাকৃত শিথিল রাজনৈতিক সংস্থায় সরদারের উদার কর্তৃত্বের পরিপূরক হিসেবে কাজ করত এই আইন। 'দাখালা' বা আশ্রিতের সাহায্যের ব্যাপারে সরদারের কর্তৃত্বের চাইতে সামাজিক বিধান সুন্নারই প্রতিপত্তি ছিল সব চাইতে বেশী। ঊষর মরু-জীবনে জীবনধারণের সংস্থানের ব্যবস্থা ছিল নিতান্ত নগণ্য। আর এ কঠোর জীবন-সংগ্রামে সামাজিক ঔদার্যের নীতিগুলোই কেবল জীবনকে কিছুটা সহনীয় করে তুলতে পারে। 'দাখালা' ও 'নাজদা' প্রভৃতি আচারগত আতিথেয়তার বিধানের মাধ্যমে ধূসর মরু প্রান্তরে অসহায় পথচারীদের খাদ্য, আশ্রয় ও সাহায্যের একমাত্র অবলম্বন ছিল। সরদারের কর্তৃত্ব ছিল নিতান্ত নগণ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরদারের কর্তৃত্ব একেবারে ছিল না বললেই চলে। প্রতিশোধের প্রথা ও চোরের হাত কেটে দেবার কঠোরতম রীতি প্রচলিত হবার ফলে এ কর্তৃত্ব কিন্তু অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রতিশোধের প্রথার মাধ্যমে ব্যক্তি-জীবনে নিরাপত্তা এবং হাত কাটার রীতির ভেতর দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হত। এ সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কেউ বড় একটা স্বীকার করত না; তাই চৌর্যবৃত্তির দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যেত। যদিও যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে কতকগুলো কঠোর সামাজিক বাধা-নিষেধ ছিল, তবু পুরুষেরা বিবাহের ব্যাপারে অবাধ ও উচ্ছৃঙ্খল অধিকার ভোগ করত—বাধাহীনভাবে বহুবিবাহ, মুতা (অস্থায়ী বিবাহ) ও বিবাহ-বিচ্ছেদ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। অতি নিকট-আত্মীয় মহিলাদের বিবাহ করতে পুরুষদের পক্ষে কোন বাধাই ছিল না। বিমাতা ও স্ত্রীর ভগিনীদের সঙ্গেও বিবাহ অনুমোদিত ছিল। সর্বোপরি

পৌত্তলিকতা আচারগত বিধি-ব্যবস্থার এমন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছিল, যার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যধারা—যেমন হজ্জ্ব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবেই গণ্য হত। এমন কি গ্রীক দৈববাণীর পুরোহিতদের (Oracle) মতো কাহিন বা দৈবজ্ঞ কবিরাজগণ ধর্ম-নির্ধারিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন করতেন।

গোড়ার দিকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এসবের রদবদল করতে কিংবা আচারগত নিয়ম লংঘন করতে চান নি। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক বিধান মেনে চলতেন, যার ফলে তিনি "আমীন" বা বিশ্বস্ত নাম অর্জন করতে পেরেছিলেন। মক্কা অবস্থান কালে তিনি একথা বিশেষ জোর দিয়ে ঘোষণা করেন যে, তাঁর জীবন-সাধনা হল সাধারণ মানুষকে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়া ও আল্লাহর একত্ব প্রচার করা। তিনি বার বার ঘোষণা করেন যে, অসত্য ও কালিমার প্রতীক প্রতিমার স্থানে এক আল্লাহর ইবাদাত কায়েমই তাঁর লক্ষ্য। তবু বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে পৌত্তলিকতার উৎখাত ও অবসান করাই ছিল সামাজিক আচার লংঘনের শামিল। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় আইন ও ধর্মীয় আদর্শ এতটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল যে, ধর্মের ওপর আক্রমণ আর প্রচলিত সামাজিক বিধি লংঘন ছিল একই ব্যাপার। তাই পৌত্তলিকতা বর্জন করে এক আল্লাহকে মেনে নেবার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে আহ্বান জানালেন, তার ফলে পৌত্তলিক আচার-ব্যবহারের স্থানে আল্লাহর বিধানের সার্বভৌমত্বই প্রতিষ্ঠিত হল।

ইসলামী আইনের স্বরূপ

ইসলামী জীবন-দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর আইন-ব্যবস্থা অন্যান্য যে কোন ধর্মের চাইতে অনেক বেশী সুস্পষ্ট। শেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ওহীর মারফত যে আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাই আইনের ভিত্তিরূপে কাজ করেছে। আর আল্লাহ-প্রদত্ত এ ব্যবস্থাই বিশ্বাসীদের জীবন ও চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করে। এইভাবে ইসলাম নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও ভাল-মন্দের ওপর ভিত্তি করে এক অভ্রান্ত ন্যায়নীতির ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এ ব্যবস্থা আদর্শস্থানীয় বলে দাবী করতে পারে। কারণ, এ আইন স্বয়ং আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে এবং ইচ্ছা ও ন্যায়নীতির ধারণা থেকে জন্মলাভ করেছে।

ইসলামী আইন অনুসারে একমাত্র আল্লাহই হলেন সব ক্ষমতার মালিক; স্বয়ংসম্পূর্ণ আইনের নীতি সম্পর্কে একমাত্র তিনিই ওয়াকিবহাল রয়েছেন। ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মে এ আইনকে আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশ বা আল্লাহর প্রত্যক্ষ সৃষ্টি হিসেবে দেখান হয়েছে। মুসলিম আইন ও ধর্মবেত্তাগণ কিন্তু একে আর এক ধাপ ওপরে দাঁড় করিয়েছেন। বিশেষ করে সনাতনপন্থীদের হাতে মু'তাযিলাদের পরাজয়ের পর এ অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল। গোড়া থেকেই আল্লাহর আইন আল-কোরআনে বিধিবদ্ধ

রয়েছে। একে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে অভিহিত করা চলে। আল্লাহর অস্তিত্ব ও আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব তাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পাশ্চাত্যে যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম বলতে সাধারণ ন্যায়নীতিভিত্তিক আদর্শ আইন-ব্যবস্থা বুঝাত, তেমনি মুসলমানদের দৃষ্টিতে ইসলামী আইন হল এক আদর্শ-স্থানীয় নীতি-বিধান। আল্লাহর আইন হিসেবে এ হল ন্যায়ানুগ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শাশ্বত—সর্বযুগে সব মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কেবলমাত্র এ আইনানুগ জীবন-ব্যবস্থাই আদর্শস্থানীয় বলে নির্বাচিত হতে পারে।

মুসলিম আইন অনুসারে সমাজ ও রাষ্ট্র পত্তনের অনেক পূর্বেই এসেছে আল্লাহর প্রদত্ত আইন। আর এ আইনের রূপায়ণের জন্যই হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন। কিন্তু রাষ্ট্র যদি এ আইন-বিধান রূপায়িত করতে অসমর্থ হয়, তবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হয়ে পড়ে অর্থহীন। যদি আল্লাহর আইনের রূপায়ণের কোন ব্যবস্থা নাও থাকে, তবু বিশ্বাসীকে এ আইন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আইনের সামাজিক রূপায়ণের ব্যবস্থা বা কর্তৃত্ব যদি না থাকে, তাতেও কিছু আসে যায় না। কারণ, আইনের সত্যতা ও আইনের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আইনের যথাযথ রূপায়ণের কর্তৃত্ব বা ব্যবস্থা থাকুক বা নাই থাকুক, আইনের কাজ হল বিশ্বাসীকে সহজ সরল পথ (শরিয়ত) ও জীবন-পদ্ধতির নির্দেশ দেয়া। খারেজী দল ভিন্ন অন্যসব মুসলিম আইনবেত্তা এই সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিম সমাজে একজন ইমাম বা খলিফা থাকা অপরিহার্য। ইমামের কর্তব্য হল, আইনের যথোপযুক্ত রূপায়ণের ব্যবস্থা করা। ইমাম না থাকলে সমাজ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। কথিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি ইমামহীন অবস্থায় মারা যায়, তার যেন কুফুরী অবস্থাতেই মৃত্যু হল।' অবশ্য ইমাম যদি নিজে আইনের সঠিক রূপায়ণে অসমর্থ হন, তবু মুসলমানগণ আল্লাহর আইন মেনে চলতে বাধ্য। ইমাম তাঁর কর্তব্য পালনে অসমর্থ হলে মুসলিম সমাজের ইমামের পদ থেকে তিনি অপসারিত হবেন কিনা, সেটা হল এক স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

এ আইনের দুটো দিক আছে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্য আর মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক। যদি বিশ্বাসী মুসলমান এ আইন পুরোপুরিভাবে মেনে চলেন, তবে তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হল বলা চলে। কারণ, কর্তব্য পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নাজাত বা মুক্তির পথ।

আল্লাহর আইনের অস্তিত্ব মানুষের ওপর নির্ভর করে না। প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিগুলো যেমন প্রকৃতিতেই বিদ্যমান রয়েছে এবং বুদ্ধিমত্তার দ্বারা বোধগম্য হয়, তেমনি ইসলামী আইনের নীতিগুলো আল্লাহর পয়গম্বরের কাছে নাযেল হয় এবং অনুরূপভাবে ইসলামী ভাবাদর্শের মধ্যেই এর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। এ আইনের মূল সারবস্তু স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে উম্মুল কিতাবে (মৌলিক গ্রন্থ বা প্রকৃতিতে) লিপিবদ্ধ রয়েছে ও রাসূলে আকরাম হযরত মুহম্মদের (সঃ) প্রতি কাল ও অবস্থা অনুযায়ী ধীরে ধীরে নাযিল হয়েছে। এর নামই হল আল-কোরআন।

আল্লাহর আইন এক সুসংবদ্ধ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেছে। এ আইন সৌন্দর্য (হুসন পাশ্চাত্যের প্রচলিত ভাষায় ঃ ভাল) থেকে কদর্যতা (কুবহ-পাশ্চাত্যের প্রচলিত ভাষায় ঃ মন্দ) আলাদা করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যা কিছু সুন্দর, তা-ই অনুসরণ করতে হবে আর যা মন্দ বা কুৎসিত, তা বর্জন করাই এ আইনের নির্দেশ। আল্লাহর আইনে কতকগুলো অবশ্য কর্তব্য (ফারায়েজ) নির্ধারিত হয়েছে। এ নির্দেশগুলো মুসলিমকে সহজ সরল পথে (শরিয়তে বা সরল পথে) চলতে সাহায্য করে, যাতে করে তিনি পরিশেষে নাজাত বা মুক্তি লাভ করতে পারেন।

আপাতঃদৃষ্টিতে শরিয়তকে অতি অল্প-পরিসর মনে হলেও 'ফরয' (অবশ্য কর্তব্য) ও "হারামের" (নিষিদ্ধ) মাঝখানে এক সুপ্রশস্ত বিচরণ ক্ষেত্র রয়েছে, যার মধ্যে মানদুব (বিধিসম্মত) ও মাকরুহ্ (আপত্তিজনক)—এ দু'পর্যায়ের কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিধিসম্মত ব্যাপারগুলো মেনে চলতে হবে ও আপত্তিজনক কাজগুলো বর্জন করতে হবে। তবু বিধিসম্মত বিষয়গুলো অবশ্য কর্তব্য এবং আপত্তিজনক কাজগুলো একেবারে নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত হয় নি। বিধিসম্মত ও আপত্তিজনক বিষয়গুলোর মাঝামাঝি এক পর্যায় রয়েছে। একে বলা হয়, "জায়েয"। জায়েযের পর্যায়ে আইনের বিধানে সুস্পষ্ট কোন বাধ্যবাধকতার উল্লেখ নেই। তাই এসব বিষয়ে বিশ্বাসী মুসলিমের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, দৈনন্দিন নামাজ ও রমজান মাসের রোজা অবশ্য পালনীয়; শূকরের গোশত সুরা ও ব্যভিচার নিষিদ্ধ; অতিরিক্ত নামাজ বা দাসমুক্তি বিধিসম্মত; হায়নার গোশত, বা হায়েযের সময় স্ত্রীকে তালাক দেয়া মাকরুহ বা আপত্তিজনক। এ দুই পর্যায়ের মধ্যে যেগুলো পড়ে না, সেগুলো হল "জায়েয" বা অনুমোদিত। ক্রয়-বিক্রয় বা যে সব চুক্তি নিষিদ্ধ নয়, তা জায়েয। আল–কোরআনে নির্দেশ রয়েছে ঃ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদন করেছেন ও "রিবা" (সুদ ও অর্থনৈতিক শোষণ) নিষিদ্ধ করেছেন (সুরা–২ ঃ ২৭৫)।

ইসলামী আইন ও ধর্মবেত্তাগণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আইনের মৌলিক নীতি হল, স্বাধিকার। কিন্তু এরও আবার পরিসীমা আছে। মানুষের স্বভাব সাধারণতঃ খুব দুর্বল। তাই আল্লাহর বিধান না থাকলে সে সহজেই ভুল পথে পরিচালিত হয়। এ জন্যই আল্লাহর আইন হযরত মুহাম্মদের (সঃ) কাছে নাযেল হয়েছিল। এ আইনের মধ্যে কতকগুলো সুদূরপ্রসারী নির্দেশ রয়েছে। ধর্ম-বিশ্বাস আর সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি নিয়ে এর মধ্যে এক অবিভাজ্য ঐক্যেরও সৃষ্টি হয়েছে। আইনের নির্দেশ মেনে চলা যেমন ধর্মীয় কর্তব্য, তেমনি ধর্মের রাজনৈতিক প্রভাব নির্ভর করে এই আইনের ওপরেই।

ইসলামী আইনের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে মুসলিম আইন ও ধর্মবেত্তাগণ সর্বসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। প্রথমটা হল, স্থান ও কালের উর্ধ্বে আইনের চিরন্তনত্ব। ইসলামী রাষ্ট্রের এলাকার বাইরে বসবাস করলেও

মুসলমানেরা এ আইন মানতে বাধ্য। কেবলমাত্র কোন একটি বিশেষ ভৌগোলিক গোষ্ঠীর পরিচালনার জন্য ইসলাম আসেনি। মুসলমানের ব্যক্তিগত সত্তার নিয়ন্ত্রণের জন্যই আইনের বিধান নাযিল হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এ আইন মুসলিম সমাজের সাধারণ কল্যাণ ও নৈতিক মানকে সব চাইতে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বিশ্বাসীগণের ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় সাধারণ জনকল্যাণের কষ্ঠিপাথরে যাচাই করে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তি-স্বার্থ বিসর্জন দেবার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক সমঝোতা ও সালিসির ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরোধ নিয়ন্ত্রিত করার দিকে খুব বেশী দৃষ্টি দেয়া হয় নি।

তৃতীয়তঃ, সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে আইনের নির্দেশ মেনে চলা চাই। ইসলামে আইন-ব্যবস্থা হল মুমিনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কার্যধারার মৌলিক ভিত্তি। সাধারণ অবস্থায় অবিশ্বাস, মোনাফেকী ও দলত্যাগ আইনের মূল উদ্দেশ্যের ঘোর বিরোধী। কতকগুলো বিশেষ ব্যতিক্রমমূলক পরিস্থিতিতে আইনের বিধানগুলো 'কিঞ্চিত শিথিল করা যেতে পারে। যেমন, যদি কোন মুমিনের জীবন বিপন্ন হয় কিংবা মৃত্যুর আশংকা দেখা দেয়। এ শৈথিল্যটুকু মধ্যমপন্থী নীতি থেকে জন্ম নিয়েছে। এর ফলে একজন মুমিন আইন নির্ধারিত কর্তব্য ও পরিবেশের সঙ্গে কিছুটা সমঝোতা করার অধিকার লাভ করবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, রমজান মাসে রোজা রাখা সব মুসলিমের উপর ফরজ বা অবশ্য করণীয়। কিন্ত সফরকালে মধ্যমপন্থীর নীতি অনুসরণ করে রোজা না রাখাও অনুমোদিত হয়েছে। অসামর্থ্যের দরুন অসুস্থ লোকের পক্ষে রোজা না রেখে পরে কাজা করলেও চলে। কর্তব্য-পালন থেকে অব্যাহতি বা অক্ষমতার ফলে আইনের বিধান কার্যকরীকরণে ব্যর্থতা সত্ত্বেও আইনের এখতিয়ারের উর্ধ্বে ব্যক্তি-স্বার্থের গুরুত্ব মোটেই স্বীকৃতি পায় নি। কারণ, আদর্শ ধর্মীয় আইন-ব্যবস্থার মূল্যমান মুমিনকে সব সময়েই মেনে চলতে হয়। নিজের সুযোগ-সুবিধা মত সে আইনের রদবদল করতে পারে না।

আইনের উৎস

হযরত মুহাম্মদের (সঃ) ওফাতের পর মুসলিম সমাজ ইসলামের প্রাকৃতিক আইন ও আরবের সাধারণ আইন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল। হযরত নবুয়তের মহাদায়িত্ব তাঁর পরবর্তী যুগের খলিফাগণকে দিয়ে যান নি। তাই ইসলামী রাষ্ট্র যখন আরব দেশের বাইরে বিস্তৃত হতে চলল, তখন আল্লাহর আইন প্রণয়নের যুগ শেষ হয়ে গেল। ফলে মুসলিম সমাজ স্বভাবতঃই সামাজিক আচার-ব্যবহারের দিকে বেশী মাত্রায় ঝুঁকে পড়ল। আরবীয় জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইসলামী আইন এসব আচার-ব্যবহার থেকে কিছু কিছু মাল-মশলা সংগ্রহ করেছিল।

যদি আরব দেশেই মুসলিম সমাজের ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে ইসলামী আইনের বিবর্তনে এতখানি জটিলতার সৃষ্টি হত না—আর আইনবিদদের মধ্যেও এতটা বিভিন্নতা দেখা যেত না। আরবীয় আইনের ভিত্তিতে সিরিয়া, ইরাক, ইরান, মিসর প্রভৃতি নববিজিত দেশের আইনগত সমস্যার সমাধান খুব সহজসাধ্য ছিল না। প্রাথমিক যুগের খলিফা ও আইনজ্ঞগণ তাই আল্লাহর আইন ও সামাজিক আচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মতামত বা রায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছেন। আইনের উৎসরূপে ব্যক্তিগত মতামতকে স্বীকৃতি দেবার স্বপক্ষে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) অনেক বাণী উদ্ধৃত করে দেখান হয়েছে। খলিফা হযরত উমর (রাঃ) বসরার কাজী আবু মুসা আল আশারীকে যে সব উপদেশ-বাণী দিয়েছিলেন, তার মধ্যে আইনের তিনটি বিষয়ের উল্লেখ আছে ঃ আল-কোরআন, তদানীন্তন সুন্না (আস-সুন্নাহ) ও যুক্তি। এ উপদেশ-বাণী ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুক্তি প্রয়োগের এক অকাট্য প্রমাণ। 'সুন্না' কথাটির ব্যবহারের ফলে এ দলিলটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেবল হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জীবন-যাপন প্রণালী ও আচার-ব্যবহার অর্থে সুন্না কথাটি তখনও প্রচলিত হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে সাহাবা ও খলিফাদের চাল-চলনকেও (আসার) সুন্নারই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হত। কোরআনের বিধান ও সুন্নার অবর্তমানে রায় বা ব্যক্তিগত মতামতের আশ্রয় নেয়া হত। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদের পাকে পড়ে আইনের উৎস হিসেবে রায় শীঘ্রই পরিত্যক্ত হল। রায়ের মারফত নাকি মৌলিক আইন প্রণয়ন করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, এভাবে অনেক আক্রমণ আসতে লাগল চারদিক থেকে। আইনবিদগণ তাই ভিন্নতর পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন ঃ যুক্তির একমাত্র কাজ হল, কোরআন ও সুন্নার নীতিগুলোকে শক্তিশালী করা।

ইরাকে ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৮ খৃস্টাব্দ) কোরআনের আয়াত ও সুন্নার অনুপস্থিতিতে আইনের উৎস হিসেবে কিয়াস-এর ওপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। তিনি খুব সাবধানে সুন্না বেছে নিতেন—বিশেষ করে সাহাবী ও খুলাফা-ই-রাশেদার কার্যাবলীকে ভিত্তি করে। এজন্য তাঁকে তাঁর সমসাময়িক সমালোচকগণ এই বলে দোষারোপ করতেন যে, হাদিস সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের জ্ঞান নাকি ছিল নিতান্ত সামান্য। ইমাম হানিফা অবশ্য তাঁর সমালোচকদের এই জবাব দেন যে, তিনি কিয়াসের ব্যাপারে সাহাবীদের সুন্নার ওপরেই নির্ভর করেছেন—নিছক ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেন নি। কোন একটি বিষয়ে যদি ইমাম আবু হানিফা দুটো সুন্নার নজীর দেখতে পেতেন, তবে এর মধ্যে যেটা সবচাইতে কম ক্ষতিকর, সেটাই তিনি গ্রহণ করতেন। একে বলা হয় "ইস্‌তিহ্‌মান"। ইমাম হানিফার শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফের জটিল যুক্তি-পদ্ধতিকে (আল-হিয়াল) কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়েছে।

কতিপয় নিয়ম-কানুনের কঠোরতা ও তার মারাত্মক ফলাফল থেকে রেহাই পাবার জন্য জটিল যুক্তি-পদ্ধতি বা 'হিয়াল' ব্যবহার করা হত। কিন্তু এর অপব্যবহারও যে হয় নি, তা নয়।

নতুন সামাজিক পরিবেশের চাহিদা মেটানোর জন্যেই ইমাম আবু হানিফা রূপকমূলক যুক্তির অবতারণা করেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরবীয় আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়ে পড়ল এবং আইনের ক্ষেত্রে বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির নতুন পথ খুলে গেল। ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্যগণ ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশের ওপরে খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। ইরাক ও সিরিয়ায় ইমাম সাহেবের সমালোচকদের মধ্যে ইবনে আবু লায়লা ও আল-আউযায়ীর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁরাও সামাজিক পরিবেশের দ্বারা কম প্রভাবিত হন নি। যুফার নামে ইমাম সাহেবের জনৈক শিষ্য কিয়াসের সীমা পেরিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হন। অন্যদিকে আবার আবু ইউসুফ (মৃত্যু ৭৯৯ খৃস্টাব্দ) এবং বিশেষ করে মুহম্মদ ইবনে আল-হাসান আশশায়বানী (মৃত্যু ৮০৫ খৃস্টাব্দ) কিয়াসের ব্যাপারে খুব বেশী রক্ষণশীল ছিলেন।

মদিনায় ইমাম মালিক ইবনে আনাস (৭১৮-৭৯৬ খৃস্টাব্দ) তাঁর সমসাময়িক ইরাকী আইনবিদদের চাইতে রাসূলে আকরাম ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নার বহুল ব্যবহার প্রচলন করেছিলেন। ইমাম মালিক ও মদিনার আইনবেত্তাগণ মদিনা নগরীকে অভ্রান্ত মুসলিম সুন্নার কেন্দ্রস্থল বলে মনে করতেন। এ কারণেই মুসলিম আইনে এ চিন্তাধারার নাম দেয়া হয়েছে হাদিসপন্থী। কথিত আছে, ইমাম মালিক তাঁর আইনের সুবিখ্যাত কিতাব "আল-মুওয়াত্তা" প্রণয়ন করেছেন কয়েক হাজার হাদিস থেকে। এ হাদিসগুলোকে তিনি সতর জন আইন ও ধর্মবেত্তার কাছে তাঁদের অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। এ বিরাট সংকলনের মধ্যে শুধু হাদিসই স্থান পায় নি—এর মধ্যে স্থানীয় সুন্না ও মদিনার আইনবিদদের ব্যবহার-বিধান—এ সবই সংগৃহীত হয়েছিল। সুন্নার এ সংকলনটি প্রামাণ্য মুসলিম হাদিসের কিতাব হিসেবে গণ্য হত।

ইমাম মালিক হাদিস মনোনয়নের জন্য এক নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই এ পদ্ধতির আবিষ্কারক ছিলেন। মদিনার প্রখ্যাত আইনবিদগণও এ পদ্ধতি মেনে নিয়েছিলেন। এর নাম হল "ইজমা" বা ঐক্যমতে পৌঁছানো। অনেক ইরাকী আইনবিদের মধ্যে কিন্তু পরস্পরবিরোধী মতবাদ বিদ্যমান ছিল। ইমাম মালিকের মতে, হাদিসানুগ আইনের প্রশ্নে মদিনার আইনবিদদের ইজমাই আইনের ভিত্তি। সে হাদিস কখনও কখনও স্থানীয় আচার-অনুগ ছিল; আবার কখনও-বা হাদিসের স্বল্প-প্রামাণ্যতার দরুন তার বিচার করা হত ইজমা বা ঐক্যমতের আলোকে। ইরাকী আইনবেত্তাদের বিরুদ্ধে হিজাজী আইনবিদেরা ইজমাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন। আর বলতেন যে, ইরাকীরা রাসূলে আকরমের (সঃ) সুন্না থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। ইমাম মালিক অতঃপর "ইসতিসলাহ্" নামে এক নীতির

উদ্ভাবন করেন। তিনি এর ভিত্তিতেই সামাজিক স্বার্থ ও কল্যাণের তাগিদে আইনগত অভিমত ব্যক্ত করতেন। সমগ্র সমাজের ঐক্যমত থেকেই এ পদ্ধতির অবতারণা করা হয়। কাজেই একে ইজমার একটা অংশও বলা যেতে পারে।

ইজমার নীতি গ্রহণের ব্যাপারেও বিরোধিতা কম ছিল না। কারণ, এতে এই আশংকা ছিল যে, মানুষের হাতে তা হলে আইন প্রণয়নের অধিকার চলে যাবে। আইনবিদরা ইমাম মালিকের ইজমা-নীতির কিঞ্চিৎ রদ-বদল করে সব মুজতাহিদের মতামতের গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ঐক্যমতের গুরুত্ব স্বীকার করে এ পদ্ধতিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। নবী করিম হযরত মুহাম্মদের (সঃ) এই হাদিসের ভিত্তিতে "ইজমা" যুক্তিযুক্ত বলে সাব্যস্ত হয়েছে ঃ "আমার উম্মাতের লোকেরা ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে কখনও একমত হবে না।" আল-কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটিও অনেক সময় ইজমার যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়—'মুমিনদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কর' (৪ ঃ ১১৫)। হযরত অন্যত্র বলেছেন ঃ 'জ্ঞানীরা নবীদের উত্তরাধিকারী; তাই তাঁরা আল-কোরআনের ব্যাখ্যা করার পক্ষে উপযুক্ত বলে গণ্য হবেন।'

ইরাকী আইনবিদরা ইজমা সম্পর্কীয় মালিকী প্রত্যয় মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মদিনার আইনবিদদের মত ইসলামী-জগতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদেরও 'ইজমা'-নীতি প্রয়োগের অধিকার আছে। অবশ্য আঞ্চলিক সংকীর্ণতা তাঁদের মধ্যেও সমানে বিদ্যমান ছিল। ইমাম শাফেয়ী (৭৬৮-৮২০ খৃস্টাব্দ) আঞ্চলিক ইজমার বিরুদ্ধে সব চাইতে কঠোর গঠনমূলক সমালোচনা পেশ করেন। মুসলিম আইনবিদদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা সুবিন্যস্ত আইন-দর্শনের গোড়াপত্তন করেন এবং বহুলাংশে ইজমা-পদ্ধতির সম্প্রসারণ করেন। বিভিন্ন আইনবিদের প্রদত্ত ইজমাকে যদিও-বা তিনি একেবারে নস্যাৎ করে দেন নি, তবু সমগ্র মুসলিম সমাজের ঐক্যমতকেই তিনি চূড়ান্ত বলে মনে করতেন। তাঁর মতে 'ইজমা' হল আইনগত কর্তৃত্বের সহজতম পন্থা।

স্ববিন্যস্ত আইন-বিজ্ঞান রচনা করার জন্য ইমাম শাফেয়ী আল-কোরআনকে সব চাইতে উঁচুস্থান দিয়েছিলেন। আইনের উৎস হিসেবে সুন্নাকে তিনি খুব বেশী গুরুত্ব দেন নি। প্রামাণ্য হাদিস গ্রহণ করতে অবশ্য তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু রাসূলে আকরম হযরত মুহাম্মদের (সঃ) কাছ থেকে সরাসরিভাবে যে সব বাণী পাওয়া গেছে, কেবলমাত্র সেগুলোই তিনি গ্রহণ করেন। এর ফলে সুন্নার ব্যবহার বহুল পরিমাণে স্তিমিত হয়ে এল। আইনের বিশেষ বিশেষ সূত্র রচনার ব্যাপারে তিনি মুসলিম সমাজের অবিসংবাদিত ঐক্যমতকেই অধিক প্রাধান্য দিতেন। যে সব খুঁটিনাটি ব্যাপারে আল-কোরআনে বা সুন্নায় কোনও নজির পাওয়া যেত না অথবা ইজমায় পৌঁছানোও সম্ভব হত না, কেবল সে ব্যাপারেই তিনি কিয়াস ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, আইনের নীতি হিসেবে কিয়াসকে অন্যান্য উৎসগুলোর চাইতে অধিক

গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যায় না। কারণ, এগুলো কিয়াসের চাইতে অনেক বেশী সুদূরপ্রসারী। বিশেষ একটি ঘটনার ওপর ভিত্তি করে কিয়াস প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ, আইনের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী উপেক্ষা করে কিয়াস প্রয়োগ করা চলে না। যাঁরা আইনের উৎসরূপে কিয়াসের ভূমিকা একেবারেই স্বীকার করতেন না—আর যাঁরা কিয়াসের বহুল ব্যবহার প্রচলন করেছিলেন—এ দু'দলের মাঝামাঝি একটা সমঝোতা ইমাম শাফেয়ীর দৃষ্টিভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে।

ইমাম শাফেয়ী মুসলিম সমাজের ঐক্যমত-অনুগ যে ইজমা পেশ করেন, তা ক্ষণস্থায়ী হল। কারণ, অন্যান্য আইনবিদই কেবল যে এর বিরোধিতা করেন তা নয়, তাঁর শিষ্যগণও ইজমার ব্যবহার অনেকখানি কমিয়ে এনেছিলেন। ইমাম গাজ্জালী সর্বসম্মত ঐক্যমতের সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁর মতে এ ঐক্যমত কেবলমাত্র মৌলিক নীতিগুলোর ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত—আর খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আইনবিদদের ঐক্যমতের ওপরেই ছেড়ে দিতে হবে। ইবনুল হুমাম (মৃত্যু ৮৬১ হিজরী) হানাফী ও শাফেয়ী চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে প্রয়াস পেয়েছেন এবং একই যুগের আইনবিদদের ঐক্যমতকে ইজমা বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য অন্যান্যদের মত ইজমাভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌছানোর পূর্বেই ইজমার যুগ শেষ হয়ে গেছে—এমন কথা তিনি মনে করতেন না।

ইমাম শাফেয়ীর সার্বজনীন ঐক্যমতের মধ্যে সব চাইতে বড় গলদ হল পদ্ধতিমূলক। মুসলিম সমাজ ইজমায় পৌছানোর জন্য কোন্ সন্তোষজনক পদ্ধতি অবলম্বন করে অগ্রসর হবে, তার কোন হদিস মেলে নি। সমগ্র মুসলিম সমাজের সর্বসম্মত অভিমতের ওপর ভিত্তি করেই হোক বা আইনবিদদের ঐক্যমতের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হোক, গোটা ইজমার নীতিটাই পদ্ধতিমূলক ত্রুটি থেকে রেহাই পায় নি। আইনবিদগণ মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করতেন। তাই তাঁদের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। মুতাযিলাপন্থী আন্-নায়যাম প্রমুখ সমালোচকগণ এই কারণে ইজমার সমালোচনায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কোন কোন আইনবিদ বলেছেন যে, কতিপয় আইনবেত্তা যদি ঐক্যমতে পৌছান এবং তার বিরুদ্ধে কোনরূপ ওজর-আপত্তি না ওঠে, (ইজমা আস্সুবুত) অথবা যদি অধিক সংখ্যক আইনবিদ একটি মত প্রকাশ করেন এবং মাত্র কয়েকজন এর বিরোধিতা করে থাকেন, তবে সে ঐক্যমত (ইজমা) মুসলিম সমাজের ওপর সর্বতোভাবে প্রযোজ্য হবে। এভাবেই এঁরা এ বিষয়ে বিরোধের একটা সুরাহা করতে চেয়েছেন। এর ফলে অনৈক্যের সম্ভাবনা কমে আসলেও ঐক্যমতে পৌছাবার পদ্ধতি সম্পর্কে সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদান করা আর সম্ভব হল না। ইজমার সুনিশ্চিত সংজ্ঞা যেমন দেয়া হল না, আইনবিদের যোগ্যতা সম্পর্কেও তেমনি ধর্মবেত্তা ও আইনবিদগণ একমত হতে পারেন নি।

আইন সম্পর্কীয় বিভিন্ন মত ও পন্থা

হযরত মুহাম্মদের (সঃ) প্রাপ্ত ওহীর পরিসমাপ্তিতে আইনের উৎস সম্পর্কে মতবিশেষ মাথা তুলে দাঁড়াল। রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে বড় রকমের সমস্যার উদ্ভব হল। কারণ, হযরতের (সঃ) আকস্মিক ওফাতের ফলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা আর সম্ভব হল না। আইনগত ঐতিহ্যের ব্যাপারে এ সমস্যা দু'টি ইসলামের রাজনৈতিক ও আইনগত বিবর্তনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। একটি থেকে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়।

সব ধর্মবেত্তা ও আইনবিদ এ সম্বন্ধে একমত পোষণ করেছেন যে, আল-কোরআন আইনের অবিসংবাদিত উৎস। কারণ, তার মধ্যে অনুপম ওহীর সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু এখানেই ঐক্যমতের পরিসমাপ্তি হল। কারণ, আল-কোরআনে নতুন আইন প্রণয়নের কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা নির্দিষ্ট হয় নি। ফলে আইনের মর্মবাণী নিয়ে নয়—বিশেষভাবে তৈরী উৎস নিয়েই মত বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। আসলে আইনগত ব্যাপার নিয়ে এ মতবিরোধের সৃষ্টি হয় নি; এ সমস্যা আদতে ছিল ধর্মীয় ব্যাপার। কারণ, কোন্ কোন্ বিষয় আল-কোরআনে বিধিবদ্ধ ওহীর পরিপূরক হিসেবে ধরা যেতে পারে, তা মূলতঃ আইনের আওতায় পড়ে না। সমস্যাটি ধর্মীয় নীতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

গোড়াতে আইনবিদগণ প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা ও বিভিন্নতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। তাঁরা বলতেন যে, আল-কোরআনের নির্দেশে ধর্মীয় বিষয়ে বিরোধ অস্বীকৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম যে মুসলিম আইনবেত্তা আইনের ক্রমোন্নতিতে বিরোধের নিষ্ফলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তিনি হলেন ইবনুল মুকাফফা। খলিফা আল-মামুনের (৭৫৪-৭৭৫ খৃস্টাব্দ) আইন উপদেষ্টা হিসেবে তিনি খলিফার নামে একখানি আইনের বই উৎসর্গ করেছিলেন। এ বইতে সুসংবদ্ধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আইনগত বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য তিনি সুপারিশ করেছিলেন।

পরবর্তী যুগের আইনবিদগণ অবশ্য ঐক্যের চাইতে মতবিরোধ বেশী পছন্দ করতেন। স্থানীয় সংকীর্ণতা ও পূর্ববর্তী নজির অনুসরণ এ মতবাদ গঠনে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল। মতবিরোধের সপক্ষে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) অনেক হাদিস উদ্ধৃত করে দেখান হত। এ বিষয়ে এ হাদিসটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ "আমার উম্মতের লোকদের মতবিরোধ আল্লাহর রহমতস্বরূপ।"

আইনের চিন্তারাজ্যে স্বাধীনতার ফলে বিভিন্ন মতাদর্শ সৃষ্টির আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এক একটি দলের পুরোধা ছিলেন এক একজন জবরদস্ত মুজাতাহিদ, যাঁকে কেন্দ্র করে এক একটি শিষ্যমণ্ডলী গড়ে ওঠতে থাকে। মুজতাহিদগণ আইন পর্যালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এসব নেতৃস্থানীয় আইনবিদ পরস্পরকে আক্রমণ করতে কসুর করেন নি। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সমালোচকদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, মুসলিম সমাজ মোটামুটি

সব নেতৃস্থানীয় আইনবিদের প্রতিই ঔদার্য প্রদর্শন করেছে। কারণ, যদিও খুঁটিনাটি ব্যাপারে (ফুরু) তাঁদের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা ছিল, তবু তাঁরা সবাই স্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইজতিহাদের ব্যাপারে সুনির্দেশের অভাব ও বিরোধের দরুন আইনে বিভিন্ন মতাদর্শ ও দল-উপদলের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে লাগল। হিজরী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে (খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতক) ইসলামী জগতের আইনের রাজ্যে ছোট বড় বহুসংখ্যক মতাদর্শ ও দল-উপদলের সৃষ্টি হল। তখনও কিন্তু তাঁদের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ খুব বেশী প্রকট হয়ে ওঠেনি। অপেক্ষাকৃত উদার ও বহুলাংশে স্বাধীন যুক্তি ব্যবহারের (ইজতিহাদ) পক্ষপাতী হানাফী ও মুতাযিলাপন্থী থেকে শুরু করে রক্ষণশীল যাহেরী ও হাম্বলিগণ যে কেবল ইজতিহাদের খুব স্বল্প ব্যবহার করতেন তাই নয়, আল-কোরআন ও হাদিসের অবিকল শব্দার্থ করার দিকে তাঁদের বেশী ঝোঁক ছিল। গোড়াতে এক এক দলে মাত্র কয়েকজন শিষ্য ছিলেন। কয়েকটি বাস্তব ও দার্শনিক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এঁরা তাঁদের ইমামকেই অনুসরণ করতেন। সম্ভবতঃ কেবল হিজরী তৃতীয় শতক থেকেই ইমাম শাফেয়ী-প্রবর্তিত আইনগত সুসংবদ্ধতার ফলে বিভিন্ন দলের ইমাম সাহেবদের অনুসারীদের প্রতি বিশিষ্ট পরিভাষা "মযহাব" কথাটি ব্যবহার হতে লাগল। এর পূর্বে প্রত্যেক ইমামের অনুসারীদের 'আসহাব' বলে অভিহিত করা হত। সম্ভবতঃ ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফা তাঁদের মৃত্যুর পূর্বে একথা বুঝতে পারেন নি যে, ভবিষ্যতে তাঁদের নামে নতুন নতুন আইনের মতাদর্শ ও দল গড়ে উঠবে এবং তাঁরা এক একটি দলের প্রবর্তক বলে বিবেচিত হবেন। ইমাম মালিকের অনুসারীদের 'হাদিসপন্থী' (আহলে-হাদিস) ও ইমাম আবু হানিফার অনুসারীদের 'যুক্তিপন্থী' (আহলুর রায়) বলা হত; কিন্তু "আহলুল রায়" বলতে শুধু হানাফীদেরই বোঝানো হত না, বহুসংখ্যক ইরাকী আইনবিদকেও এ পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হত। এর মধ্যে ইমাম আবু হানিফার প্রতিদ্বন্দ্বী ইবনে আবি লায়লা, সুফিয়ান আস-সাউরী ও ইবনে শুবরুমার অনুসারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হত।

হিজরী চতুর্থ শতকে কেবল এ চারটি দলকে সমর্থনযোগ্য দল হিসেবে স্বীকার করা হত ঃ হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। তাঁদের আইনের কিতাবগুলো প্রামাণ্য বলে গণ্য হতে লাগল এবং তা থেকে এতটুকু বিচ্যুতি বা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা (বি'দা) ভ্রান্ত বলে মনে করা হত। ফলে ইজতিহাদের নীতি ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হতে লাগল। 'তাকলীদ' (হুবহু নকল) সে স্থান দখল করল। এর চারটি দলের নিয়ম-কানুন নির্বিবাদে মেনে নেয়াই রীতি হয়ে দাঁড়াল এবং ইজতিহাদের দরজাও গেল বন্ধ হয়ে। অবশ্য গোড়ার দিকে আইনবিদদের পারস্পরিক বিরোধ ও দল-উপদলের সংখ্যা সীমিত করার জন্যই তাকলীদের বহুল ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশঃ মুসলমানদের মধ্যে আইনগত যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে অনুদারতার মেঘ ঘনীভূত হতে

থাকে। ফলে তাকলীদ আইনের ক্রমোন্নতিতে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম ইবনে হাম্বলের অনুসারীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব অনুদার ভাবধারার ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমানভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। ইজতিহাদকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বানচাল করে দেন এবং সর্বপ্রকার কিয়াসকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা হাদীসের মধ্যেই সব সমস্যার সমাধান খুঁজতেন। তাঁদের মতে, ইজমাই ছিল সর্বসম্মত ও অপরিহার্য আইনের নীতি। কিন্তু হাম্বলীদের দৃষ্টিতে ইজমার স্থান অপ্রামাণ্য হাদিসের চাইতেও অনেক নীচে বলে গণ্য হত।

অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি হাম্বলী চিন্তাধারার কঠোর বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এঁরা হানাফী ও শাফেয়ী মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। হাম্বলীগণ সরকারী চাকরী গ্রহণ করতেন না; এমনকি সমর্থকদের কাছ থেকে উপহারও নিতে চাইতেন না। এ দুটি কারণে হাম্বলীদের বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁদের শায়েস্তা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে হাম্বলীগণ খুব দুর্বল হয়ে পড়লেন। পরে কতিপয় প্রভাবশালী আইনবিদ ও ধর্মবেত্তার প্রচেষ্টার ফলে হাম্বলী মতবাদ আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। বিশেষ করে খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত হাম্বলী আইনবেত্তা ইমাম ইবনে তাইমিয়ার (১২৬০-১৩২৭ খৃস্টাব্দ) শিক্ষার ফলে হাম্বলী মতাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। হাম্বলী মতবাদ ওহাবী আন্দোলনের মূল ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হয়। এসব সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হাম্বলী মতবাদ উপেক্ষা করে সবাই অন্যান্য মতাদর্শের দিকেই বেশী পরিমাণে ঝুঁকে পড়ে।

আরব দেশের বাইরে ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও তুরস্কে হানাফী ও শাফেয়ী নিয়ম-কানুন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মালিকী কানুন যদিও হেজাযে ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হয়ে এসেছিল, তবু খৃস্টান আধিপত্যের পূর্ববর্তী যুগে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে এর ব্যাপক প্রভাব ছিল। মুসলমানদের পক্ষে একটি দলের মতাদর্শ ত্যাগ করে আর একদলভুক্ত হবার তেমন কোন বাধা নেই। এ ব্যাপারে সামাজিক সমালোচনা বা সংস্কারের কোন অবকাশ নেই। একই পরিবারে এক ব্যক্তি হয়ত একটি দলের আবার আর একজন অপর আর এক দলের সমর্থক। এমনও দেখা গেছে যে, একটি পরিবারে চারটি পুত্র সন্তানের চারজনই চারটি বিভিন্ন দলে শামিল হয়েছেন।

শিয়া আইনের মতাদর্শ

মুসলিম সমাজে সুন্নীদের মধ্যে যে চারটি মতবাদ আছে, তা আগেই বলা হয়েছে। শিয়ারাও একটি দল। এ দলটার এতবেশী ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে যে, এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা উচিত। শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে মূল পার্থক্য হল ইমামতের প্রশ্ন (শিয়াদের দৃষ্টিতে খিলাফত) নিয়ে। শিয়া মতানুযায়ী ইমামতকে কোরেশ বংশের আওতা হতেও সংকীর্ণতর করে আহলুল বায়েত বা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত

ফাতিমার (রাঃ) বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। শিয়াদের মতে ইমামতের উপর সত্যিকার অধিকার যদি কারুর থেকে থাকে, তা শুধু হযরত আলীরই (রাঃ) ছিল। এ সম্বন্ধে শিয়াগণ দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হযরত আলীকে ইমাম নিযুক্ত করেন এবং তাঁর ওফাতের পর ইমামত তাঁর বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করেন। বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হযরত আলী (রাঃ) ইমামত ও আল্লাহর আইনের কর্তৃত্বের এখতিয়ার লাভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তত্ত্বজ্ঞান (তাভিল) প্রদান করা হয়। আর এর ফলেই তিনি আল-কোরআনের ব্যাখ্যা ও আইন রহিত করার ক্ষমতা লাভ করেন। এ তত্ত্বজ্ঞান হযরত আলী (রাঃ) থেকে যুগে যুগে তাঁর পুরুষ বংশধরদের ওপর বর্তায়।

ইসলামের মহাসত্য সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর বংশধরদের যে বিশেষ জ্ঞান আছে, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। তাঁর অনুগত শিষ্যগণ এ বিষয়টিকে আরও বহুদূর সম্প্রসারিত করেছেন। তাঁরা অতি-মানবীয় গুণাবলী হযরত আলী ও তাঁর বংশধরগণের ওপর আরোপ করেছেন ও সাধারণ ভ্রান্ত মানুষের ঊর্ধ্বস্তরে তাঁদের অধিষ্ঠিত করেছেন। শিয়াপন্থী অনেক ব্যক্তির কাছে হযরত আলীর (রাঃ) স্থান হযরত মুহাম্মদের (সঃ) কিঞ্চিৎ ওপরে। কোন কোন চরমপন্থী বলেন যে, আল্লাহর ওহী মূলতঃ হযরত আলীর (রাঃ) ওপরেই নাজিল হবার কথা ছিল। কিন্তু ফেরেশতা জিবরাইল ভুল করে তা হযরত মুহাম্মদের (সঃ) নিকট নিয়ে যান। অধিকাংশ শিয়ার মতে হযরত আলী (রাঃ) শাসন পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহ-প্রদত্ত আইনের অধিকার (Divine right) লাভ করেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁকে এমন মৌলিক তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, যার ফলে তিনি সাধারণ মানুষের সমালোচনার ঊর্ধ্বে এক উচ্চ মার্গে উন্নীত হয়েছেন। হযরত আলী ও তাঁর বংশধরদের সঙ্গে খলিফাদের তুলনা করা যেতে পারে না। কেননা, তাঁর বংশধরেরা একটি বিশেষ অভ্রান্ত ইমাম গোষ্ঠী বলে বিবেচিত হতেন।

ইমামত নিয়ে নানা মতবিরোধের ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। একই কারণে শিয়াদের মধ্যেও অনেক দল ও উপদলের উদ্ভব হয়েছিল। যায়েদীদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হযরত আলী (রাঃ) বংশধরদের মধ্যে ইমাম নির্বাচনের পক্ষপাতী। যায়েদী ভিন্ন আর যে সব উপদল রয়েছে, তাঁরা হলেন 'দ্বাদশপন্থী' ও 'সপ্তমপন্থীর' দল। ষষ্ঠ ইমাম জাফর আল-সাদেকের (মৃত্যু ৭৬৫ খৃস্টাব্দ) মৃত্যুর পর এ বিরোধের সূত্রপাত হয়। দ্বাদশপন্থীগণ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মুসা আল-কাযিমকে ইমাম বলে সাব্যস্ত করেন। আর সপ্তমপন্থীগণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইসমাইলকে ইমাম হিসেবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। শিয়াদের মধ্যে সংখ্যালঘু দলটি ইসমাইলকে সমর্থন করতেন। তাঁর বংশধরগণই মিসরে ফাতিমী খিলাফত (৯৬৯-

১১৭১ খৃস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সপ্তমপন্থীদের আজকাল পাকিস্তান, ভারত, মধ্য এশিয়া, সিরিয়া, পারস্য উপসাগরীয় উপকূল ও পূর্ব আফ্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। এদেরই বলা হয় "ইসমাইলী"।

শিয়াদের সংখ্যাগুরু দলটি অতীতে মুসা আল-কাযিম থেকে শুরু করে দ্বাদশ ইমাম মুহম্মদ ইবনুল হাসান আল আসকারীর অন্তর্ধান (হিজরী ঃ ২৬০ ঃ খৃস্টীয় ৮৭৪) পর্যন্ত তাঁর সব বংশধরকে সমর্থন করে এসেছে। বর্তমানকালেও তাঁরা এ মতবাদের সমর্থক। এঁদেরই বলা হয় দ্বাদশপন্থী। ইমাম মুহম্মদের অন্তর্ধানের পর দ্বাদশপন্থীগণ আর কোন ইমাম মনোনীত করেন নি। এঁদের মতে ইমামের মৃত্যু ঘটেনি, তিনি অনুপস্থিত রয়েছেন মাত্র। তাঁদের বিশ্বাস, তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আত্মা সর্বক্ষণ অদৃশ্যালোকে অবস্থান করছে। ইমাম সাহেবের সাময়িক অনুপস্থিতি ("গায়েব") ঘটেছে মাত্র। পরিশেষে তিনি ইমাম মেহদী বা প্রাণবক্তা হিসেবে পাপ-কালিমাময় পৃথিবীতে সুবিচার ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় অবতীর্ণ হবেন। এই হল দ্বাদশপন্থীদের বিশ্বাস। ইমামের অনুপস্থিতিতে বর্তমানে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মুজতাহিদ বা পণ্ডিতগণ ধর্মীয় আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। শিয়াগণ সুন্নী খিলাফতের বিরোধিতা করতেন। তাই কতিপয় সুন্নী খলিফা ও সুলতানের হাতে তাঁদের ক্রমাগত নির্যাতিত হতে হয়। ফলে তাঁরা বিশ্বাস গোপন রাখার নীতি (কিতমান বা তাকিয়া) গ্রহণ করেন। এ নীতিতে নিরাপত্তার খাতিরে নিজের বিশ্বাস লুকিয়ে রাখাকে সমর্থন করা হত। মুজতাহিদগণ এটাকে বিশ্বাসের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গণ্য করেছেন।

মনে রাখা দরকার যে, আইনের বিষয়ে শিয়া মতাবদ সুন্নী আইনের চাইতে অনেক বেশী কর্তৃত্বমূলক। কিন্তু বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার সংযোগ ছিল নিতান্ত সামান্য। ব্যাখ্যা প্রদানের চূড়ান্ত ক্ষমতা ইমামের ওপরই ন্যস্ত ছিল। তার ওপর আবার ইমাম সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলে বিবেচিত হতেন এবং আইনের সত্যিকার অর্থ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। ইমামের অনুপস্থিতিতেও আইনের প্রকৃতি বদলায় নি। কেননা, মুজতাহিদগণ ইমামের প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করতেন। নিজের যুক্তি ও বিবেক অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার তাঁদের ছিল না। কাজেই শিয়া আইনে ইজতিহাদ নতুনরূপে দেখা দেয়। সুন্নী আইনের ইজতিহাদ থেকে এ ইজতিহাদের পার্থক্য বেশ সুস্পষ্ট। বিশেষ করে ইজতিহাদের তথাকথিত দ্বার-রুদ্ধ হবার পূর্বে এ পার্থক্য খুবই প্রকট ছিল।

সুন্নী আইন-বিজ্ঞানের মত শিয়া আইনেও আল-কোরআনকেই আইনের প্রধান সর্বসম্মত উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। কিন্তু শিয়াদের স্বীকৃত ইমামের অনুমোদিত হাদিস ছাড়া আর কোন হাদিস তাঁরা মেনে নিতে চান না। ইমাম যদি

ইজমার ব্যাপারে শরীক না হন, তবে সে ইজমাও প্রত্যাখ্যান করা হয়। কারণ, শিয়া মতাদর্শ অনুসারে গোটা সমাজ বা উলামা সম্প্রদায় কারোরই আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্ণ ক্ষমতা নেই। উদারপন্থী সুন্নী মতের সঙ্গে তুলনা করলেই একথা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, শিয়াদের আইন প্রণয়নে কিয়াসের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয় নি। কারণ, হাদিস বা পূর্ববর্তী ইমামদের আচার-ব্যবহার কর্তৃক সমর্থিত না হলে মুজতাহিদদের মতামত কিছুতেই গ্রাহ্য হয় না। খুঁটিনাটি ব্যাপারে (ফুরু) শিয়া ও সুন্নী আইনের পার্থক্যটুকু বিভিন্ন সুন্নী মতাদর্শের মধ্যকার পার্থক্যের চাইতে মোটেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন

মানবজাতির ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বহিঃশত্রুদের আক্রমণের ভয় না থাকলে একটি সভ্যতার মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও জাতির সমন্বয় গড়ে ওঠে। এসব জাতির পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয়ে আচার-ব্যবহারের ভূমিকা সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। গোটা জাতি একই কর্তৃত্ব বা আইন দ্বারা শাসিত হয়, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। সহজেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন নিকট-প্রাচ্য, গ্রীস, রোম, চীন, ইসলাম জগত ও পাশ্চাত্য খৃস্টান রাষ্ট্র গোষ্ঠী; প্রত্যেক দেশে বা অঞ্চলে এক একটা করে স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। শান্তির সময়ে অথবা যুদ্ধকালে একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলো নিয়ম-কানুন ও ব্যবহার-বিধি গড়ে ওঠে। ব্যারন করফ বলেন, পাশাপাশি বাস করার ফলে নৈতিক ও আইনগত বিধি-নিষেধ গড়ে ওঠে। কালক্রমে এগুলো আন্তর্জাতিক আইনের বিধানে রূপান্তরিত হয়। এমনকি, প্রাচীন জাতিদের মধ্যেও দেখা যায় যে, এই আইন ছিল তাদের আচার-ব্যবহারেরই অংশ বিশেষ। সভ্য জাতিদের মধ্যে পরবর্তীকালে এগুলো সুসংবদ্ধ আইন হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে। মঁতেসক্যু বলেছেন, সব জাতির মধ্যে, এমন কি ইরকোয়দের (উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার আদিম জাতি) মধ্যেও আন্তর্জাতিক আইনের বিধান বহাল ছিল। কিন্তু এরা খুব সভ্য ছিল না; যুদ্ধবন্দীদের গোশত খাওয়ার রীতি এদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সে যুগে সংঘর্ষ ও অরাজকতার রাজত্ব ছিল। তবু একথা তারা খুব স্পষ্টরূপে বুঝতে পারল যে, সার্বিক কল্যাণের দিক থেকে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের মত ব্যবস্থা এবং প্রতিহিংসা থেকে অব্যাহতি পাবার তাগিদে কতকগুলো নিবৃত্তিমূলক বিধি অনেক বেশী ফলপ্রসূ হবে। পাশাপাশি বসবাসের ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যখন মাত্র গুটিকয়েক আইনের প্রয়োজন থাকে, তখনই কয়েকটি জাতি নিয়ে এক বৃহত্তর সামাজিক সংস্থা গড়ে ওঠতে পারে।

অতীত যুগে আন্তর্জাতিক আইন আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের মত বিশ্বব্যাপী বা সর্বজনীন ছিল না। কারণ, তখন আন্তর্জাতিক আইনের কাজ ছিল একটি বিশেষ এলাকার ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও জাতিগুলোর পরস্পর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ আইন কেবলমাত্র একটি সভ্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাছাড়া, আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন ও প্রাচীন আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে আর একটি পার্থক্য হল এই যে, প্রাচীন আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্র ছিল খুবই সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কারণ,

এ আইন-বিধান পৃথিবীর জাতিগুলোর মধ্যে আইনের ব্যাপারে পারস্পরিক সাম্য মেনে নেয় নি। কিন্তু বিভিন্ন জাতির আইনগত সাম্য আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি রচনা করেছে। তাই তখন বিভিন্ন জাতির আন্তর্জাতিক আইন সুসংবদ্ধ ও একত্রিত করে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আইন-ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। অবশ্য এক আইন বিধান অপর আইন থেকে অবাধে প্রচুর মালমশলা সংগ্রহ করেছে। তবু তা হয়ত বা অস্বীকৃত রয়ে গেছে। কারণ, প্রত্যেকটি আইন-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে এসেছে। একটি সভ্যতার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তার আইন-ব্যবস্থারও বিলুপ্তি ঘটেছে। কারণ, একটি সভ্যতার কল্যাণেই তার আইন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বেন্থামই প্রথম "আন্তর্জাতিক আইন" কথাটির প্রবর্তন করেছিলেন। "আন্তর্জাতিক আইন" কথাটিই "জাতিসমূহের আইনের" চাইতে বেশী প্রচলিত হয়ে গেছে। "জাতিসমূহের আইন" কথাটি কিন্তু অধিক সুদূরপ্রসারী এবং বিচিত্র সমাজব্যবস্থায় একে প্রয়োগ করা চলে। বর্তমান গ্রন্থে "জাতিসমূহের আইন" কথাটিই ব্যবহার করা যাক।

ইসলামের মিশন ও অন্যান্য জাতির প্রতি ইসলামের মিশন স্বতঃই অন্যান্য অমুসলিম দেশের সঙ্গে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ায়। ইসলামের শেষ লক্ষ্য হল সমগ্র দুনিয়ার সমাজকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা। কিন্তু সব জাতিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা সম্ভব হয় নি। অনেকগুলো অমুসলিম গোষ্ঠী রয়ে গেল; যুগে যুগে এদের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রকে বোঝাপাড়া করতে হয়েছে।

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃতি অন্যান্য আইন বিধান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। এ আইনকে আইনের সাময়িক বিধি-ব্যবস্থা বলে মনে করা হত। কিতাবিগণ (খৃস্টান, ইহুদী প্রভৃতি) ছাড়া অন্য সব জাতি যতদিন পর্যন্ত মুসলমান না হন, কেবলমাত্র ততদিন পর্যন্তই এ আইন বলবৎ থাকবে। কাজেই ইসলামের মিশন যদি সফল হয়, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয়ের আর প্রয়োজন হবে না। ইসলামের বিস্তৃতি একসময়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; সুতরাং যতদিন পর্যন্ত অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানকে বাস করতে হবে, ততদিন মুসলিম অমুসলিম সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলো আইনের প্রয়োজন রয়েছে।

কয়েকটি জাতি নিয়ে একটি জাতিপুঞ্জের অস্তিত্ব আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত হয়েছে। এক একটি জাতির সম্পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা ও সমমর্যাদাও স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন কিন্তু মুসলিম জাতি ছাড়া আর কোন জাতিকে স্বীকার করে না। কারণ, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল, সমগ্র দুনিয়াকে একই ইমামের অধীনে এবং একই আইন ও ধর্মের আওতায় আনা। প্রাচীন রোম ও মধ্যযুগীয় খৃস্টান রাষ্ট্রের আইন-ব্যবস্থার মতোই মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন সার্বজনীন রাষ্ট্রের প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহ-প্রদত্ত সার্বজনীন আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে খৃস্টান রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্র উভয়ই একথা ধরে নিয়েছিল যে, সব মানুষ একই গোষ্ঠীর

অন্তর্ভুক্ত। এ গোষ্ঠী এক আইন দ্বারা পরিচালিত ও একই শাসকের কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার করাই ছিল এর লক্ষ্য। গোষ্ঠীর রাজনৈতিক, নৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থের ওপরেই এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নির্ভর করত; পারস্পরিক সম্বলিত ও সুযোগ সুবিধা এ আইনের পেছনে খুব বেশী কাজ করে নি।

তাছাড়া মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন প্রযোজ্য হত ব্যক্তির ওপর। আঞ্চলিক গোষ্ঠীর ওপর এ আইন প্রয়োগ করা চলত না। কারণ, প্রাচীনকালের আইন বিধানগুলোর মত ইসলামী আইন-ব্যবস্থা স্থান-কেন্দ্রিক ছিল না; এ ছিল একান্তরূপেই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। যে দেশের অধিবাসীই হোক না কেন, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী হিসেবে সব মুসলমানের ওপর এ আইন মেনে চলা বাধ্যতামূলক ব্যাপার। আধুনিক যুগে বস্তুগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির চাপে আইন বিধানকে গোষ্ঠীগতভাবে প্রযুক্ত না করে, একে স্থান-নির্ভর করে আনবার রীতি চালু হয়েছে। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সার্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলাম তার আদর্শের প্রতি আনুগত্যকেই সবচাইতে বেশী মর্যাদা দিয়েছে। এ ব্যাপারে কোন বিশেষ রাষ্ট্রীয় সীমানা স্বীকার করা হয় নি। ইসলামী জীবন-দর্শন অনুযায়ী সাধুতা ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যই ছিল সুষ্ঠু নাগরিকত্বের মাপকাঠি। জাতি, শ্রেণী বা মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্যের কোন মূল্য নেই। আইনের ব্যক্তিগত ভিত্তিটা মুসলিম আইনবেত্তাগণ কোনদিনই বাদ দেন নি। এ আইন প্রযোজ্য ছিল ব্যক্তির ওপরে। আধুনিক গোষ্ঠীর ওপর এ আইন প্রয়োগ করা হত না।

পরিশেষে একথাও মনে রাখা উচিত যে, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন নয়। ইসলামী জগতের ভেতরে-বাইরে মুসলিম অমুসলিমের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আইনের সম্প্রসারণ করেই আন্তর্জাতিক আইনের জন্ম হয়েছে। সূক্ষ্ম বিচারে ধরা পড়বে যে, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনে জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উৎস বা সমর্থন (Sanction)-এর ব্যাপারেও কোন বিভিন্নতা নেই। হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ইহুদী আইন-বিধান ও মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন প্রাণবস্তুতে প্রায় একই জিনিস। ইহুদী জাতি ও অইহুদী জাতিদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে এ আইন বলবৎ ছিল। প্রাথমিক যুগে মুসলমান আইনবিদগণ 'জিহাদে' যুদ্ধক্ষেত্রে লব্ধ ধনসম্পদ আমান (নিরাপত্তা) ও আলখারাজ, এসব বিষয়ের সঙ্গেই বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনা করতেন। বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়টি পরে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এবং আন্তর্জাতিক আইন বুঝতে "আস-সিয়ার" কথাটি প্রচলিত হয়ে যায়। আইনের যে শাখাটি কেবলমাত্র বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রযুক্ত হয়, তারই নাম "আস-সিয়ার"। কোন কোন আইনবিদ অবশ্য 'জিহাদ' কথাটিই চালু রেখেছিলেন।

শরিয়তের উৎস বা সমর্থন Sanction) যা, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনেরও ঠিক তাই। আন্তর্জাতিক আইন বলতে আমরা যদি অন্যান্য জাতির সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয়ের সমগ্র আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থার কথা বলি, তবে আইনের চিরাচরিত মূল (উসুল) ও শরিয়তের উৎস ভিন্ন আরও অনেক জায়গা থেকেই মুসলিম

আইনের নজির খুঁজে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, মুসলিম অমুসলিম সম্পর্কিত চুক্তি, জনসমক্ষে খলিফার উক্তি ও যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতিদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত নির্দেশাবলী (যেগুলো আইনবিদগণ পরবর্তী যুগে লিপিবদ্ধ করেন) এবং বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে মুসলিম আইনবিদদের মতামত, অনুশীলন ও ব্যাখ্যা। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে একথা বলা চলে যে, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের উৎসগুলো আধুনিক যুগের আইনবিদ ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিধি (Statute) সম্মত উৎসগুলোর সঙ্গে একই পর্যায়ে পড়ে। এর মধ্যে আছে ঃ মতৈক্যমূলক চুক্তি (Agreement), আচার-ব্যবহার, চুক্তি ও কর্তৃত্ব। আল-কোরআন ও প্রামাণ্য হাদিস কর্তৃত্বের পর্যায়ে, আরবীয় প্রচলিত আইন আচার-বিধির পর্যায়ে, অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির আইন মতৈক্যমূলক চুক্তির পর্যায়ে আর ফতোয়া, আইন-সম্পর্কীয় তফসীর, কিয়াস ও অন্যান্য প্রামাণ্য সূত্র থেকে লব্ধ আইনের ব্যাখ্যা ও রূপায়ণের ব্যাপারে খলিফাদের বাণী ও অভিমত যুক্তির পর্যায়ে পড়বে। এসব বাণী, মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রথম যুগের আইনের তফসীর ও ফতোয়ার সংকলনের মধ্যে পাওয়া যায়। আইনের বিবর্তনে এসব আইনের গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্তসারগুলো বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে আইনবিদগণ যেভাবে এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ও বহুল ব্যবহার করেছেন, তা থেকে এ প্রভাব আরও বেশী সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় খণ্ড

যুদ্ধ সম্পর্কীয় আইন

জেহাদ

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমিকা

একটি ধর্মকে সার্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সে রাষ্ট্র ক্রমঃপ্রসারণশীল হতে বাধ্য। ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামকে সারা দুনিয়ার মধ্যে সব চাইতে শক্তিমান জীবনার্দশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। কারণ, আল্লাহর আইন-ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণই হল এ রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ। প্রাথমিক যুগে ইসলামের মিশন দ্রুত ও সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হয়েছিল। ইসলামের শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশ ও প্রসার একইভাবে এগিয়ে চলল। ফলে ইসলামী রাষ্ট্র পুরাতন পৃথিবীর অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোমান সাম্রাজ্যের মত সুবিশাল রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

অন্যান্য সার্বজনীন রাষ্ট্রের মত দ্রুত প্রসারী মুসলিম রাষ্ট্রের প্রসারণেরও একটা সীমা ছিল। অতীতের বিজয়ী মুসলিম সেনানীগণ পাশ্চাত্য দেশে তুরের যুদ্ধে (খৃস্টীয় ৭৩২) পরাজিত হন। আর প্রাচ্যদেশে তাঁরা ভারতীয় এলাকার বাইরে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। তাই মুসলিম প্রসারের শক্তিশালী তরঙ্গ গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। পিরেনিজ পর্বতমালা ও সিন্ধুনদ অবধি এসে মুসলিম রাষ্ট্র বিস্তারের ধারা হঠাৎ থেমে গেল। সেদিনের পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা আর সম্ভব হল না। মুসলিম রাষ্ট্রের বাইরেও অনেকগুলো জাতি ও গোষ্ঠী রয়ে গেল, যাদের সাথে মুসলিম শাসকদের একটা সমঝোতায় আসতে হয়েছিল। আইনের ঔপপত্তিক বিধানে যদিও বা এ সমঝোতা ছিল নিতান্ত সাময়িক, তবু পরবর্তী যুগের ইসলামী ইতিহাসে এ সম্পর্কটি অনেকটা স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে।

মুসলিম আইনে তাই দুনিয়াকে দুভাগে বিভক্ত করা হল ঃ দারুল ইসলাম (ইসলামের আবাসভূমি) ও দারুল হারব (সমর-ভূমি)-রূপে। আরও সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় ঃ ইসলাম জগৎ ও সমর জগৎ। প্রথমটি বলতে বোঝাত মুসলিম শাসিত দেশ। এখানকার অধিবাসীরা ছিলেন জন্মগত বা ধর্মান্তরিত মুসলিম। যে সব গোষ্ঠীর লোক তাদের ধর্ম বদলায় নি ও যারা জিযিয়া করের বিনিময়ে তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও তাহযীবের রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল, তারাও দারুল ইসলামে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশিষ্ট সনদের মাধ্যমে অমুসলিমগণ মুসলিম শাসন মেনে নিয়েছিল। এ সব সনদই মুসলিম অমুসলিমের সম্পর্ক নির্ণয় করে এসেছে। মুসলিম জগতের বাইরে যে সব রাষ্ট্র ও গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল, তাদের সম্মিলিত সংস্থার নাম হল দারুল হারব। এখানকার অধিবাসীদের অবিশ্বাসী বলে গণ্য করা হত।

সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছিল ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। আইনের দৃষ্টিতে তাই দারুল ইসলামের সঙ্গে দারুল হারবের যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান ছিল সর্বক্ষণ। মুসলমানদের কর্তব্য হল বুঝিয়ে শুনিয়ে ইসলামী আদর্শ প্রচার করা। আর খলিফা ও তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষগণ যুদ্ধ বা জিযিয়া থেকে রেহাই পাবার পন্থা হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শকে বিকল্পরূপে পেশ করতেন। আইনের দৃষ্টিতে ইসলামী আইন বাস্তবে রূপায়িত করাই ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। অন্য কোন আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইসলামী রাষ্ট্র বাধ্য ছিল না। অমুসলিমগণ যখন যুদ্ধ এড়িয়ে ইসলামী আদর্শকে মেনে নিত, তখনও ইসলামী আইনের বিষয়ে কোন প্রকার শৈথিল্য বরদাশত করা হয় নি। কাজেই জেহাদই যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলিম-অমুসলিমের সম্পর্কের পথ নির্দেশ করে এসেছে। দারুল হারবকে দারুল ইসলামে পরিণত করার রাষ্ট্রীয় হাতিয়ারই হল জেহাদ। কিন্তু অমুসলিমের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে জেহাদ একমাত্র পন্থা নয়। জেহাদ ছাড়া অন্যান্য শন্তিপূর্ণ পন্থাও ছিল। যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর আলাপ-আলোচনা, সালিসী ও চুক্তি সম্পাদন—এগুলোই মুসলিম-অমুসলিমের সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রয়োগ করা হত।

প্রসারণশীল মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমেই মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি। আর এভাবেই নানা বিধি-ব্যবস্থা গড়ে উঠল। যুদ্ধ বা শান্তিকাল, সব সময়েই মুসলমানেরা এগুলো মেনে চলত। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর সংঘর্ষকালে যে সব নীতি এবং পন্থা অনুসরণ করা হত, তাকে অতি অমানুষিক ও বর্বরোচিত বলে মনে করা হত। কারণ, এসব সংঘর্ষের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ-ভিত্তিক ছিল। ইসলামের আগমনে জেহাদ বা ন্যায়সংগত যুদ্ধ ভিন্ন আর সব রকম যুদ্ধ ও হানাহানির অবসান ঘটে। বিশেষ সতর্কতার সাথেই আইনবিদগণ ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে আইনের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। যুক্তিবাদিতা ও ধর্মীয় সমর্থনই ছিল এ ব্যবস্থার মূলে।

পঞ্চম অধ্যায়
জেহাদের নীতি

জেহাদের তাৎপর্য

জেহাদ কথাটি এসেছে "জাহাদা" থেকে। এর মানে হল, যে সাধ্যমত চেষ্টা করেছিল। ধর্মীয় আইনে এভাবে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে ঃ আল্লাহর পথে নিজের শক্তিকে নিয়োজিত করা। অর্থাৎ আল্লাহর আদর্শ প্রচার করা আর তাঁর নীতিকে দুনিয়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। জেহাদের মাধ্যমেই ব্যক্তি নাজাত বা মুক্তিলাভ করে। বেহেশতের সুখলাভ করার প্রত্যক্ষ পন্থা হিসেবে আল্লাহতায়ালা জেহাদকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল-কোরআনে নিম্নলিখিত নির্দেশ থেকে জেহাদের এ সংজ্ঞাটি পাওয়া যায় ঃ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের আমি সেই কাজের নির্দেশ করব, যা তোমাদের কঠোর শাস্তি থেকে রেহাই দেবে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ইমান রাখ এবং আল্লাহর পথে তোমাদের বিত্ত-সম্পদ ও ব্যক্তিগত সত্তা নিয়োগ করে জেহাদে ব্রতী হও। তোমরা দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন হলেই বুঝতে পারবে যে, এটা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। তোমাদের পাপ-কালিমা তিনি ক্ষমা করে দেবেন ও তোমাদের জন্য এমন ফুলের বাগিচা তিনি তৈরি করে রাখবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। আর তোমাদের জন্য মনোরম আবাসভূমি রয়েছে বেহেশতে—এ কতবড় নেয়ামত"—(আল-কোরআন ঃ আস-সাফা ঃ ৬১-১০-১৩)।

ব্যাপকতর অর্থে জেহাদ বলতে সাধনা বা প্রচেষ্টা বোঝায়। জেহাদ বলতে কেবল যুদ্ধ বোঝায় না। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও যুদ্ধ পরিচালনা—এ উভয় পন্থার মাধ্যমেই আল্লাহর পথে সাধনা বা প্রচেষ্টা চালান সম্ভব হতে পারে। জেহাদ নিছক ধর্মপ্রচার হিসেবেও গণ্য হতে পারে। গোড়ার দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোতে নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন ও এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। নিম্নলিখিত আয়াত থেকে তার নজির মিলে ঃ "যে ব্যক্তি জেহাদ পরিচালনা করে, সে তার আত্মার জন্যই তা করে"। —(আল-কোরআন ঃ ২৯ ঃ ৫)। আত্মার সদগতি বা নাজাতের দিকেই এখানে বেশী নজর দেয়া হয়েছে। ধর্মপ্রচারের বিষয় এখানে বড় একটা গুরুত্ব পায় নি। মদিনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোতে কিন্তু জেহাদ বলতে যুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে। কোন কোন সূরায় জোহদ বলতে নিঃসন্দেহে শুধু যুদ্ধকেই বোঝানো হয়েছে।

আইনবিদগণ বিশ্বাসীদের পক্ষে জেহাদের চারটি পন্থা নির্দেশ করেছেন ঃ মনের জেহাদ, জিহ্বার জেহাদ, হস্তের জেহাদ ও তরবারীর জেহাদ। শয়তানকে শায়েস্তা করার জন্য ও তার ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পাবার জন্য হল মন দিয়ে জেহাদ। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) দৃষ্টিতে এ জেহাদ ছিল সব চাইতে বড় জেহাদ। সত্য-প্রতিষ্ঠা ও অসত্য দূরীকরণের জন্য জিভ ও মনের জেহাদ বিশেষ কার্যকরী। চতুর্থটি হল সত্যিকার যুদ্ধ। অমুসলিম ও ইসলামী আদর্শের দুশমনদের বিরুদ্ধেই এ জেহাদ পরিচালিত হয়। জেহাদ চালিয়ে যাবার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন বিসর্জন দেয়া বিশ্বাসীদের কর্তব্য।

জেহাদ বা ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ

যে জেহাদ বিশেষ একটি আইন-ব্যবস্থার বিধি-নিষেধাদি পালনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয় কিংবা কোন ধর্মীয় নীতি বা সামাজিক রীতি-নিয়মের ওপর ভিত্তি করে চালিত হয়, তা যথার্থ বিবেচিত হয়। প্রাচীন রোমের মত ইসলামেও ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের নীতি রয়েছে। যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য একটা যুক্তিযুক্ত কারণ ও আনুষ্ঠানিক বিধি-নিষেধ থাকা চাই। প্রাচীন রোমের মত ইসলামেও যুদ্ধের ব্যাপারে শুধু যে ন্যায় নীতির অস্তিত্ব ছিল তাই নয়, তা ধর্মসঙ্গত ও আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত কি না সেকথাও বিচার্য।

যুদ্ধ যখন সামাজিক আচার-ব্যবহার ও বিধির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, তখন তা ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হয়, এ ধারণা অতি প্রাচীনকালের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যায়। এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর এক গোষ্ঠীর প্রতিশোধের নীতির মধ্যেই যুদ্ধের বীজ সুপ্ত রয়েছে। আরাস্তু তাঁর "রাষ্ট্রনীতি" নামক বইতে কোন কোন যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত বলে অভিহিত করেছেন। রোমানদের যুদ্ধের আইন একটি সংগ্রাম-পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হত। এ পরিষদের একজন সভাপতি ছিলেন। ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের আইন-কানুন রচনা করাই ছিল এ পরিষদের কাজ। মধ্যযুগীয় খৃস্টান রাষ্ট্রে সাধু অগাস্টিন ও আইসডর-দ্য-সেভিল সিসেরোর ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের প্রত্যয় দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। সাধু টমাস অ্যাকুইনস মুসলিম দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের নীতি ছিল ইসলামী জেহাদেরই মত। এ কারণেই বোধহয় জেহাদের বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলেও খারেজী আইন-ব্যবস্থা ভিন্ন আর কোন আইনের শাখাতেই জেহাদকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে গণ্য করা হয় না। তার কারণ হল এই যে, পাঁচটি নীতি বাস্তবায়িত করা রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ব্যক্তিকে এ কর্তব্যগুলো পালন করতে হয়—রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ন্যায়সঙ্গত জেহাদ সবসময়েই রাষ্ট্রের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। আইনের দৃষ্টিতে ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভ, যেমন— নামাজ, রোজা ইত্যাদি হল ব্যক্তিগত কর্তব্যের অন্তর্গত (ফারদ আয়েন) প্রত্যেক মুমিনকে এগুলো ব্যক্তিগতভাবেই সমাধা

করতে হবে। আর এ কর্তব্য পালন না করলে ব্যক্তিগতভাবেই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আকস্মিক আক্রমণের সময় মুসলিম নরনারীর জেহাদের কর্তব্যের কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে, জোহদ সব আইনবিদের দৃষ্টিতেই সমগ্র মুসলিম জাতির সামগ্রিক কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ব্যাপারে আইনবিদদের মধ্যে মতবিরোধ নেই। এ কর্তব্য "ফারদ-ই-কিফা"য়ার পর্যায়ভুক্ত। সমগ্র মুসলিম জাতির ওপরই এ গুরুভার ন্যস্ত হয়। কেবল ব্যক্তির ওপর এ দায়িত্ব বর্তাতে পারে না। মুসলিম সমাজের একটা বিশেষ অংশ যদি এ কর্তব্য সুসম্পন্ন করেন, তবে অন্যান্য লোকের ওপর জেহাদ আর কার্যতঃ অবশ্য কর্তব্যরূপে গণ্য হয় না। আর জেহাদের কর্তব্য যদি মোটেই পালিত না হয়, তবে বুঝতে হবে, এ সমাজ সত্যপথ থেকে দূরে সরে গেছে।

ব্যক্তির কর্তব্য বলে গণ্য না হয়ে জেহাদ যে গোটা মুসলিম সমাজের কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়, এর মধ্যে দুটো নিগূঢ় তাৎপর্য নিহিত আছে। প্রথমতঃ, প্রতিটি মুসলমানই যে জেহাদে শরীক হবে, এমন নয়; কারণ, সব মুসলমানকে সৈন্যদলে ভর্তি করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর জন্যও লোকের দরকার। তাছাড়া খোঁড়া, অন্ধ ও অসুস্থ লোকেরা সৈনিক হবার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে শরীক হওয়া থেকে মহিলা ও শিশুগণ রেহাই পেত। অবশ্য অনেক মহিলা পরোক্ষভাবে যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন।

দ্বিতীয়তঃ, জেহাদ ব্যক্তির কর্তব্য হিসেবে গণ্য না হয়ে সমগ্র সমাজের কর্তব্য হওয়ায় সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জেহাদ পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল। এ ক্ষমতা নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—রাষ্ট্রগত ব্যাপার। বিষয়টি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক দায়িত্বের ভিত্তিতে ছেড়ে না দেবার ফলে রাষ্ট্রপ্রধান সমাজের সার্বজনীন কল্যাণ সাধনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্য ক্ষতিপূরণের বিষয় নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় সূত্রে এবং রাষ্ট্রীয় ও সমাজ নেতাদের উক্তিতে সমর্থিত হয়েছে। যাঁরা আল্লাহর পথে সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন, তারা যে শাহাদাত লাভ করবেন এবং কিয়ামতের দিন বিনাবিচারে বেহেশতে অনন্ত জীবন ভোগ করতে পারবেন, এ ওয়াদা তাঁরা খুব বড় করে দেখিয়েছেন। সাধারণ নিয়ম অনুসারে এ সব শহীদকে গোসল করানো হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁদের দাফন করা হয়। অবশ্য একথাও মনে রাখা দরকার যে, যেসব মুসলমান পাঁচটি অবশ্য কর্তব্য পালন করেন, তাঁদের জন্যও রয়েছে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু জেহাদী সৈনিকরা এটা যতটা নিশ্চিতরূপে পান, তেমনটি আর কেউ পাবে না।

সাধু টমাস ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় দার্শনিকগণ ষোড়শ, সপ্তাদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রত্যয়ের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের জনক গ্রোশিয়াস প্রাকৃতিক নিয়মজাত ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধনীতির প্রভাবে আন্তর্জাতিক আইন-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি তাঁর ধারণাগুলোরই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য ; যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধের আইনের

ওপর প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাব পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর তুলনায় বেশ কমে এসেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ভিন্ন আর সব যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করার মধ্যে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের নীতি আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়।

যুদ্ধের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের নীতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আর ইসলামী আইন-ব্যবস্থায় এ নীতি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আইন-ব্যবস্থাই ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনের পথ দেখিয়ে দিয়েছে, আর ধর্ম আইনকে জানিয়েছে সমর্থন।

মুসলিম আইন-ব্যবস্থা অনুসারে ইসলাম এবং শিরক এক সঙ্গে পাশাপাশি বাস করতে পারে না। আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করাই যে কেবল ইমাম ও প্রত্যেকটি মুমিনের কর্তব্য তাই নয়, অমুসলিমগণও যাতে করে আল্লাহকে অস্বীকার না করে বা তাঁর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ না হয়, সেটা লক্ষ্য করাও তাঁদের কর্তব্য। জেহাদের মধ্যে তাই বহু ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়।

অন্যায়ের শাস্তি-বিধানের জন্যও বিশেষ কারণে ইসলামে জেহাদের ভূমিকা রয়েছে। মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জেহাদ পরিচালনা করা হয়। এর ওপরেই নির্ভর করে আল্লাহর বাণীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও তার রাষ্ট্রনৈতিক প্রাধান্য।

জেহাদ ঃ স্থায়ী যুদ্ধ

ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যে আরব দেশে যুদ্ধের প্রচলন হয়েছে, এ কথা ঠিক নয়। আরবদের মধ্যে অনেক আগে থেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। এসব যুদ্ধ ছিল নিতান্ত গোষ্ঠীগত। এর প্রকৃতি নির্ভর করত তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার বিশেষত্বের ওপর। যুদ্ধ সম্পর্কীয় নিয়ম-কানুন সামাজিক আচার বা ঐতিহ্যগত সুন্নার ভেতরেই সুসংবদ্ধ ছিল। গোষ্ঠীই ছিল রাজনীতির মূল কাঠামো। যুদ্ধ ছিল আক্রমণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর দস্যুবৃত্তি বা প্রতিশোধ গ্রহণের মধ্য দিয়েই ছিল তার প্রকাশ। ইবনে খালদুন বলেন, যুদ্ধের পরিবেশে আরবদের মধ্যে স্বাবলম্বন, সাহসিকতা ও গোষ্ঠীগত সহযোগিতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এসব গুণই আবার যুদ্ধ-পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে ও অনিশ্চিত বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি করে।

ইসলামী জেহাদের মূল্য হল এই যে, তা গোষ্ঠীগুলোর দৃষ্টিকে গোষ্ঠীগত কোন্দল থেকে বহির্বিশ্বের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহর পথে (সত্যের তাগিদে) জেহাদ ছাড়া আর সব রকমের যুদ্ধ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। জেহাদের এই নীতি ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে বেঁচে থাকাই ছিল খুব কঠিন। গোষ্ঠীগত আক্রমণের স্থান দখল করলো জেহাদের নীতি। অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষে যে শক্তির অপচয় হত, তা এখন জাতীয় ঐক্যসাধন ও নতুন ধর্মের তাগিদে বহির্বিশের সঙ্গে জেহাদে নিয়োজিত হতে লাগল।

জেহাদকে তাই হিংসাত্মক ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেয়া চলে না। ইসলাম জেহাদকে মাইন ও ধর্মের আওতায় নিয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে অনেকগুলো জটিল শক্তি এর

পেছনে কাজ করেছে। কোন কোন লেখক আরব দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে আরবদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা ঘনীভূত হতে থাকে এবং আরব দেশের বাইরে উর্বর জমির সন্ধানে তারা বেরিয়ে পড়ে। আরব উপদ্বীপ থেকে বাইরের দুনিয়ার দিকে ধাবিত হবার কারণ হিসেবে এ থিয়োরীটা আপাতঃদৃষ্টিতে যতটা সত্য বলে মনে হয়, আসলে এটা জেহাদের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কারণ, জেহাদ ছিল স্থায়ী যুদ্ধের পর্যায়ে। আরবের বাইরে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরেও অমুসলমানদের বিরুদ্ধে এ জেহাদ পরিচালিত হত। এর পেছনে অন্যান্য আরও অনেক কারণ ছিল। এগুলোই মুসলমানদের মনে একটা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মিশনের মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল এবং বিজয়ী জাতি হিসেবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

প্রথমে ইসলামের সার্বজনীন দিকটার কথাই বলতে হয়। ইসলাম ধর্ম ও আদর্শের প্রসারে সাহায্য করা হল প্রত্যেক সুস্থ সক্ষম মুসলমানের কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ইহুদী ধর্ম মিশনারী ধর্ম নয়। তাদের ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই ধর্ম-যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল—ধর্ম বিস্তারের জন্য নয়। অন্যদিকে খৃষ্টান ধর্ম শুধু পরলোকে মুক্তি-বিধান নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং প্রথম দিকে রাষ্ট্রের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। রাজনীতির সঙ্গে এ ধর্ম যখন সংশ্লিষ্ট ছিল, তখনও চার্চ এবং রাষ্ট্র আলাদাই থাকে। ইসলাম কিন্তু এ দুই ধর্মমত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সার্বজনীন ধর্ম ও সার্বজনীন রাষ্ট্র—এ দুটোকে ইসলাম সম্মিলিত করে দিয়েছে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইসলাম শান্তিপূর্ণ ও জেহাদী উভয় পন্থাই অবলম্বন করেছে। ইসলামের সার্বজনীনতা ইসলাম-জগতের সমগ্র মুসলমান সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। আর ইসলামের আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং জেহাদের নীতি সমগ্র বহির্বিশ্ব বা সমর-জগতের বিরুদ্ধে স্থায়ী যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। দুনিয়ার সব জাতিকে মুসলমান করার উদ্দেশ্য সাধনে জেহাদকে ইসলামের হাতিয়ার বলে মনে করা যেতে পারে। জিম্মীদের যদি হযরত মুহাম্মদের (সঃ) নবুয়তে বিশ্বাসী করে তোলা না যায়, তবে অন্ততঃপক্ষে তাদের যাতে আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাসী করে তোলা যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এক বর্ণনায় জানা যায় যে, রাসূলে করীম হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন যে, আমার উম্মতের কোন কোন লোক সত্যের জন্য জেহাদ চালিয়ে যাবে এবং তাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত বিজয়ী বেশে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। সেদিন না আসা পর্যন্ত জেহাদ, কোন না কোন রকমে সমগ্র মুসলিম সমাজের কর্তব্য হয়ে থাকবে।

ইসলামী আইনে দারুল হারবের অস্তিত্ব বে-আইনী ব্যাপার বলে সাব্যস্ত হয়। যতদিন না দারুল হারব বিলুপ্ত হয়ে যায়, ততদিন দারুল ইসলাম জেহাদ চালিয়ে যাবে। কোন সম্প্রদায় যদি অমুসলিম রয়ে যায়, আর তারা যদি দারুল ইসলামে বসবাস করতে চায়, তবে তারা সাধারণ মুসলিম আইনের আওতায় আসতে বাধ্য

থাকবে। সর্বাত্মক ও সার্বজনীন ধর্ম ইসলাম সর্বক্ষণ বিশ্বাসীদের সামরিক না হোক, অন্ততঃ মানসিক ও রাজনৈতিক জেহাদের সবক দেয়।

জেহাদ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামপন্থীগণের সম্পর্ক নির্ণয়ের স্থায়ী নীতি। কিন্তু এর অর্থ মোটেই এই নয় যে, সব সময়ে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে। হিংসাত্মক পন্থা ছাড়াও জেহাদের কর্তব্য শুধু যে পালন করা সম্ভব হয়েছে তাই নয়—, দুশমনদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে অবিরাম সংগ্রামের পন্থা অনুসৃত হয় নি। তাই জেহাদকে সংগ্রাম নীতি বলা যায়, অবিরত যুদ্ধ-নীতি নয়। কোন কোন আইনবিদ বলেন যে, জেহাদের প্রস্তুতি জেহাদের কর্তব্য পালনেরই শামিল। অবশ্য রাষ্ট্রকে সব সময়ে সামরিক দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে করে কেবল যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি অকস্মাৎ আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় তা নয়, খলিফা প্রয়োজন মনে করলে আক্রমণের ভূমিকাও যেন গ্রহণ করা যায়।

কার্যতঃ দেখা যায় যে, পরিবর্তিত পরিবেশে জেহাদের ভূমিকা বিভিন্ন অর্থ বহন করেছে। ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রায়ই দুশমনদের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েছে। আর সবসময় ইচ্ছামত সুবিধাজনক চুক্তি সম্পাদন করাও সম্ভব হয় নি। কাজেই আইনবিদগণ এমনভাবে আইনের পুনর্ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে করে সাময়িকভাবে হলেও জেহাদের নীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়ে তাঁরা ঐক্যমতে পৌঁছেছেন বলেই মনে হয়। যখন মুসলিম শক্তির পতন ঘনিয়ে এল, তখন মুসলিম আইনবেত্তাগণ একথা একরকম ধরে নিলেন যে, স্থায়ী সংগ্রাম হিসেবে জেহাদ মুসলিম-স্বার্থের পরিপন্থী। যুদ্ধ হিসেবে জেহাদের প্রত্যক্ষ ধারণার মধ্যেও কতকগুলো রদ-বদল হল। এ পরিবর্তন দ্বারা অবশ্য জেহাদের মূলনীতিতে কোন পরিবর্তন আসে নি। কিছুদিনের জন্য জেহাদের কর্তব্য স্থগিত থাকবে মাত্র। ইমাম প্রয়োজনবোধে যে কোন সময়ে এ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পরিবর্তন সাধন করে জেহাদের নীতিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন। কার্যতঃ কিন্তু মুসলমানেরা এটাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলে ধরে নিয়েছেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার ফলেই জেহাদের নীতিকে যুদ্ধ থেকে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে পরিচালিত করা হল। হিজরী চতুর্থ শতকে (খৃস্টীয় দশম শতক) ইসলামের মননশীল ও দার্শনিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই এ অবস্থার সৃষ্টি হল। তখন সীমান্তে বাইজান্টীয় হানা রোখবার চাইতেও যুক্তিবাদীদের বিতর্ক নিয়েই মুসলমানরা অধিক লিপ্ত ছিলেন। ইবনে খালদুন প্রমুখ মুসলিম চিন্তানায়কদের মতে জেহাদের নীতি শিথিল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-বহুল স্তর পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত সভ্য-স্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয়। কাজেই জেহাদের নীতির পরিবর্তন শুধু দুর্বলতা ও অক্ষমতা থেকে জন্ম নেয় নি—ইসলামী রাষ্ট্রের স্বার্থ ও সামাজিক পরিবেশের চাপেই এ বিবর্তন সম্ভব হল।

শিয়া ও খারেজী মতে জেহাদের নীতি

সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, শিয়াদের জেহাদ সম্পর্কীয় নীতি সুন্নীদের নীতি থেকে খুব বেশী পৃথক নয়। কিন্তু জেহাদের সঙ্গে "ওয়ালাইয়া" বা ইমামের প্রতি আনুগত্যের নীতি জড়িত থাকায় শিয়া মতবাদে জেহাদের নীতি এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। শিয়া-মতে অ-মুসলিম আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী—কেবল এ অজুহাতেই তার বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করা চলবে। কোন মুসলমানও যদি ইমামের হুকুম তামিল না করেন, তবে তাকেও জেহাদের মারফত শাস্তি দেবার বিধান রয়েছে। সুন্নীমতে যেমন জেহাদ বেহেশত লাভ করার সর্বোত্তম পন্থা, শিয়া-মতে তেমনি ইমামের প্রতি আনুগত্য ছাড়া জেহাদ পরিচালনা ইমান বা ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী। আর ইমাম না থাকলে নাজাত বা মুক্তিলাভ করাও সম্ভব নয়।

ইমামতের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল জেহাদ। জেহাদ পরিচালনার যোগ্যতাই ইমাম নিযুক্ত হবার গুণগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম। ইমাম যদি জেহাদের কর্তব্য পালন করতে না পারেন, তবে যায়দী-মতে ইমাম নিযুক্ত হবার সর্বোত্তম গুণ যে তাঁর মধ্যে নেই, একথা অবধারিত। একক অভ্রান্ত শাসক হিসেবে ইমামই কেবল নির্ধারণ করতে পারেন যে, কখন জেহাদ ঘোষণা করতে হবে আর কখন দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধে নামা অনুচিত। ইমাম যদি মনে করেন যে, দুশমনের সঙ্গে সমঝোতায় আসা প্রয়োজন, তবে তিনি তা করতে পারেন। এমনকি, পরাজয়ের গ্লানি থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি অমুসলিম ও মুশরিকদের সাহায্যও নিতে পারেন। যদি শত্রুপক্ষ মুসলমানদের চাইতে দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়, তবে ইমামের পক্ষে কখনই যুদ্ধের ঝক্কি নেয়া সমীচীন হবে না।

ইমামের অন্তর্ধানের ফলে কিন্তু জেহাদের কর্তব্য অসমাপ্ত রয়ে গেছে। মুজতাহিদরা জেহাদ ঘোষণা করতে পারেন কিনা, এ সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। যেহেতু বিশ্বাসীদের যুদ্ধে আহ্বান করা অভ্রান্ত বিচার ক্ষমতা সাপেক্ষ ও সমগ্র মুসলিম সমাজের স্বার্থ এর মধ্যে জড়িত রয়েছে, তাই কেবল ইমামই এ কর্তব্য সমাধা করতে পারেন। ইমামের অনুপস্থিতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ চালানোও অসম্ভব ব্যাপার। তাই এক্ষেত্রে জেহাদের ভূমিকা এক রকম অনুপস্থিত বললেই চলে। সুতরাং, শিয়া মযহাবের আইন-ব্যবস্থায় জেহাদ শক্তিহীন ও স্থগিত অবস্থায় রয়ে গেছে। সুন্নী-মতে যেমন মুসলিম শক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জেহাদের পুনরুত্থান প্রয়োজন হয়ে পড়ে, শিয়া মতানুসারে ইমাম মেহদী হিসেবে 'গাইবা' বা অন্তর্লীন অবস্থা থেকে ইমামের প্রত্যাবর্তনের ওপরই জেহাদ-নীতির পুনর্জাগরণ সম্ভব হয়। ইমামের কর্তব্য হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং ইনসাফ ও ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা করা।

আবার খারেজীরা বলেন যে, জেহাদ ইসলাম ধর্মের একটা মৌলিক নীতি। তাই এ নীতি বর্জন করা বা শিথিল করা কখনই সম্ভব নয়। শিয়া মযহাবের মতের সঙ্গে এ মতের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের মতে জেহাদ হল ধর্মের ষষ্ঠ স্তম্ভ এবং প্রতিটি মুসলমান এবং সমগ্র সমাজের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। যাঁরা ইসলামের এ ব্যাখ্যা মেনে নেন না, তাঁদের খারেজীরা জোর করে এ মতবাদে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেন।

তাঁরা বলেন যে, রাসূলে আকরম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন সারাজীবন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন বিশ্বাসী মুসলিমেরও কর্তব্য হবে জেহাদ করা। তাঁদের অটল ধর্মবিশ্বাস জেহাদের নীতি পালনে তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে রেখেছিল। রাষ্ট্র বলতে তাঁরা সামরিক রাষ্ট্র বোঝাতেন ঃ এ ছিল এমন এক সমাজ, যা ইমামের কর্তৃত্বাধীনে ধর্মীয় দুশমনদের বিরুদ্ধে সর্বক্ষণ সংগ্রামের জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। যদি ইমাম জেহাদ পরিচালনা না করেন, তবু মুমিনকে জেহাদের কর্তব্য ব্যক্তিগতভাবে হলেও পালন করতে হবে। যদি মুমিন এ কর্তব্য সমাধা না করেন, তবে তিনি সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হলেন।

খারেজী মতে, জেহাদ হল এক হিংসাত্মক সংগ্রাম। সুন্নীদের মত হলো জেহাদ এখানে মত-বিরোধ বা ধর্মীয় প্রচারের ব্যাপার নয়। তাঁরা বলেন যে, সত্যিকার ইমান দৃঢ়প্রত্যয়-নির্ভর। আর এ বিশ্বাস যাদের নেই, তাদের ওপর জেহাদ চাপিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধর্মান্ধ খারেজীরা যুদ্ধে যেমন কঠোর ও নৃশংস ছিল, তেমনি মরুভূমিতে তাদের গোষ্ঠীগত জীবনে ধর্মের মানবীয় ও নৈতিক আবেদন ছিল নিতান্ত সামান্য। যুদ্ধের সময় তারা নির্বিবাদে নারী ও শিশু হত্যা করত এবং যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করত। এ নিয়ম অবশ্য সব সময়ে পালন করা হত না। তবু নাফী ইবনে আল-আযরাকের (হিজরী ৬৮৬) দলের চরমপন্থী খারেজীগণ বলেন যে, এ কীর্তি সর্বদা বাস্তবায়িত করা উচিত।

জেহাদ ও সাধারণ যুদ্ধে পার্থক্য

মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম জেহাদ ছাড়া আর সর্বপ্রকার যুদ্ধেরই অবসান ঘটিয়েছে। যে সংগ্রামের পেছনে বিশেষ ধর্মীয় উদ্দেশ্য রয়েছে এবং আল্লাহর আইনের রূপায়ণ ও তার বরখেলাপ দূর করার জন্য যে যুদ্ধ, কেবল তাই যথার্থ বলে বিবেচিত হতে পারে। মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মধ্যে বা বাইরে এ ভিন্ন আর কোন রকমের যুদ্ধ অনুমোদিত হতে পারে না।

ইসলামের ইতিহাসে অবশ্য দেখা যায় যে, মুসলিম শাসক ও ক্ষমতাশালী বিভিন্ন দলের সংঘ-সংগ্রাম বাইরের দুশমনদের সংঘ-সংগ্রামের মতোই অবিরত লেগেই ছিল। "বিদাত" দূরীকরণ ও ধর্ম-পরিত্যাগকারীদের শাস্তি বিধানের জন্য বার বার জেহাদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। সিংহাসন লাভের জন্য বা বড় বড় রাজনৈতিক পদের লোভে বিরোধীদলের নেতাদের নির্লজ্জভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখা গেছে। খলিফার সম্মান ও প্রতিপত্তি যখন ক্ষীণ হয়ে এল, তখন স্থানীয় শাসকদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অবমাননা ও বিরোধিতা করাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াল। ফলে ক্ষমতার ভীষণ লড়াই চলল এবং ইসলামী জগতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিল। তদানীন্তন বাস্তব পরিবেশ উপেক্ষা করে আইনবিদগণ অবশ্য আল-মাওয়ার্দীর মতবাদ অনুসরণ করে বলতে চেয়েছেন যে, 'খলিফাই' সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর এ ক্ষমতা নাচক করে দেবার ক্ষমতা কারো নেই। 'ালিফা যদি অত্যাচারী হন, তবুও এ কথা প্রযোজ্য।

কারণ, অরাজকতার চাইতে অত্যাচারী শাসক শতগুণে শ্রেয়ঃ। এ প্রকার ব্যাখ্যা তখনকার দিনের ভয়াবহ অরাজকতার পরিচায়ক।

তদানীন্তন অবস্থার কথা চিন্তা করে কোন কোন আইনবিদ বলেন যে, ইসলামী সমাজে জেহাদ ছাড়া অন্য প্রকারের যুদ্ধও বার বার সংঘটিত হয়েছে। ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে জেহাদের কথা অনেকটা বাদ দিয়েই তাঁরা বলেছেন যে, যুদ্ধের বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুসলিম শাসকদের সব সময়েই সচেষ্ট হওয়া উচিত। আল-তুর তুশী (মৃত্যু ৫২০ হিজরী) যুদ্ধের দুর্যোগকে সামাজিক বিশৃঙ্খলা বলে বর্ণনা করেন। আর আল-হাসান ইবনে আবদুল্লাহ যুদ্ধকে সামাজিক ব্যাধির সঙ্গে তুলনা করেছেন। উভয় লেখকই যুদ্ধের রীতি-নীতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পেশ করেছেন এবং শাসকদের এই উপদেশ দিয়েছেন যে, যদি যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব না হয়, তবে যুদ্ধ-জয়ের সর্বোত্তম পন্থা হল সামরিক দিকে সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত হয়ে থাকা। অতীতের রোমান লেখকদের মত মুসলিম আইনবিদরাও একথা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করতেন যে, শান্তি বজায় রাখার জন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

ইবনে খালদুনই (খৃস্টীয় ১৩৩২-১৪০৬) বোধহয় সর্বপ্রথম বলেছিলন যে, "যুদ্ধ সামাজিক দুর্যোগ–" পূর্ববর্তী মুসলিম চিন্তানায়কদের এ মতবাদ যথার্থ নয়। তিনি বলেন যে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানব-সমাজে যুদ্ধ চলে আসছে। মানুষের মধ্যে প্রতিশোধ নেবার আকাংখা বিদ্যমান থাকায় সমাজে যুদ্ধ স্থায়ী আসন পেতেছে। অর্থাৎ, মানুষ স্বভাবতঃ যুদ্ধবাজ। স্বার্থের খাতিরে বা হিংসা-ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্য বা (খোদার দৃষ্টিতে) অপরাধ খণ্ডনের জন্য মানুষ যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়। এসব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই এক গোষ্ঠী বা জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে জমায়েত হয়। ফলে যুদ্ধ হয়ে পড়ে অনিবার্য।

ইবনে খালদুনের মতে যুদ্ধ চার রকমের। প্রথমতঃ গোষ্ঠীগত যুদ্ধ। আরবদের মধ্যে এ ধরনের যুদ্ধ প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ আদিম মানুষের হানাহানি ও হামলা। তৃতীয়তঃ শরিয়ত-অনুমোদিত যুদ্ধ ও জেহাদ। চতুর্থতঃ বিদ্রোহী ও বিভ্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ইবনে খালদুন বলেন যে, প্রথম দু'রকমের যুদ্ধ আইন-অনুমোদিত নয়। তাই এ ধরনের যুদ্ধ যথাযথ বলে গণ্য হয় না। বাকী দু'রকমের যুদ্ধকে ন্যায়সম্মত যুদ্ধ (আদল) বলে মনে করা হয়েছে।

তুর তুশীর মত ইবনে খালদুন এমত পোষণ করতেন না যে, সামরিক প্রস্তুতির ওপরেই কেবল যুদ্ধ-জয় নির্ভর করে। অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম ছাড়াও যুদ্ধ-জয়ের অনেক গভীরতর কারণ রয়েছে। এ গুলোকে তিনি আল আসবাব আল খাফিয়া বা সুপ্ত কারণরূপে অভিহিত করেন। যুদ্ধে সৈন্যদের মনোবল প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁর মতে মনোবল আর গুপ্ত কারণ এক জিনিস নয়। যুদ্ধে জয়লাভের বিভিন্ন রীতি-নীতি ও কলা-কৌশলকেই তিনি গুপ্ত কারণ বলে মনে করতেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। উঁচু জমি থেকে যদি আক্রমণ শুরু করা যায়, তবে যুদ্ধ পরিচালনায় বিশেষ সুবিধা হয়। প্রতারণামূলক রণ-কৌশলেও শত্রুপক্ষ সহজেই প্রতারিত হয়।

বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইসলামের অভ্যুত্থানের সময় থেকে ইবনে খালদুন অবধি মুসলিম চিন্তানায়কগণ সাধারণ যুদ্ধকে সব সময়েই অসংগত বলে মনে করেছেন। ধর্মীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা ভিন্ন আর সব যুদ্ধই আল্লাহর আইনে নিষিদ্ধ হয়েছে। কাজেই সাধারণ যুদ্ধ আল্লাহর আইনের পরিপন্থী ছিল। সামাজিক পরিবেশের সুষ্ঠু বিশ্লেষণের ফলে মুসলিম চিন্তানায়করা একথা বুঝতে পারলেন যে, ভ্রান্ত মানুষের পক্ষে সাধারণ যুদ্ধ এড়িয়ে চলা সহজ ব্যাপার নয়। আবার মুসলিম ইখওয়াতের বা ভ্রাতৃত্বের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার জন্যও নবীর প্রেরণ বা হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) মত ক্ষমতাশালী ও মর্যাদাবান খলিফারই প্রয়োজন ছিল। খলিফাগণ যখন রাসূলের সুন্না থেকে বিচ্যুত হলেন, তখন যুদ্ধ কেবল যে ধর্ম-যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকত, এমন নয়। বৈষয়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধি এসব যুদ্ধ মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যুদ্ধ বা হারব আর জেহাদ এক জিনিস নয়। মানবসমাজে যুদ্ধকে মানুষের তাচ্ছিল্য ও পাপের ফলে উদ্ভুত অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করা হত। ইবনে আবদুল্লাহ যুদ্ধকে ব্যাধি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্ত ইবনে খালদুনের মতে যুদ্ধ মানুষের স্বভাবজাত। যুদ্ধ সর্বক্ষণ সংঘটিত হয়। তাই একে সামাজিক জীবনের চিরন্তন সাথী বলেই ধরা উচিত। ইবনে খালদুন যে কেবল উত্তর আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবিরাম সংগ্রামের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ সিদ্ধান্তে পৌছেন, তা নয়। অন্যান্য জাতির ইতিহাস থেকেও তিনি তাঁর মাল-মশলা সংগ্রহ করেন। ইবনে খালদুনের সিদ্ধান্ত মানব সমাজ সম্পর্কে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিরই পরিচায়ক। তাঁর বিশ্লেষণের সত্যতা আধুনিক গবেষণায় ধরা পড়েছে। গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, আদিম সমাজে মানুষ খুব বেশী যুদ্ধবাজ ছিল। শান্তিপূর্ণ অবস্থা তখন মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। স্যার হেনরী মেইন বলেন, "শান্তি স্থাপন করা মোটেই স্বাভাবিক, আদিম ও প্রাচীন ব্যাপার নয়—যুদ্ধই হল মানুষের স্বভাবিক প্রবৃত্তি।' খৃস্টান ধর্ম পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় নি। ইসলাম কিন্তু দুনিয়াতেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ইসলামের পক্ষে ফের শান্তি প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও খোদায়ী সমাজ কায়েম করা সম্ভব হয় নি। বর্তমান মানুষের কাছে যুদ্ধ যেমন সমস্যাবহুল অবস্থার সৃষ্টি করে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছেও এ সমস্যা সমানভাবে প্রকট ছিল। তাঁরা ধর্মকে খুব সম্মানের চক্ষে দেখতেন ও ধর্মের ভিত্তিতে যুদ্ধ দমনের চেষ্টা করতেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মর্যাদা আমাদের কাছে ধর্মের সমতুল্য। আমরা যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করতে বদ্ধপরিকর।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিভিন্ন প্রকার জেহাদ

মুসলিম আইনবেত্তাগণ অমুসলিমের বিরুদ্ধে জেহাদ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যে সব মুসলমান ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় বা ধর্মবিরোধী মতবাদ পোষণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও জেহাদ প্রয়োজন হতে পারে। এসব লোকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্পর্কে সব আইনবিদই মতৈক্যে পৌঁছেছেন। জেহাদের প্রকৃতি ও পরিসমাপ্তি সম্পর্কে অবশ্য তাঁদের মধ্যে মতবিরোধের অবকাশ রয়েছে। আল-মাওয়ার্দী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন—প্রথমতঃ, ধর্মত্যাগের বিরুদ্ধে জেহাদ (আর-রিদ্দা); দ্বিতীয়তঃ, বিদ্রোহের বিরুদ্ধে জেহাদ (আলবাগী); তৃতীয়তঃ, মুসলিম-ভ্রাতৃত্ব থেকে আলাদা হয়ে নতুন দল গঠন (মহারিবুন)। অন্যান্য আইনবিদরা আর একটি জিনিসের উল্লেখ করেছেন। তা হল আর-রিবাত বা সীমান্ত অঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ। তা ছাড়াও আর এক রকমের জেহাদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটা হল কেতাবীদের বিরুদ্ধে জেহাদ।

পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ

আল্লাহর উপর যারা ঈমান আনেনি, তাদের সঙ্গে কোন সমঝোতা বরদাশত করা হয় না। তাদের হয় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা যুদ্ধে নামতে হবে। আল-কোরআনের অনেক নির্দেশের মধ্যে রয়েছে ঃ যেখানে পাও, পৌত্তলিকদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। এটা হল মুসলমানদের কর্তব্য। তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা পৌত্তলিক, তাদের সঙ্গেও সংগ্রাম কর। যারা অবিশ্বাসী, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই তাদের মাথায় আঘাত করে হত্যা কর। হাদিসে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রচার করেছেন ঃ আমি পৌত্তলিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত তারা আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই, একথা ঘোষণা না করে। প্রায় সব আইনবিদই বলেছেন যে, পৌত্তলিকতা ও ইসলাম পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে না। কারণ, পৌত্তলিকগণ আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য দেবতাদের মিশিয়ে ফেলে। অর্থাৎ তারা শিরক করে থাকে। তাই তাদেরকে যুদ্ধ ও ইসলামের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে হয়। অবশ্য কোন আইনবিদই পৌত্তলিকের সুষ্ঠু সংজ্ঞা দিতে পারে নি। তাঁরা পৌত্তলিকদের পর্যায় থেকে শুধু যে কিতাবী (যারা খোদায় বিশ্বাস করে; কিন্তু রাসূলে বিশ্বাসী নয়) তাদের বাদ দেন, তা নয়, ম্যাজীয় পন্থিগণকেও (জরথুস্টপন্থিগণ) তাঁরা বাদ দেন। ম্যাজীয়দের খোদা-বিশ্বাস অনেকটা হেঁয়ালী। কিন্তু তাদের যে একটা ধর্মীয় কেতাব আছে, একথা

বলা চলে। তাই মহান আল্লাহর ধারণা যাদের মধ্যে একেবারেই নেই, সেই প্যাগান মতবাদকেই কেবলমাত্র পৌত্তলিকতার পর্যায়ে ফেলা হয়। এ নীতি হেজাযে সর্বোতভাবে প্রয়োগ করা হয়। আরবের ইয়েমেন প্রভৃতি অঞ্চলে ইহুদীদের বসবাস করতে দেয়া হত। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে বা কিতাবী না হলে আরব দেশের অভ্যন্তরে কাউকে অবস্থান করতে দেয়া হত না। নাজরানের খৃস্টানগণ নিরাপত্তা-সনদ লাভ করছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদের (সঃ) ওফাতের পর হযরত ওমরের (রাঃ) নির্দেশক্রমে তাঁরা সিরিয়া ও লেবাননে হিজরত করতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে এই নিয়ম শিথিল করা হয়। বর্তমানকালে কিতাবীদের পক্ষে শুধু মক্কা শরীফে বসবাস করা নিষিদ্ধ। আরব উপদ্বীপের বাইরে পৌত্তলিকতা একরকম ছিল না বললেই চলে। অবশ্য ইরানের জরথ্রুস্টপন্থীদের মধ্যে এবং ইসলামী জগতের সুদূর প্রান্তে অবস্থিত এশিয়া ও আফ্রিকার প্যাগানদের মধ্যে ঘটেছে এর ব্যতিক্রম।

ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার বিরুদ্ধে জেহাদ

ধর্মত্যাগ দুই রকমের হতে পারে। (ক) যে মুসলমান ইসলাম ধর্ম বর্জন করে, কিন্তু যার দারুল হারবে যাবার অভিপ্রায় নেই। (খ) কয়েকজন মুসলমান ইসলাম ধর্ম বর্জন করে, দারুল হারবের নাগরিক হতে পারে কিংবা তারা মিলিত হয়ে পৃথক আবাসভূমি (দার) গঠন করতে পারে। জেহাদ সম্পর্কীয় বর্তমান আলোচনায় শেষোক্তটিই এসে পড়ে। প্রথমটি শান্তি সম্পর্কীয় আইনের বিষয়ভুক্ত। যথাস্থানে এলাকা সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

যদি ধর্মদ্রোহীগণ সংখ্যায় খুব বেশী হয় ও তাদের মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বানচাল করার মত শক্তি থাকে, তবে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা ইমামের অবশ্য কর্তব্য। আইনবিদগণ কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে বোঝাপড়া করার দিকেই বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কেননা, তার ফলে হয়ত ধর্মদ্রোহীরা ইসলাম ধর্মে আবার ফিরে আসতেও পারে। এ ব্যাপারে শান্তি স্থাপন, শুল্ক গ্রহণ বা জিযিয়া গ্রহণ, কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইসলামকে খারিজ করে দেয়া ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় অপরাধ। ধর্মদ্রোহীরা হয় ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে, নতুবা জেহাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে। অবিশ্বাসীদের আগেই জানিয়ে দিতে হবে যে, শীঘ্রই জেহাদ শুরু হবে। একথা জানিয়ে দেয়া যুদ্ধ ঘোষণার শামিল।

ধর্মদ্রোহীরা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অসম্মত হয় এবং যুদ্ধ শুরু হয়, তবে দারুল হারবের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে যে রীতি-নীতি প্রযোজ্য হয়, এখানে সেগুলো প্রয়োগ করা হবে। তারা বা তাদের সম্পত্তি অবিশ্বাসীদের আত্মসমর্পণের সাধারণ নিয়মের আওতায় পড়বে না। তাদের বা তাদের স্ত্রীগণকে দাসে পরিণত করা যাবে না। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বা যুদ্ধের মাল হিসেবে বন্টন করে দেয়া চলবে না। যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করবে, তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। অনেক হানাফী আইনবিদ বলেন যে, ধর্মদ্রোহী স্ত্রীকে সাবী বা দাসী হিসেবে গণ্য করতে হবে, যুদ্ধার্জিত

বিষয় বলে মনে করতে হবে বা বিক্রয় করে দিতে হবে। ধর্মদ্রোহের পর যে সব সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করবে, তারাও সমগোত্রীয় বলে গণ্য হবে। কিন্তু অধিকাংশ আইনবিদ এটা প্রয়োজনীয় মনে করেন না।

রাসূলে আকরম হযরত মুহাম্মদের (সঃ) মৃত্যুর পর আরবীয় গোষ্ঠীগুলোর মুসলিম কওম থেকে আলাদা হয়ে নতুন দল গ্রহণ করা ধর্মদ্রোহিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এদের প্রথম ইসলামে প্রত্যাবর্তন করতে আহ্বান করেন। যারা তবু ফিরে আসল না, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হস্তে জেহাদ পরিচালনা করা হয়। খালিদ বিন ওয়ালিদ এ জেহাদ পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ধর্মদ্রোহীদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারা হয়। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যেই পুড়িয়ে মারার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উঠেছিল। ধর্মদ্রোহীদের নেতৃবৃন্দকেও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়। অধিকাংশ নেতাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-বালাযুরীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যারা পুনরায় ইসলাম কবুল করে, তারা ভিন্ন আর কেউ মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পায় নি।

বিদ্রোহের বিরুদ্ধে জেহাদ

বিভেদ সৃষ্টি করার প্রয়াসের নামই হল 'বাগী' বা বিদ্রোহ। যদি বিভেদ সৃষ্টিকারীগণ ইমামের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার না করত, তবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হত না ও তাদের দারুল ইসলামে শান্তিতে বসবাস করার অনুমতি দেয়া হত। অবশ্য ইমাম তাদের বিভেদমূলক ধারণাগুলো বর্জন করতে ও প্রচলিত মতবাদ মেনে নিতে অনুপ্রাণিত করবেন। তারা যদি এতে রাজী না থাকে ও প্রচলিত আইনের আওতায় আসতে অস্বীকৃত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। কতকগুলো অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া যদি বিরোধের কারণ হয়ে থাকে ও ধর্মের মূলনীতির সঙ্গে এগুলোর কোন সম্পর্ক না থাকে, (যেমন, প্রাদেশিক শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ) তবে তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপাড়া করবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যদি বিভেদকারীগণ সংখ্যায় খুব অল্প হয়, তবে তাদের শায়েস্তা করা মোটেই কঠিন হবে না। খারেজীরা এর এক দৃষ্টান্ত। খলিফা হযতর আলীর (রাঃ) সাথে যখন তাদের মতবিরোধ হল, তখন তাদের এ তিনটি ব্যাপারে বিশেষ ঔদার্য দেখান হয় ঃ মসজিদে নামাজ পড়তে তাদের অনুমতি দেয়া হয়, খলিফা কর্তৃক আক্রমণ থেকেও তারা রেহাই পেল। তাছাড়া তাদের দারুল ইসলামে বসবাস করতেও অনুমতি দেয়া হল। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা খলিফাকে আক্রমণ করে বসল, অমনি খলিফা হযরত আলী (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে ধাবিত হলেন; আন-নাহরোওয়ানের যুদ্ধে (৬৫৮ খৃস্টাব্দ) তাদের শক্তি নস্যাৎ করে দিলেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সে ইমামকে মুসলিম জনমত সমর্থন করতে চাইত না, যিনি নিজেই আইনের পথ থেকে দূরে সরে গেছেন। কিন্তু ধর্মবেত্তা ও আইনবিদগণ

ক্রমশঃ এ ধারণা পোষণ করতে লাগলেন যে, ইমামের বিরুদ্ধে কোন রকম বিদ্রোহই সমর্থনযোগ্য নয়। ইমাম যদি ভুলও করে বসেন, তবু তাঁর কর্তৃত্ব সবাইকে মেনে নিতেই হবে, এ মতবাদই তাঁরা পোষণ করতেন। আশারীপন্থী চিন্তানায়কগণ ও পরবর্তী যুগের প্রায় সমস্ত সুন্নী আইনবিদগণ সর্বপ্রকার বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ইমামের কর্তৃত্বকেই সমর্থন জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, বিদ্রোহ "স্বৈরাচারের" চাইতে অনেক বেশী নিন্দনীয়। তাঁদের মতে নতুন ইমামের প্রতি একবার "বাইয়া" বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার পর তা ফিরিয়ে নেবার আর কোন আইনগত পন্থা নেই। কারণ আল-কোরআনের নির্দেশ অনুসারেই বিশ্বাসী মুসলমানকে "আল্লাহ্ এবং রসূলের ও তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নিযুক্ত ইমামের কর্তৃত্ব"কে মেনে নিতে হবে। যদি ইমামের সঙ্গে মুসলমানদের কোন বিষয়ে মতবিরোধ উপস্থিত হয়, তবে তা "তোমরা যদি আল্লাহ্ ও শেষ দিনে বিশ্বাসী হও, তবে বিষয়টি আল্লাহ্ ও রাসূলের ওপর ছেড়ে দাও" (অর্থাৎ আল্লাহর নীতি ও রাসূল প্রদত্ত কার্যবিধির আলোকে তার মীমাংসা কর)। কিন্তু রাসূলের অনুপস্থিতিতে আইন ও শাসনের ক্ষেত্রে ইমামই রাসূলের স্থান দখল করেন। তাই রাষ্ট্রে কার্যতঃ ইমামই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। আল-কোরআন ও রাসূলুল্লাহর হুকুম তামিল করার জন্য তিনি জেহাদের শরণাপন্ন হতে পারেন। বিদ্রোহ বিভেদেরই নামান্তর মাত্র—ইমামের কর্তৃত্ব বিদ্রোহের দ্বারা বানচাল হয়ে যায়। ইমামতের ঐক্য ও সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদে ও তাঁর অধীনস্থ নাগরিকদের বিভেদকারীদের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে কোনও উপায় নেই।

পরিত্যাগকারী ও সড়কী দস্যুদের বিরুদ্ধে জেহাদ

মুসলিম সমাজ-পরিত্যাগকারী ও সড়কী দস্যুদের কার্যকলাপ বড় রকমের চৌর্য-বৃত্তি বলে গণ্য করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আল-কোরআনে নিম্নলিখিত আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে ঃ

"যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ও দুনিয়ায় গোলমাল-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। এভাবে দুনিয়াতে তারা অপমানিত হবে ও আখেরাতেও তারা কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।" (৫ ঃ ৩৭)।

আল-কোরআনের উপরিউক্ত আয়াতের ভিত্তিতেই আইনবিদগণ সমাজ পরিত্যাগ করা ও সড়কী দস্যুদের ইমাম কর্তৃক শাস্তি বিধানের বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন। কিন্তু শাস্তির মাত্রা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ তাদের হত্যা করা ও ক্রুশবিদ্ধ করার হুকুম দিয়েছেন, কেউ বা হাত-পা কেটে ফেলার সুপারিশ করেছেন। আবার কেউ বা নির্বাসন দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। অপরাধীর চরিত্র ও অপরাধের প্রকৃতির ওপর শাস্তির মাত্রা নির্ভর করে। নির্বাসন দেবার ব্যাপারেও বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক বলেন যে, অপরাধীকে দারুল হারবে নির্বাসিত করা হবে। আবার অন্যান্য আইনবিদ বলেন যে, তাকে তার নিজের শহর থেকে নির্বাসিত

করতে হবে; কিন্তু দারুল ইসলামে সে অবস্থান করতে পারবে। (খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজও এই মত পোষণ করতেন)। ইমাম আবু হানিফার মতে অপরাধীকে কারাভোগ করতে হবে।

কিতাবীদের বিরুদ্ধে জেহাদ

কিতাবী বা আহলুল কিতাবের মধ্যে ইহুদী, সেবীয় ও খৃস্টানরা রয়েছেন। এঁরা আল্লাহয় বিশ্বাস করেন। কিন্তু ইসলাম ধর্ম অনুসারে মনে করা হয় যে, তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় কিতাব নানাভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহর রহমত থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। আল্লাহ যখন তাঁদের সত্যপথে আহ্বান করার জন্য শেষ রাসূল পাঠালেন, তখন তাঁরা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন; কিন্তু তাঁর রাসূল ও আল-কোরআনের ওপর তাঁরা ইমান আনেন নি। তাই পৌত্তলিকদের মত কিতাবীদেরও নিশ্চয়ই শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবু আল্লাহর ওপর যখন তাঁদের বিশ্বাস আছে, তখন তাঁরা আংশিকভাবে শাস্তি ভোগ করবেন। একথা সত্য যে, তাঁদের বিরুদ্ধেও জেহাদ পরিচালিত হয়। কিন্তু পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যতটা কঠিনভাবে জেহাদের নীতি পরিচালিত হয় এদের বিরুদ্ধে ততখানি প্রযোজ্য হয় না।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা বা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ছাড়া পৌত্তলিকদের আর কোন উপায় নেই। কিন্তু কিতাবীরা এ তিনটি পন্থার যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারেনঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, জিযিয়া প্রদান অথবা জেহাদে প্রবৃত্ত হওয়া। যদি তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁরা মুসলমানদের মত পূর্ণ নাগরিকত্বের অধিকার পাবেন।[৩৩] আর যদি তাঁরা জিযিয়া প্রদান করে কিতাবী হিসেবেই অবস্থান করতে চান, তবে তাঁদের কতকগুলো শর্ত পালন করতে হবে। এদিক থেকে তাঁদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলা যায়। আর যদি তাঁরা যুদ্ধ করতে চান, তবে যুদ্ধকালে তাঁদের পৌত্তলিকদের সম-পর্যায়ভুক্ত মনে করা হবে।

রিবাত

আত্মরক্ষার খাতিরে (সুগুর) বন্দর ও সীমান্তের শহরগুলোতে ফৌজ মোতায়েন করে দারুল ইসলামের সীমান্ত সংরক্ষণের নাম "রিবাত"। যদিও একথা সত্য যে, এ জেহাদ আল-কোরআনের একটা নির্দেশের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে, তবু ইসলামী রাষ্ট্র দেশ-রক্ষার ওপর যখন বেশী জোর দিতে শুরু করল, তখনই এ জেহাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। দেশরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক জেহাদের মধ্যে আল-কোরআন কোন পার্থক্য নির্দেশ করে নি। আল-কোরআনে রয়েছে ঃ

"খোদার দুশমন, তোমার দুশমন ও অন্যান্যদের মনে ভীতিসঞ্চার করার জন্য তোমাদের সৈন্য-সামন্ত ও অশ্ব প্রস্তুত করে রাখ।" (৮ ঃ ৬২)।

কিন্তু আইনবেত্তাগণ এবং বিশেষ করে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মালিকী আইনবিদগণ (যাঁদের সীমান্ত ইউরোপীয় ফৌজ কর্তৃক হামেশা আক্রান্ত হত) রিবাতের

আত্মরক্ষামূলক দিকটার ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। হাদিসেও আত্মরক্ষামূলক রিবাতের খুব মূল্য দেয়া হয়েছে। তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তখনই এ হাদিসগুলো প্রচারিত হয়, যখন রিবাত আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একটি হাদিসে আছে ঃ আবদুল্লাহ উমর বর্ণনা দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহর মতে জেহাদ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য। আর রিবাতের কাজ হল, বিশ্বাসী মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণ। স্পেনে জেহাদের চাইতে রিবাত অধিক প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয়। কারণ, তাদের সীমান্ত হামেশাই খৃস্টান ফৌজ দ্বারা আক্রান্ত হত। এ কারণে ইবনে হোদাইল খৃস্টীয় দ্বাদশ শতকে (যখন স্পেনে ইসলামী শাসন কেবলমাত্র দক্ষিণাংশে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে) জেহাদ সম্পর্কে লিখিত তাঁর কিতাবের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রিবাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং স্থলে ও সমুদ্রপথে আত্মরক্ষা বিশ্বাসীদের অবশ্য কর্তব্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইসলামী জগতের পশ্চিম সীমান্ত আন্দালুস (স্পেন) সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) হাদিসের উল্লেখ করে রিবাতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল ইউরোপীয় আক্রমণ থেকে স্পেনকে রক্ষা করা। হাদিসে আছে—হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ আত্মরক্ষার জন্য একটি রাত্র জাগরণ হাজার রাতের ইবাদাতের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

সপ্তম অধ্যায়
যুদ্ধ পরিচালনার পন্থা

জেহাদিগণ

রাসূলে আকরম হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জীবনের প্রথম দিকে তাঁর অনুসারীরা, এমন কি মহিলারাও ইসলামের উন্নতি বিধানের সংগ্রামে শরীক হতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তা ছিল অসম্ভব। অর্থনৈতিক ও বাস্তব কারণে ক্ষুদ্র ও সদ্যজাত মুসলিম সমাজকে লড়াইয়ের ময়দানে সংঘবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। সামরিক দিক থেকে বিচার করে তাই মুসলমানদের (যেমন ইমাম শাফেয়ী বিভক্ত করেছেন) দু'ভাগে ভাগ করা হলঃ যাদের পক্ষে জেহাদে শরীক হওয়া অবশ্য কর্তব্য, আর যাদের পক্ষে জেহাদ বাধ্যতামূলক নয়। আরও সহজ ভাষায় বলতে গেলে জেহাদিগণ ও অজেহাদিগণ। যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার জন্য জেহাদিদের কতকগুলো বিশেষ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, জেহাদীকে বিশ্বাসী মুসলিম হতে হবে। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী এই মত সমর্থন করে বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) অবিশ্বাসীদের সৈন্যদলে ভর্তি করতে অস্বীকার করেছিলেন। অন্যান্য আইনবিদ, বিশেষ করে হানাফিগণ অবিশ্বাসীদের সৈন্যদলে ভর্তি না করার কোন কারণ খুঁজে পাননি। তাঁরা বলেছেন যে. রাসূলে করীম নিজেই যখন অবিশ্বাসীদের সাহায্য নিতেন, তখন এ সম্বন্ধে আর কো কথাই উঠতে পারে না। এসম্পর্কে তাঁরা একটা হাদিসের নজির দিয়েছেন। এ হাদিসটিতে আছে ঃ 'পাপীদের সাহায্যেও ইসলাম ধর্ম রক্ষা করা যেতে পারে'। জেহাদী হিসেবে অমুসলিমদের বাদ দেয়াই সাধারণ নিয়ম। তবু এ নিয়ম সব সময়ে পালন কর হত না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কাদেসিয়ার যুদ্ধে পৌত্তলিকগণ মুসলমানদে সাহায্য করেছিল। যুদ্ধ জয়ের অব্যবহিত পরেই এসব পৌত্তলিক ইসলাম কবুল করে।

দ্বিতীয়তঃ, জেহাদীদের সাবালক ও সুস্থমনা ব্যক্তি হতে হবে। শিশু ও উন্মা জেহাদী হিসেবে গণ্য হতে পারে না। বয়স্ক বা সুস্থ হবার পর অবশ্য তারা জেহাদীদের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

তৃতীয়তঃ, জেহাদীকে পুরুষ হতেই হবে। নীতিগতভাবে মহিলাগণ জেহাদী শ্রেণীভুক্ত নন। কারণ, আল-কোরআনের আয়াতগুলোতে মুমিন বা পুরুষ বিশ্বাসীদে প্রতি জেহাদের আহ্বান হয়েছে। মুমিনা' বা মহিলা বিশ্বাসীরা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হ নি। ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর অতর্কিত আক্রমণের সময়ই কেবল মহিলাদের যুদ্ধে যোগ দিতে হতে পারে। মহিলাদের অবশ্যই পরোক্ষভাবে যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্য করতে

হবে, যেমন আহতের সেবা বা যুদ্ধে উৎসাহ দান করা প্রভৃতি আইনবিদগণ অনুমোদন করেছেন।

চতুর্থতঃ, জেহাদীকে সবল ও সক্ষম হতে হবে। আল-কোরআন সুস্পষ্টভাবে দুর্বল, খঞ্জ ও অসুস্থ ব্যক্তিকে জেহাদ থেকে বাদ দিয়েছে। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা থাকাই যথেষ্ট। (৯ ঃ ৯২)। এ নিয়মটা আর একটি আয়াতে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

"আল্লাহ কারোর ওপরে সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না"। (২ ঃ ২৮৬)

যুদ্ধ করতে অক্ষম স্বচ্ছল মুসলমানরা টাকা-পয়সা বা অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে জেহাদের কর্তব্য পালন করতে পারেন।

পঞ্চমতঃ, জেহাদীকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন হওয়া চাই। তাঁর কোন ঋণ থাকলে ঋণদানকারীর তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া চাই। নিজেকে ও তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাবার মত যথেষ্ট ধন-সম্পদ তাঁর থাকা চাই। দাসকে প্রভুর ওপর নির্ভর করেই চলতে হয়; তাই জেহাদে যোগদান করা তার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়। মুক্তিলাভ করলে অবশ্য দাস জেহাদে শামিল হতে পারে। মহিলাদের মত দাসগণও আক্রমণের সময় আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্য সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।

ষষ্ঠতঃ, জেহাদীকে মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে তবে যুদ্ধে যোগদান করতে হবে। অতর্কিত আক্রমণের সময় অবশ্য সব মুমিনকে মাতা-পিতা বা ইমামের অনুমতি ছাড়াই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হতে হবে।

সপ্তমতঃ, জেহাদীকে স্বপ্রণোদিত হয়ে জেহাদে নামতে হবে। এ হল এক মৌলিক নীতি। এটা এসেছে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) এ-বাণী থেকে ঃ

"উদ্দেশ্য দেখেই কাজের বিচার হবে।"

মুসলিম আইন অনুসারে জেহাদের আসল উদ্দেশ্য হল—. ধর্মের উন্নয়ন ও প্রসার। যুদ্ধে ধন-সম্পদ লাভ করা জেহাদীর উদ্দেশ্য হতে পারে না। আপনা আপনি অবশ্য ধন-লাভ করা যেতে পারে। কেননা, একমাত্র আল্লাহই বিজয়-গৌরব দান করেন।

পরিশেষে যুদ্ধে লিপ্ত থাকা অবস্থায় জেহাদীকে কতকগুলো নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম হল সেনাধ্যক্ষের আদেশ মান্য করা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। কারণ, আল-কোরআনে আছে ঃ "আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে চল, আর তোমাদের মধ্যে যাদের হাতে তোমাদের পরিচালনার কর্তৃত্ব রয়েছে, তাদেরকেও।"— (৬ ঃ ৬২)। সামরিক ব্যাপারে ও যুদ্ধে অর্জিত ধন-সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে জেহাদীকে সেনাপতির সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হয়। শত্রুপক্ষ যদি খুব শক্তিশালী হয় ও মুসলমানদের চাইতে সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়, তবে জেহাদী ইচ্ছা করলে জেহাদ পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারেন। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁর জেহাদ বর্জন করার কোন অধিকার নেই। দুশমনদের হাতে পরাজিত হলে এবং সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশংকা থাকলেই কেবল পশ্চাদপসরণ করা অনুমোদিত হতে পারে। তাছাড়া,

জেহাদীকে সৎ ও স্পষ্টবাদী হতে হবে এবং বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলতে হবে। যদি তিনি আমান বা নিরাপত্তার ওয়াদা দিয়ে থাকেন, তবে তাঁকে তা মেনে চলতেই হবে। জেহাদ পরিচালনায় যদি তাঁর হাতে মানুষ মারা পড়ে থাকে, তবে তিনি দেখবেন মৃতের ওপর যেন আর অত্যাচার করা না হয়।

জেহাদীদের পরিচালনা

খলিফার কর্তব্য হল আইনের সুষ্ঠু রূপায়ণ। তাঁর হাতে সামরিক ও বেসামরিক উভয় বিষয়েরই কর্তৃত্ব থাকে। তিনি শাসন বিভাগ ও সামরিক বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ করেন। বিভিন্ন শাসনকর্তা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। খলিফা ও প্রধান শাসনকর্তা হিসেবে আল্লাহর কাছে তিনি দায়ী থাকেন এবং তাঁকে আইন-নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় বিধি পালন করতে হয়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর খলিফাগণ কখনও কখনও সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধে যোগদান করেছেন। কিন্তু অন্যান্য সময়ে তাঁরা সেনাপতি নিযুক্ত করতেন। এ সেনাপতিগণ খলিফাদের প্রতিনিধি হিসেবে জেহাদ পরিচালনা করতেন। আইনবিদগণ সামরিক শক্তিকে খলিফার হাতে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্পাদনের হাতিয়ার হিসেবে মনে করতেন। কিন্তু যখন খলিফার ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে আসলো এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সেনাধ্যক্ষগণ তাঁর চাইতে বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠলেন, তখন শক্তি-বলে ক্ষমতা দখলের নীতিকেও আইনবিদগণ কখনও কখনও সমর্থন জানিয়েছেন। অনেক আইনবেত্তা সামরিক শক্তিকে শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করার ব্যাপারে একটি মৌলিক গুণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সামরিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে শাসন-কর্তৃত্ব আরোপ করার প্রবণতা এ মতবাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে।

সমর পরিচালনার দুটো পন্থা আছে, বিশিষ্ট পন্থা ও সাধারণ পন্থা। প্রথমটির মধ্যে রয়েছে সামরিক নীতি-নির্ধারণ। আর অপরটি হল কূটনৈতিক ও সামরিক বিষয় নিয়ে। বিশিষ্ট সমরনীতিকে সাধারণ পন্থার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বিশিষ্ট সমরনীতি পরিচালনার মধ্যে আসে ঃ

১। সৈন্য পরিচালনা, প্রত্যেকটি সৈন্যের প্রতি নজর রাখা এবং ঘোড়া ও সাজ-সরঞ্জামাদির তত্ত্বাবধান।

২। যুদ্ধ পরিচালনা ও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের উৎসাহ প্রদান।

৩। সামরিক কলাকৌশল প্রয়োগ। রাসূল (সঃ) বলেন ঃ যুদ্ধ ফন্দী-ফিকিরেরই নামান্তর। অতর্কিত আক্রমণ থেকে ফৌজকে রক্ষা করা এবং যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যই এ পন্থা অবলম্বন করতে হয়। একটা সুবিধাজনক জায়গা থেকেই সেনাপতিকে আক্রমণ চালাতে হয়।

৪। সামরিক কর্তব্য পালন। এর মধ্যে আছে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ আয়ত্ত করা। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জেহাদীরা সৈন্যদল ছেড়ে না যায়।

সেনাপতির হুকুম তামিল করতে ও ব্যক্তিগত বিরোধের বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে জেহাদিগণ বাধ্য।

সমর পরিচালনার সাধারণ দিকটার মধ্যে ওপরের সবটা বিষয় রয়েছে। শান্তিচুক্তি সম্পর্কে আলোচনা এবং চুক্তি সম্পাদনা ও যুদ্ধে লব্ধ ধন-সম্পদ বণ্টনের বিষয়টিও এর মধ্যে রয়েছে।

সেনাদলের গঠন পদ্ধতি

হযরত মুহাম্মদের (সঃ) প্রাথমিক অনুসারীদের নিয়ে সম্পূর্ণ একটি সৈন্য দল গঠিত হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম সমাজে যখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন তাঁদেরই সৈন্যদলে ভর্তি করা হত, যাঁরা জেহাদের দায়িত্ব পালন করতে পারতেন। জেহাদীরা ছিলেন "মুকাতিলা" বা সংগ্রামীদের দলে। আর যাঁরা বাড়ীতে থাকতেন, তাঁদের বলা হত "কা'য়াদা"। মুকাতিলাদের মুহাজিরও বলা হত। কারণ, নববিজিত ভূখণ্ড দখল করার ব্যাপারে যাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সহ এসব জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এ সব অঞ্চলকে মুসলিম শাসনাধীনে রাখার অনুকূলে এঁরাই সামরিক শক্তি যুগিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীতে যোগদান করে এঁরা সামরিক শক্তি সংগঠিত করেন এবং এঁদের মধ্য থেকেই প্রতিভাশালী শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ ইরাক ও সিরিয়া দখলের পর মুকাতিলাদের সংখ্যা খুব বেশী বেড়ে যায়। সেখানকার খৃস্টান এবং অন্যান্য আরব গোষ্ঠী ইরানী ও বাইজান্টীয় প্রভুদের বিরুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করে।

ইসলামের অভ্যুত্থানের সময় থেকে খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের (৭৮৮-৭৫০ খৃস্টাব্দ) আমলে নতুন ফৌজী সংগঠন কাল পর্যন্ত সৈন্যদলকে পাঁচটি শ্রেণীতে (আল-খামিস) বিভক্ত করা হত ঃ কেন্দ্রস্থল (কালব), দুই পার্শ্ব বা বাহু (মায়মানা ও মায়সারা), সম্মুখভাগ (মুকাদ্দমা) ও পশ্চাদ্ভাগ (সাকা)। প্রত্যেক সৈন্য বিভাগের গোষ্ঠীগত ঐক্য রক্ষিত হত এবং এক এক গোষ্ঠীর নিজস্ব নিশানও থাকত। প্রায়ই অশ্বারোহীগণ পার্শ্বদ্বয়ের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেন। কারণ তাঁদের অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সাথে ও কার্যকরীভাবে যুদ্ধ চালাবার ক্ষমতা ছিল। তাঁদের অস্ত্র ছিল রুমহ বা বর্শা। পদাতিক সৈন্য তীর-ধনুক ও পরবর্তীকালে ঢাল-তলোয়ার ব্যবহার করত। ইসলামী রাষ্ট্র প্রসারের প্রাথমিক যুগে সৈন্যসংখ্যা খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এতে মাত্র চার থেকে বার হাজার লোক ছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক তাবারী তাঁর বর্ণনায় বলেছেন যে, কাদেসিয়ার ঐতিহাসিক যুদ্ধে (৬৩৭ খৃস্টাব্দ) মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র বার হাজার। এঁরা পারস্যের ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

জেহাদীরা কয়েকটি আজনাদ বা রেজিমেন্টে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি রেজিমেন্ট ছাউনী ফেলে থাকত, যেমন সিরিয়ার জাবিয়া, তাবারিয়া ও হোমস; ইরাকে বসরা ও কুফা এবং মিসরে ফুসতাত ও আলেকজান্দ্রিয়ায়। যুদ্ধ করা ছাড়া এ যোদ্ধাদের আর

কোন কাজ ছিল না। তাঁরা রাষ্ট্রের বিশেষ সুবিধা ভোগকারী নাগরিক ছিলেন। ইহজগতে তাঁরা লাভ করতেন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ আর পরলোকে বেহেশত লাভের প্রতিশ্রুতি। তাঁরা কৃষিকার্যে যেন না যান, সেদিকে খলিফা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কারণ, তাঁরা যদি এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন, তবে লড়াইয়ের ময়দানে তাঁদের একত্রিত করা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়বে। এ নীতি প্রবর্তন করেন হযরত উমর (রাঃ)। স্থায়ী বসবাস কিন্তু তবু রোধ করা যায় নি এবং সৈন্য ছাউনীর সংখ্যাও বেড়ে যেতে থাকে। ফলে ফৌজের ঘাঁটিগুলোই সাম্রাজ্যের মধ্যে বড় বড় শহরে পরিণত হয়।

ক্রমে ক্রমে সৈন্যদল অনেকটা পেশাদার হয়ে পড়ল। বিশেষ করে উমাইয়াদের আমলে এ ক্রমবিবর্তন বেশ স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধ দমন করার জন্য উমাইয়াদের সুদক্ষ ফৌজের খুবই বেশী প্রয়োজন ছিল। তাঁদের আমলেই পাঁচটি শ্রেণীতে সৈন্য বিভক্ত করার নীতি (খামিস) পরিত্যক্ত হল। সমগ্র সৈন্যদলকে একটি দলে সুসংবদ্ধ করে তার নাম দেয়া হল 'কুর্দুস'। খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সময়ে এ পুনর্গঠন করা হয়। তাঁর আমলেই বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। বাইজান্টীয় প্রভাবের ফলে মুসলিম সৈন্যদের সামরিক বেশভূষার দিক হতে গ্রীকদের থেকে প্রায়ই আলাদা করা যেত না। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও প্রায় একই রকম ছিল। মুসলিম বাহিনীর বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের বিলুপ্তি এবং মানসিক দুর্বলতার জন্য যখন ইবনে খালদুন দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তখনই কিন্তু উমাইয়া শাসনাধীনে সেনাবাহিনীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

আব্বাসীয় খলিফাগণ নিয়মিত সেনা (সর্বদা কার্যে নিযুক্ত মুরতাযিকা) ও স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী (মুতাতাবিয়া) নিয়োগ করতেন। স্বেচ্ছাসেবকদের অস্থায়ী কাজের জন্য সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হত। কার্যকালীন সময়ে কেবল তাঁদের মাইনে দেয়া হত। নিয়মিত সেনাবাহিনীর এক বিশেষ দল থেকে খলিফার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের নেয়া হত। এ প্রহরী দলই সংরক্ষিত সেনাবাহিনী (Standing Army) হিসেবে কাজ করত। খলিফারা নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য বিদেশীদের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ করতেন এবং তাদের উচ্চহারে বেতন দিতেন। যখন খলিফার সম্মান ও প্রতিপত্তি কমে আসে, তখন এ সেনাদল তাদের মনিবদের চাইতেও অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠে। Praetorian guard-এর মত তুর্কী রক্ষীদলও প্রায় একই ভূমিকা গ্রহণ করে। এরা নিজেদের খেয়ালখুশী মাফিক একজন শাসককে পদচ্যুত করে যথেচ্ছভাবে আর একজনকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করত।

যুদ্ধ পরিচালনা

সেনাপতির হুকুমেই যুদ্ধ শুরু হত। হুকুমের পর আসে তাকবীর বা দোওয়া—(আল্লাহু আকবর—আল্লাহ' মহান)। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে তাকবীর ধ্বনি শুভ সূচনার ইঙ্গিত বহন করে। তাবারীর বর্ণনায় জানা যায় যে, কাদেসিয়ার যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি

সাদ যোহরের নামাজের পূর্বে যুদ্ধ শুরু না করার হুকুম করেন। যোহরের নামাজের অব্যবহিত পরেই তিনি চারবার তাকবীর ধ্বনি করে যুদ্ধ সূচনার সংকেত দান করেন। রোমানদের অভ্যন্তরীণ আইনের (Jus fetiale) অনুষ্ঠানের মত কোন কোন খলিফাও সেনাপতিগণকে কয়েকটি বিশেষ দিন বাদ দিয়ে যুদ্ধ শুরু করতে পরামর্শ দিতেন।

যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে আল-কোরআন থেকে জেহাদ সম্পর্কীয় সূরা পাঠ করে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধিরও রেওয়াজ ছিল। যুদ্ধে যোগদানকারী কবি-সাহিত্যিকগণ বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করতেন। আরবদের সাহসিকতা, আত্মসম্মানবোধ ও ধর্মীয়-উদ্দীপনা প্রভৃতি প্রেরণামূলক আরবীয় গুণাবলীর প্রতি আবেদন জানানো হত। যুদ্ধক্ষেত্রে কবিগণ সামরিক বীরত্বব্যঞ্জক নতুন নতুন কবিতা রচনা করে আবৃত্তি করতেন। এ কবিতাগুলো মোটেই নিম্নশ্রেণীর নয়। সত্যি কথা বলতে কি, যুদ্ধের উদ্দীপনা ও উন্মাদনার মধ্যেই বড় বড় লড়াইয়ের ময়দানে কতকগুলো উচ্চাংগের কবিতা রচিত হয়।

গোড়ার দিকে যুদ্ধের পরিচালনা খুব সুশৃঙ্খল ছিল না। পরবর্তীকালে এর ব্যতিক্রম ঘটে। প্রথমদিকে যে সব যুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রীয় পরিধি বেড়ে যায়, তার মধ্যে প্রাক-ইসলামী যুদ্ধের গোষ্ঠী-যুদ্ধরীতিই অনুসৃত হত। সাধারণতঃ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহসী সৈনিক শত্রুপক্ষের সৈন্যের দিকে এগিয়ে গিয়ে লড়াইয়ে আহ্বান করে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ করত। কোন কোন যুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে উভয়পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলত কয়েক ঘণ্টা। কখনও কখনও এতেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যেত; অথবা এ যুদ্ধই কয়েকদিন ধরে চলত। তারপর বাকী সৈন্যরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। প্রাক-ইসলামী যুদ্ধে প্রচলিত "কার" ও "ফার" নামক যুদ্ধরীতি মুসলমানরাও অনুমোদন করতেন। এ রীতি অনুসারে সেনাবাহিনী সর্বশক্তি নিয়োগ করে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করত; তারপর অকস্মাৎ পশ্চাদপসরণ করত। এ রীতি বার বার অনুসৃত হত। ফলে শত্রুসেনা বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হত এবং বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। কিন্তু মুসলিম ফৌজের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগতে পারত না। অশ্বারোহী সৈন্যগণ দ্রুতগতিশীল এবং তাদের আক্রমণ শক্তি অধিকতর কার্যকরী হওয়ায় এ ধরনের আক্রমণে তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করত।

ক্রমে মুসলিম সেনাবাহিনী যতই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করতে লাগল, ততই কেবল যে নতুন নতুন আক্রমণের নিয়মিত পদ্ধতি তাদের আয়ত্তে আসে তা-ই নয়, তারা নিজেদের বিন্যাস-ব্যবস্থা ও সংগঠন পদ্ধতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহারে ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করে। সামরিক কলাকৌশল শরিয়তের বিধান অনুসারে আইনানুমোদিত বলেই গণ্য হত। কারণ, রণকৌশল ছিল যুদ্ধে নৈপুণ্য ও পারদর্শিতার ব্যাপার। তীক্ষ্ণ সতর্কতা, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং অধ্যবসায়ই এ কলাকৌশলের ভিত্তি ছিল।

অষ্টম অধ্যায়
যুদ্ধের সূচনা

যুদ্ধে আহ্বান

মনে রাখা দরকার যে, জেহাদ শুধু সামাজিক কর্তব্যই ছিল না, ব্যক্তিগত কর্তব্য হিসেবেও জেহাদকে মূল্য দেয়া হত। ব্যক্তিগত কর্তব্য হিসেবেও জেহাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। জেহাদ আহ্বান করা না হলে বা ইমামের হুকুম না পেলেও কিছু আসে যায় না। ইসলামী রাষ্ট্র অতর্কিতে আক্রান্ত হলে মহিলা ও শিশুসমেত প্রতিটি মুমিনকে ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। সামগ্রিক দৃষ্টিতে জেহাদ রাষ্ট্রীয় হাতিয়াররূপে বিবেচিত হয়। রাষ্ট্রের কর্তা বা উপকর্তা হিসেবে ইমামের কর্তব্য হবে জেহাদ ঘোষণা করা।

জেহাদ ঘোষণার পরই আসে বিশ্বাসীদের যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান। জেহাদ ঘোষণার ফলে আইনের চোখে পরস্পর শত্রুতামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিশ্বাসীদের আহ্বান করার মাধ্যমেই জেহাদের রূপায়ণ সম্ভব হয়। ইমাম অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি নৈতিক আবেদন জানাবেন এবং তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেবেন যে, জেহাদ ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে গণ্য হয়। আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা, ইমামের আহ্বানে সাড়া দেয়া বিশ্বাসীদের কর্তব্য। কারণ, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ 'তোমাদের আহ্বান করলে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে সাড়া দাও।' ইমাম কর্তৃক জনসভায় ভাষণ প্রদান, প্রার্থনা বা প্রদেশগুলোতে খবর পাঠাবার পর সবাই আহ্বানে সাড়া দেয়। ইসলামের প্রসারের যুগে প্রাথমিক যুগের খলিফাগণ কর্তৃক রাজধানীর নিকটবর্তী গোষ্ঠীগুলোর নিকট চিঠি লেখা হত। বালাযুরীর ভাষায়, "নজদ ও হেযাযের সমগ্র আরববাসীকে চিঠি লিখে যুদ্ধে আহ্বান জানানো হত এবং যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি করানো হত।" ইসলামের ইতিহাসে পরবর্তী যুগেও খলিফা ও সুলতানগণ এ নিয়ম অনুসরণ করে এসেছেন।

যুদ্ধে আহ্বানের ক্ষমতা খলিফা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরও দিতে পারেন। শত্রু রাষ্ট্রের সীমান্তের প্রদেশগুলো সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিশ্বাসীদের যুদ্ধে আহ্বান করার জন্য খলিফাকে আমীরুল মুমেনিন হিসেবে শাসনকর্তাদের প্রতি হুকুমনামা পাঠাতে হত। বিশ্বাসীগণ যুদ্ধ করতে বাধ্য থাকতেন। দেশ আক্রান্ত হলেই সীমান্তের সেনাপতিগণের নিকট যুদ্ধ পরিচালনার হুকুম জারী করা হত। শত্রুপক্ষ সীমান্ত ভেদ করে এগিয়ে আসলে জেহাদ তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিগত কর্তব্য হিসেবে গণ্য হয়। তখন শত্রুকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য অনাহূতভাবেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়।

'দাওয়াতে'র প্রয়োজনীয়তা

রোমক অভ্যন্তরীণ আইনে যেমন যুদ্ধের জন্য কতকগুলো অনুষ্ঠান পালন করতে হত, তেমনি জেহাদের ব্যাপারেও ইসলামে আহ্বান করার রীতি প্রচলিত ছিল। অমুসলিম নতুন ধর্মের আহ্বান গ্রহণ না করলে আর কিতাবিগণ জিযিয়া না দিলে তারা শত্রু হিসেবে পরিগণিত হত এবং তাদের সাথে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দিত। আল-কোরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ "পয়গম্বর না পাঠিয়ে আমরা কাউকে শাস্তি দিই নি।" আর হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে যে রাসূলে আকরম বলেছেন ঃ 'যে পর্যন্ত তারা এক আল্লাহকে উপাস্য বলে না মানে, সে পর্যন্ত আমি পৌত্তলিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। যদি তারা একথা স্বীকার করে (জিযিয়া দেয়), তাদের জানমাল নিরাপদে থাকবে।' এদুটো উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, প্রথমতঃ, অবিশ্বাসীকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো হবে। তারা ইসলাম গ্রহণ করবে কিংবা যুদ্ধ করবে—একথা জানার জন্যই তাদের আহ্বান জানানো হয়।

যে নিয়ম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) স্বয়ং নির্ধারিত করেন, তা তিনি অনুসরণ করতেন। তাঁর পরবর্তী যুগে প্রাথমিক খলিফাগণ বা খোলাফায়ে রাশেদা তাঁর এ নিয়ম-কানুন বিশ্বস্ততার সাথে মেনে চলতেন। বাইজান্টীয় ও ইরানীদের বিরুদ্ধে অভিযানের পূর্বে আরব সেনাপতিরা তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অথবা জিযিয়া দিতে আহ্বান জানান। পরিপূর্ণ সরকারী দাওয়াতনামা কয়েকজন বিশিষ্ট যোদ্ধা মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে শত্রুপক্ষের সেনাপতির নিকট নিয়ে যেতেন। এর মধ্যে ধর্ম গ্রহণের যে আহ্বান জানানো হত, মাদাইন দখলের (খৃস্টীয় ৬৩৪ সন) পূর্বে খালিদ বিন আল-ওয়ালীদ যে সরকারী পত্র লেখেন, তার ঐতিহাসিক বর্ণনা নীচে দেয়া হল ঃ

"খালিদ বিন-ওয়ালীদের নিকট থেকে ইরানী কর্তৃপক্ষের নিকট। যাঁরা সত্যপন্থী, তাঁদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, যিনি তোমাদের অপমানিত করেছেন এবং তোমাদের রাজ্যকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়েছেন। যাঁরা আমাদের প্রার্থনায় যোগদান করেও আমাদের সঙ্গে (যুদ্ধে) আহ্বান করে, তাঁরা মুসলমান এবং আমাদের মতোই তাঁরা সমান অধিকার লাভ করবে। আমার পত্র পাওয়ার পর আমি যা লিখলাম, আপনি তা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেবেন। তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুবা আল্লাহর নামে আমি এমন সব লোক পাঠাব, আপনাদের কাছে জীবন যত প্রিয়, তাদের কাছে মৃত্যুও তেমনি বলে মনে হবে।"

যুদ্ধের পূর্বে শত্রুর কাছে দাওয়াত পাঠানোর সাধারণ নীতি সম্পর্কে ধর্মবেত্তা ও আইনবিদগণ ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদার নীতি অনুসরণ করে হানাফী ও মালিকী আইনবিদরা বলেছেন যে, যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত পাঠানো উচিত। আল-কুদূরী (৯৭৩-১০৩৭ খৃস্টাব্দ) নামক হানাফী আইনবিদ বলেন যে, শত্রুপক্ষ যদি পূর্বে দাওয়াত নামা পেয়েও থাকে, তবু আর একবার দাওয়াত পাঠানো উচিত। শাফেয়ী আইনবেত্তাগণ বলেন যে, যাদের আগেই ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত করা হয়েছে, তাদের পুনরায় সংবাদ না দিয়েই ইমাম ইসলামের স্বার্থ রক্ষার্থে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন। আর যদি ইমাম দেখেন যে, বিনা যুদ্ধেই তাদের ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আর একবার তিনি দাওয়াত পাঠাতে পারেন। হাম্বলী আইনবিদরা বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, ইসলাম গ্রহণের জন্য কেতাবীরা ত' পূর্বেই (তাঁদের নবীদের মারফত) আহূত

হয়েছেন। সুতরাং, তাদের আবার আহ্বান জানানো এবং সতর্ক করে দেবার দরকার নেই। শুধু অবিশ্বাসী পৌত্তলিক জাতিগুলোকেই আহ্বান জানানো উচিত। কারণ, এদের কাছে কোনদিন ইসলাম গ্রহণের আহ্বান পৌছায় নি; কিংবা কোন দিন ইসলামের নাম পর্যন্তও তারা শোনেনি। তাই তাদের কাছেই শুধু সতর্কবাণী পাঠাতে হবে। পরবর্তী যুগের ধর্মবেত্তা ও আইনবিদগণ জেহাদকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা মনে করতেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত অকেজো বলে মনে করতেন। কারণ, সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম খুবই সুপরিচিত হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণের আহ্বান সম্পর্কে কোন কথাই বলেন নি।

আলাপ-আলোচনা

প্রাথমিক যুগের মুসলিম বিজয়ের যুগে সেনাপতিগণ দাওয়াতনামা পাঠানোর পর তিনদিন অপেক্ষা করতেন। তারপর যুদ্ধ শুরু হত। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে শত্রুপক্ষ আলাপ-আলোচনা চালাতে প্রস্তুত থাকলে মুসলমানগণ তাতে সম্মত হতেন। এসব আলাপ-আলোচনার ফলে অনেক সময়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌছানো সম্ভব হত, যেমন ইরাক ও সিরিয়ার কতকগুলো শহরের আত্মসমর্পণের ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য। কিন্তু মতবাদের বিভিন্নতার ফলে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেত এবং তার অব্যবহিত পরেই লড়াই শুরু হয়ে যেত। এসব আলোচনার প্রকৃতি সম্পর্কে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে কাদেসিয়ার যুদ্ধের (৬৩৭ খৃস্টাব্দ) পূর্বে মুসলমান ও তাঁদের শত্রুপক্ষের পরস্পর আলাপ-আলোচনার মধ্যে। এ আলোচনা আরবসেনাপতি সা'দ বি ওয়াক্কাস ও পারস্যসেনাপতি রুস্তমের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। আল-মুগীরা বিন শু'বার নেতৃত্বে সা'দ বিখ্যাত যোদ্ধাদের একটি দলকে রুস্তমের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য পাঠিয়ে দেন।

এই আলাপ-আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ তাবারী ও বালাযুরীর লিখিত ইতিহাসে পাওয়া যায়। মৌলিক ব্যাপারে উভয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিরোধও যে নেই, তা নয়। বালাযুরীর বর্ণনা অনুসারে যোদ্ধাদল ইরানী পক্ষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ইবনে শু'বা রুস্তমের পাশে তাঁর সুউচ্চ আসনে বসতে উদ্যত হন। রুস্তমের দেহরক্ষীগণ দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে তাঁকে সেখানে বসতে বাধা দেয়। ইবনে শু'বা বলেন, এ ধরনের আচার-ব্যবহারই পারস্যের অবনতির প্রধান কারণ। দলের অন্যান্য সদস্যগণও রুস্তমের ছাউনীতে প্রবেশ করেন ও আলোচনায় শরীক হন।

রুস্তম নিম্নোক্ত প্রশ্ন করে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন ঃ

"আপনারা এখানে এসেছেন কেন?"

দলের অন্যতম সদস্য রা'বী জবাব দেন ঃ

"আল্লাহই আমাদের আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন। মানব-পূজা থেকে বিরত থাকার জন্য এবং এক আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য আহ্বান জানাতে আমরা এসেছি।"

তখন রুস্তম অনির্দিষ্টকালের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখার দাবী জানান। রা'বী জবাবে বললেন যে, রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হুকুম দিয়েছেন যে দাওয়াতনামা পাঠাবার পর তিনদিনের বেশী যেন লড়াই বন্ধ রাখা না হয়।

পরদিন আলাপ-আলোচনার দিন ধার্য হয়। রুস্তম আবার আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। আলোচনাকালে তিনি বলেন ঃ "আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনাদের দেশ দরিদ্র বলেই আপনারা এখানে এসেছেন। এ অবস্থায় আপনাদের সেনাপতির জন্য একটি পোশাক, একটি খচ্চর ও এক হাজার দিনার এবং প্রত্যেক সৈনিকদের জন্য এক ওয়াকার খেজুর ও পোশাক উপহার দেবার জন্য আমি আদেশ দেব। কারণ, আপনাদের হত্যা বা কয়েদ করার ইচ্ছা আমার নেই।"

ইবনে শু'বা এর জবাবে বললেন ঃ

"আমাদের দারিদ্র্য সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, তা সুস্পষ্ট এবং আমরা তা অস্বীকার করি না। কিন্তু আপনি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করলেন, তা ঠিক নয়। ...কারণ, আল্লাহ্ আমাদের কাছে এক রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁর বদৌলতেই আমরা ঐক্যবদ্ধ ও সম্মানিত হয়েছি।"

আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। মুসলিম প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ রুস্তমকে ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া প্রদান বা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এ তিনটির যেকোন একটি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। রুস্তম এতে খুব বিরক্ত হন। এক বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি হতাশার সুরে বলেন, তাঁর পক্ষে মুসলমানদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা অসম্ভব। বালাযুরীর বর্ণনায় আছে, তখন মুসলমানদের দলের একজন জবাব দেনঃ 'আমাদের রাসূল (সঃ) আপনাদের দেশে আমাদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।'

তাবারীর বর্ণনায় পারসিক ও বাইজান্টীয়দের সাথে আলোচনার যে বর্ণনা রয়েছে, ওপরের আলোচনা থেকে তা খুব আলাদা নয়। মিসর বিজয়ের সময় মুসলমানদের সঙ্গে মিসরীয়দের যে আলাপ-আলোচনা হয়, তাও প্রায় একই ধরনের। ইবনে আবদুল হাকামের বর্ণনায় জানা যায় যে, মিসরের প্রধান খৃস্টান যাজক মুসলিম সেনাপতি আমর বিন আসের কাছে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার আহ্বান জানিয়ে এক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে দেন। আমর ওই আহ্বানে সাড়া দেন। যদিও গোড়ার দিকে আলাপ-আলোচনা সফল হয় নি, তবু পরিশেষে কপটগণ মুসলমানদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছেছিল। দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিকরা চুক্তির ধারাগুলো ছাড়া আর কোন কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নি। চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আলাপ-আলোচনার কথোপকথনের ধারা সম্পর্কে কোন বর্ণনাও তাঁরা দেন নি।

আরবের বাইরে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাইজান্টীয়দের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের ব্যাপারেও বার বার আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রুসেডের সময় প্রাক-যুদ্ধ ও যুদ্ধকালীন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা সাফল্যজনকভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। এ সব আলোচনার মধ্যে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি, যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের জোট অথবা মুসলমান ও ফরাসী শাসনকর্তাদের সঙ্গে সম্মিলিত জোট প্রভৃতি বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। কখনও কখনও এ সব আলোচনার ফলে হয়ত বহুদিন অবরোধের পর বা শান্তি চুক্তি সম্পাদনে যুদ্ধের আংশিক পরিসমাপ্তির পর একটি শহরের ওপর দখল ছেড়ে দেয়া হত।

নবম অধ্যায়
স্থল-যুদ্ধ

যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া বা শত্রুপক্ষের ধনসম্পদ লাভ করা মুসলিম আইনে যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য নয়। যুদ্ধের মধ্যে কর্তব্য পালন ছাড়া আর কোন কিছুই নেই। ইসলামী আদর্শকে সার্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদেই আল্লাহর পথে জেহাদ পরিচালিত হয়। সে জন্য জেহাদীদের তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অযথা রক্তক্ষয় করতে বা ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। সিরিয়া অভিযানকারী সেনাদলের প্রতি হযরত আবু বকরের (রাঃ) ভাষণ এবং পরবর্তী যুগের খলিফাদের একই রকমের উপদেশ-বাণীর মধ্যে এ বিষয় সম্পর্কে মৌলিক নীতি খুঁজে পাওয়া যাবে।

নিষিদ্ধ কার্যাবলী

আইনবিগদগণ হযরত আবু বকরের (রাঃ) নসিহতগুলোর মধ্যে অকারণে অমুসলিমদের ধনসম্পদ বিনষ্ট না করার নীতি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। বর্তমানে যে সব বিবরণ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তা থেকে জানা যায় যে, কেবলমাত্র আল-আউযায়ী (খৃস্টীয় ৭৭৪) ও আস-সাউরী (খৃস্টীয় ৭৭৮) অকারণে ধ্বংস না করার নীতি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন। আইনের চারটি মযহাবের প্রবর্তক এবং অন্যান্য আইনবিদগণ আল-কোরআন ও সুন্নার কতিপয় নির্দেশ অনুযায়ী এ নীতিকে অনেকটা সীমিত করে এনেছেন। আল-আউযায়ী বলেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবির ব্যবহারিক জীবনের আলোকে আল-কোরআন ও সুন্নার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কেননা, তাঁর মতে সাহাবিগণ আল-কোরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফার চাইতেও পারদর্শী ছিলেন। তাই তাঁদের ব্যাখ্যাই সর্বাগ্রে গৃহীত হওয়া উচিত।

ইমাম মালিক তাঁর "মু'আত্তায়" যুদ্ধের আইনের ব্যাপারে যে আলোচনা করেন, তাতে তিনি গৃহপালিত পশু ও মৌচাক ধ্বংস না করতে বলেছেন। ইমাম আবু হানিফা এ বিধান দিয়েছেন যে, জেহাদীগণ যে সব জিনিস নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না যেমন বাড়ী, চার্চ, গাছ-পালা, পশু—সবই ধ্বংস করতে পারেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, প্রাণহীন সব কিছু ধ্বংস করা যেতে পারে, যেমন বৃক্ষ। কিন্তু পশু কেবল তখনই হত্যা করা উচিত যখন জেহাদীরা মনে করেন যে, এগুলো ধ্বংস না করলে শত্রুপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে পড়বে।

আইনবিদগণ এ সম্বন্ধে সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, যাঁরা যুদ্ধে যোগদান করেন না যেমন নারী, শিশু, পাদ্রী, ফকির, বৃদ্ধ, অন্ধ, উন্মাদ, এদের কোন প্রকার পীড়ন করা চলবে না। অনেক হানাফী ও শাফেয়ী আইনবিদ কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নিপীড়ন করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তারা যুদ্ধে যোগদান করে না।

প্রাক-ইসলামী যুগে শত্রুপক্ষের নিহত ব্যক্তিদের মস্তক বর্শার অগ্রভাগে বহন করার নীতি প্রচলিত ছিল। আইনবিদগণ এ প্রথা রহিত করার সুপারিশ করেন। এই হল এসব আইনবিদের অভিমত। খলিল নামক মালিকী আইনবেত্তা যুদ্ধে বিষাক্ত তীর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর হিল্লী শত্রুর বিরুদ্ধে তীর ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

প্রাক-ইসলামী যুগের রীতি-নীতি অনুসরণ করে মুসলিমগণ পবিত্র মাসে যুদ্ধে যোগ দিতেন না। এ সময়ে সকলের যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত থাকা উচিত। কারণ, তখন আল্লাহর বিশেষ রহমত নাযিল হয়। আল-কোরআনের নিম্নলিখিত নির্দেশের মধ্যেও এর ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় ঃ

"পবিত্র মাস শেষ হয়ে গেলে মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর। কারণ, তারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য দেবতাদের শরীক করে।" (৯ ঃ ৫)।

কোরআনের এ নীতি পরবর্তীকালে আর একটি নীতি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। সেটা হল এই ঃ

"তারা (মুসলমানগণ) তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। তাদের বল ঃ পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা খারাপ; কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যাওয়া ও তার ওপরে ইমান না রাখা এবং কাবা শরীফকে সম্মান না করা ও সেখান থেকে লোকদের তাড়িয়ে দেয়া আল্লাহর দৃষ্টিতে অতি খারাপ।" (২ ঃ ২১৪)।

আতা ভিন্ন আর সব আইনবিদ্ এই সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিম আইন অনুসারে পবিত্র মাসে বিশেষ রহমত নাযিলের নীতি আর গ্রাহ্য নয়; অবশ্য পবিত্র মাসে যুদ্ধে যোগদান হতে বিরত থাকা অনুমোদন করা হয়েছে।

শত্রুদের প্রতি ব্যবহার

দারুল হারবের অমুসলমানগণকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত জানাবার পর তারা যদি বিভিন্ন বিকল্পপন্থার যে কোন একটি (ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান) গ্রহণ না করেন, তবে জেহাদীগণ নীতিগতভাবে জেহাদের মারফত তাদের হত্যা করতে পারেন। তারা যুদ্ধে যোগ দিন আর না দিন।

অবশ্য তাদের বিশ্বাসভঙ্গ করে হত্যা বা অঙ্গচ্ছেদ করা কোন মতেই অনুমোদিত হয় নি। নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও ইসলামের মধ্যে যে কোনটি বেছে নিতে হলে হারবীদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েই তার মীমাংসা করতে হবে।

জেহাদীগণ শত্রুপক্ষকে অবরোধ করতে এবং নগরের প্রাচীর ও গৃহ ধ্বংস করতে আগ্নেয়াস্ত্র (নিক্ষেপাস্ত্র) ব্যবহার করতে পারেন। শত্রু-অধিকৃত স্থান দগ্ধ করতে বা

প্লাবিত করতে পারেন। তাঁরা খালের পানি অবরুদ্ধ করতে পারেন ও শত্রুপক্ষ যাতে পানি না পায়, সেজন্য পানি সরবরাহও বন্ধ করে দিতে পারেন। বিষাক্ত দ্রব্য, রক্ত বা অন্যান্য জিনিস পান করার পানিতে বা খালে নিক্ষেপ করা যেতে পারে। এতে শত্রুগণ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। সাধারণভাবে বিষাক্ত ও অগ্নিবহ তীরও যুদ্ধে ব্যবহার করতে অনুমতি দেয়া হয়।

যদি হারবীগণ (অমুসলিম যোদ্ধা) নারী ও শিশুসমেত মুসলিমদের ধরে ফেলে এবং তাঁরা ও অসুমসলিমগণ জেহাদীদের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকেন, তবে জেহাদীগণ হিংসাত্মক কার্যকলাপ সীমিত করবেন। এটাই হল আইনবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত। হিংসাত্মক কার্যকলাপের পরিসীমা সম্পর্কে অবশ্য তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ব্যক্তিগতভাবে জেনে হারবীদের যদি আক্রমণ করা না যায়, তবে প্রত্যক্ষ আক্রমণ থেকে বিরত থাকার জন্য আল-আউযায়ী উপদেশ দিয়েছেন। আল-কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের ওপর ভিত্তি করে তিনি এ মতামত প্রকাশ করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে এটি নাযিল হয় ঃ

"তোমাদের অজান্তে বিশ্বাসী নারী-পুরুষের তোমরা হয়ত মথিত করতে পার। এবং তার ফলে তোমরা গোনাহগার হয়ে যেতে পার।" (৪৮ ঃ ২৫)।

সুফিয়ান আস-সাউরী ও ইমাম আবু হানিফা প্রয়োজনবোধে তীর-ধনুক দিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। এতে জেহাদীগণ কর্তৃক অমুসলিম আক্রান্ত হওয়ার ফলে যদি অস্ত্র-শস্ত্রের আঘাতে কোন মুসলমানের মৃত্যু হয়, তবু আক্রমণ করা বাঞ্ছনীয়। মুমিনদের (মহিলা ও শিশুসমেত) হত্যা তখন ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছে বলে মনে করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, যুদ্ধার্থে সুরক্ষিত কেন্দ্র ও দুর্গসমূহ আক্রমণ করা চলে। কিন্তু বাড়ী-ঘরের ওপর হামলা চলবে না। যদি যুদ্ধের এলাকা খুব পাশাপাশি হয়, তবে মুমিনদের মৃত্যু ঘটলেও তীর না ছুঁড়ে (আক্রমণ না করে) হাত গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয়। শাফেয়ী আইন ও ধর্মবেত্তা ইমাম গাজ্জালী বলেন যে, হারবীদের ওপর বেপরোয়া আক্রমণকালে জেহাদীদের তীরের আঘাতে দুর্ঘটনাক্রমে কোন মুমিন নিহত হলে তা' দোষাবহ হবে না। অর্থাৎ এ অবস্থায় 'ইসতিসলাহ' বা জনকল্যাণের তাগিদে কয়েকজন মুমিনের হত্যা অনুমোদিত হয়েছে। কারণ, জেহাদকালে এ ধরনের আক্রমণে মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে।

গুপ্তচর

মুসলিম সেনাপতিগণ গুপ্তচর বৃত্তির উপযোগিতা স্বীকার করতেন এবং এ প্রাচীন প্রথার উপযুক্ত ব্যবহার প্রচলন করেন। কিন্তু অন্যান্য জাতির মত তাঁরা বৈদেশিক গুপ্তচরদের কঠোর হস্তে শাস্তি দিতেন। যদি কোন হারবী নিরাপদভাবে (আমান) দারুল ইসলামে প্রবেশ করে থাকে ও পরে তার গুপ্তচর বৃত্তি ধরা পড়ে, তবে তাকে হত্যা করা হয়। আর ইমাম যদি সিদ্ধান্ত করেন তবে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করাও যেতে

পারে। যদি কোন মহিলা ও শিশু আমানের (নিরাপত্তা) ভিত্তিতে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে থাকে এবং তাদের গুপ্তচরবৃত্তি ধরা পড়ে তবে মহিলাকে হত্যা করা উচিত, কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ করে নয়। শিশুকে শত্রুপক্ষ থেকে প্রাপ্ত দ্রব্য (Fay) বলে মনে করতে হবে; কিন্তু হত্যা করা যাবে না।

যদি কোন মুসলমান গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে শত্রুপক্ষকে খবর সরবরাহ করে, তবুও আইনে তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়া হয় নি। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক দেশের শাসনকর্তা বা ইমামের ওপর তার শাস্তি বিধানের বিষয়টি ন্যস্ত করেছেন। আল-আউযায়ী তাকে নির্বাসিত করার বা নিপীড়নমূলক শাস্তি বিধান করার সুপারিশ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন যে, সে তওবা (অনুশোচনা) না করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখা হবে। কেতাবীদের গুপ্তচর বৃত্তির ব্যাপারে এই একই আইন প্রযোজ্য হবে।

মৃত ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার

হারবীর মৃত্যুর পর তার মৃতদেহকে অবমাননা করা, তার মাথা কেটে ফেলা বা বর্শার অগ্রভাগে তার মাথা তুলে নেয়া চলবে না। আবু ইয়ালা বলেন যে, মৃতব্যক্তি মাত্রকেই দাফন করা উচিত। তবে শবাধারে রাখা বা কাফন না পরালেও চলবে। বদরের যুদ্ধের পর হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সুন্নার ওপরই তাঁর এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দশম অধ্যায়

নৌ-যুদ্ধ

ইসলাম ও নৌ-শক্তি

ইসলামী আইনবিজ্ঞানে সমুদ্রপথে যুদ্ধের বিষয়টির আলোচনা অনেকখানি অপূর্ণ রয়ে গেছে। গোড়া থেকেই মুসলমানেরা সমুদ্রপথ এড়িয়ে চলতেন। তাছাড়া সব চাইতে বড় কারণ হল এই যে, মুসলিম শক্তি স্থলপথেই সীমাবদ্ধ ছিল। পানিপথে তাঁদের শক্তি দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। ফলে বিষয়টি তাঁরা অবহেলা করেই এসেছেন। স্থল এলাকায় ইসলামের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মরুপ্রদেশ থেকে বাইজান্টীয় ও ইরানী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তা ছড়িয়ে পড়ে। ইরানী সাম্রাজ্যের দ্রুত ও চরম অধঃপতন ঘনিয়ে আসল। কারণ, ইরান হল এমন একটি স্থলশক্তি, যাকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করতে পেরেছিল। কিন্তু মুসলমানরা যখন আলেকজান্দ্রিয়ায় ও সিরিয়ার সমুদ্রতীরে বাইজান্টীয়দের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁরা বিপুল বাধার সম্মুখীন হন। বাইজান্টীয়দের নৌ-শক্তি তখনও অটুট ছিল। এ পর্যন্ত বহুদিন ধরে মুসলমানগণ স্থলশক্তির সাহায্যেই তাঁদের বিজিত দেশ নিয়ন্ত্রণ করে এসেছেন। জাবিয়া, কুফা ও ফুসতাত মরুভূমিতে অবস্থিত এসব ঘাঁটি থেকেই স্বচ্ছন্দে বিজিত এলাকাগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু সমুদ্রপথে মুসমানদের সর্বক্ষণ আক্রমণের মোকাবিলা করতে হত। তাই নৌ-বাহিনী গঠন করে সাম্রাজ্যকে বিদেশী আক্রমণ থেকে রক্ষা করার বন্দোবস্ত করা হয়। ভৌগোলিক অবস্থান ও হযরত মুয়াবিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে মুসলমানগণ নৌ-শক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেন। কারণ, যতদিন ভূমধ্যসাগর বাইজান্টীয়দের কবলে রয়ে গেল, ততদিন মিসর ও সিরিয়ায় ইসলামের অবস্থা মোটেই নিরাপদ ছিল না।

খৃস্টীয় ৬৪৮ সালে হযরত মুয়াবিয়া কর্তৃক সাইপ্রাস অধিকারের পরই মুসলিম নৌ-শক্তির গোড়াপত্তন হয়। ফলে সিরিয়ার ওপর তাঁর আধিপত্য অনেকটা মজবুত হয়ে আসে। রোডস ও সিসিলি দ্বীপের ওপর আক্রমণ মুসলমানদের অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে দেয় এবং ৬৫৫ সালে প্রথম বৃহৎ নৌ-সমরে তাঁরা জয়ী হন। কয়েকটি নৌ-কৌশল প্রয়োগের ফলেই মুসলিমগণ যাত-আস-সাউরীর যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এতে বোঝা গেল যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানগণও সামুদ্রিক যুদ্ধে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। বাইজান্টীয়-শক্তি সমুদ্রপথে অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকা সত্ত্বেও ভূমধ্যসাগরের আধিপত্য

কেবলমাত্র খৃস্টান শক্তির মধ্যে আর সীমাবদ্ধ রইল না। নৌ-আধিপত্যের ব্যাপারে খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল। কারণ প্রতিবার কেউ না কেউ নতুন নতুন রণ-কৌশল বা অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করতে লাগল। ইস্তাম্বুলের মুসলিম অবরোধ গ্রীকদের অগ্নিপ্রক্ষেপ কৌশলের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে যায় (খৃস্টীয় ৬৭৩-৬৯৭)। আবার অপরপক্ষ হয়তো বা একই অস্ত্র আকস্মিকভাবে প্রয়োগ করতেন অথবা নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে পালটা আক্রমণ চালাতেন। এ কারণেই উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলের একটানা আক্রমণ সত্ত্বেও (৭১৭ খৃস্টাব্দে ইস্তাম্বুলের ওপর আর একটি আক্রমণ) বাইজান্টীয় সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পেরেছিল।

পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইসলামের নৌ-শক্তি দ্রুতগতিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে সমগ্র উত্তর আফ্রিকার সমুদ্র অঞ্চল ও স্পেনের ওপর সুদৃঢ় আধিপত্যের ফলে এবং সিসিলি, সাডিনিয়া ও দক্ষিণ ইতালী অধিকারের ফলে ইসলাম সর্বাঙ্গ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। ভূমধ্যসাগরের ওপর প্রভাবের তাৎপর্য খুব সুদূরপ্রসারী ছিল। এর ফলে যে কেবল পূর্ব ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই কেবল সম্ভব হল তাই নয়, নতুন পদ্ধতিতে (যেমন স্বর্ণ-দিনারের ব্যবহার ও ব্যাঙ্কিং ইত্যাদি) সামুদ্রিক বাণিজ্য, নৌ-যুদ্ধ ও নৌ-চলাচল ব্যবস্থা পরিচালনার নতুন নতুন পন্থা ও রীতি-নীতির পত্তন হল। মুসলিম নৌ-শক্তির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টান শক্তিগুলো পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। ইবনে খালদুন সুস্পষ্টরূপে দেখিয়েছেন, কি করে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর নৌ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও স্পেনের কোন কোন অঞ্চল মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে উসমানীয় তুর্কিগণ কর্তৃক পূর্ব ভূমধ্যসাগরের এক বৃহৎ অঞ্চল ও আফ্রিকার উপকূলে প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের নৌ-শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী তিন শতাব্দী ধরে এ প্রভুত্ব বজায় ছিল।

মুসলিম সামুদ্রিক আইন

অধিকাংশ আইনবিদই সমুদ্র সম্পর্কে প্রায় একরকম কিছুই বলেন নি। অল্প কয়েকজন সমুদ্রের আইন সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা থেকে যুদ্ধ ও শান্তিকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামুদ্রিক আইনের নিখুঁত ছবি দাঁড় করানো কঠিন। আল-কোরআনে সমুদ্র সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি আছে। একটিতে এই সাবধান বাণী রয়েছে ঃ "আল্লাহ ফেরাউনের সৈন্যদের সমুদ্রে নিমজ্জিত করে শাস্তি দিয়েছেন" (২ ঃ ৪৭)। আবার অন্য আর একটিতে দু'রকমের সমুদ্রের কথা আছে—স্বাদু ও মিঠে পানির সাগর আর নোনা এবং তেতো পানির সাগর। আল্লাহ বলেন, উভয় প্রকারের সমুদ্র থেকেই বিশ্বাসীগণ মাছ ধরে খেতে পারবেন, মণি-মুক্তা সংগ্রহ করতে পারবেন ও বিভিন্ন প্রকার সুবিধা

লাভের জন্য সমুদ্রে অভিযান চালাতে পারেন। আল-কোরআনের যে সব নির্দেশের মধ্যে "সমুদ্রকে অধীন করে দিয়েছেন" যাতে করে "সেখানে জাহাজ চলাচল করতে পারে" (৪৫ ঃ ১১) রয়েছে, সেগুলোই অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক। আল-কোরআনে আরও আছে, "তিনি তোমাদের জন্য তারকা সৃষ্টি করেছেন, যাতে স্থলে ও সমুদ্রপথে তোমরা অন্ধকারে পথ চলতে পারো" (৬ ঃ ৯৭)।

হাদিসে কোরআনের চাইতে বেশী কিছু নেই। খলিফা হযরত উমর (রাঃ) বিশ্বাসীদের নাকি সমুদ্র ভ্রমণ থেকে বিরত করেন। সেনাপতিদের তিনি এই নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন সামরিক অভিযান মরুভূমির দিকেই পরিচালিত করেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, হযরত উমর (রাঃ) হযরত মুয়াবিয়া কর্তৃক সাইপ্রাস দখলের প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন; আর অনিচ্ছাকৃতভাবেই হযরত উসমান (রাঃ) তা অনুমোদন করেন।

এ অবস্থায় আইনবিদগণ ইসলাম থেকে শান্তিকালে নৌ-চলাচল ব্যবস্থা কিংবা নৌ-যুদ্ধের আইন সম্বন্ধে প্রামাণ্য সূত্রে কোন নির্দেশ বার করতে পারেন নি। তাই তাঁদের স্থল-যুদ্ধের অনুরূপ অবস্থা থেকে বা অন্যান্য জাতির ব্যবহার-বিধি ও আচার-ব্যবহারের ওপরই এ ব্যাপারে নির্ভর করতে হয়েছে।

নৌ-যুদ্ধের আইন-কানুন

হাদিসে আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন ঃ 'যাঁরা নৌ-যুদ্ধে শহীদ হন, তাঁরা স্থল-যুদ্ধের শহীদদের চাইতে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবেন'। সমুদ্র সম্বন্ধে যে চিরাচরিত ভীতি ছিল, এই পুরস্কার ঘোষণার মধ্যেই সমুদ্র-যুদ্ধে উৎসাহ দেবার প্রয়োজনীয়তা পরোক্ষভাবে সুপরিস্ফুট হয়েছে। শায়বানিও বলেছেন, কোন মুসলমান সমুদ্র অভিযানে শরীক হলে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবেন। জেহাদী জাহাজে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তিনি নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যান।

স্থলযুদ্ধে দুর্গ সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে, নৌ-যুদ্ধে সে আইনই জাহাজের ওপরও প্রযোজ্য হবে। আইনবিদগণ তুলনামূলক বিচার করে ঐক্যবদ্ধভাবে এ নীতি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। জেহাদীরা যেমন অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করে এবং বাইরের সাহায্য থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট করে দুর্গ অবরোধ ও আক্রমণ করতে পারেন, তেমনি সামুদ্রিক জেহাদীরা শত্রুপক্ষের জাহাজের লোকদের বশে এনে বশ্যতা স্বীকার না করানো পর্যন্ত আগুন ধরিয়ে বা ডুবিয়ে দিয়ে শত্রু-জাহাজকে আক্রমণ করতে পারেন ও তার ধ্বংসসাধন করতে পারেন। এ আইনের ওপর ভিত্তি করেই নৌ-জেহাদীগণ শত্রুপক্ষের মনোবল বিনষ্ট করে ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি করে জাহাজের ওপর সরাসরি আক্রমণ করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। জাহাজের ওপর মুসলমান নৌ-সেনারা যে কেবল পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতেন তাই নয়, তাঁরা সাপ, বিচ্ছু ও ক্ষতিকর চূর্ণও ছুঁড়ে মারতেন। শত্রুপক্ষকে বিতাড়িত করার জন্য এবং জাহাজের লোকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও ভীতি সঞ্চারের জন্য তাঁরা এ পন্থা অবলম্বন করতেন।

স্থল-যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে শত্রু-দুর্গের চারদিক শত্রুগণ কর্তৃক বন্দী মুসলিম নারী ও শিশুদের দিয়ে ঘিরে দিলেও যেমন সে দুর্গ আক্রমণ করা যেত, তেমনি জাহাজের চারদিক মুসলিম বন্দী দ্বারা ঘিরে রাখলেও তা হামলা থেকে রেহাই পাবে না। সাধারণ আইনবিদদের মতের বিরুদ্ধে আল-আউযায়ী অবশ্য এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মুসলিম বন্দীদের দ্বারা দুর্গ ঘিরে রাখলে সে দুর্গ আক্রমণ করা চলবে না। তেমনি শত্রু-জাহাজও যদি মুসলমানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত করে দেয়া হয়, তবে সে জাহাজ আগুন ধরিয়ে বা অন্যান্য উপায়ে ধ্বংস করা চলবে না।

নৌ-যুদ্ধের সময় যদি মুসলমানদের কোন জাহাজ ঘায়েল হয়, তবে জেহাদী হয় জাহাজেই অবস্থান করবেন, নয় এক সঙ্গে ডুবে যাবেন অথবা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারেন। যদি তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়েন, তবে তাঁর শত্রুর হাতে পড়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। তবু শত্রুর হাতে তিনি মারা পড়বেন না, এ কথা জোর করে বলা যায় না।

নৌ-যুদ্ধের পর মুসলিম যুদ্ধ জাহাজ বন্দী ও ধন-সম্পদ লাভ করতে পারে। আইনবিদদের মতে, স্থল-যুদ্ধে অর্জিত ধন-সম্পদ যেভাবে বণ্টন করা হয়, নৌ-যুদ্ধেও সেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যদি মুসলিম নৌ-সেনারা দেখেন যে, অর্জিত ধন-সম্পদ ওজনে এত ভারী যে জাহাজ ডুবে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে, তখন তাঁরা যে কেবল ধন-সম্পদই সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারেন তা নয়, নারী ও শিশু সমেত সব যুদ্ধবন্দীকে তাঁরা ফেলে দিতে পারেন। কিন্তু জাহাজে যদি মুসলিম নারী ও শিশু থাকে তবে তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করা চলবে না। কারণ, তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করা অবৈধ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এ দুরবস্থার কথা চিন্তা করেই সুয়ুতী প্রমুখ আইনবিদগণ বলেছেন যে, যুদ্ধ জাহাজে নারী ও শিশুদের নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। মুসলমানদের জাহাজে যদি জিম্মী বা আমানের (নিরাপত্তা) ভিত্তিতে আনীত অমুসলিম থাকেন, তবে তাদেরও সমুদ্রে নিক্ষেপ করা চলবে না। কারণ মুসলমানদের তাদের দেয়া ওয়াদা পালন করতেই হবে।

যদি শত্রু পক্ষের জাহাজ সমুদ্রযাত্রার পক্ষে অকেজো হয়ে পড়ে ও জাহাজীগণ আমান না নিয়েই দারুল ইসলামের উপকূলে এসে হাজির হন, তবে তাদের নিপীড়িত করা চলবে না। আউযায়ী বলেছেন যে, শত্রুপক্ষ যদি আমান প্রার্থী হয়, তবে তাদের তা প্রদান করতে হবে। তবে তারা যদি আমান না চান, তবে তাদের আক্রমণ করা যেতে পারে। যদি কোন শত্রু-জাহাজ দারুল ইসলামের সমুদ্র-উপকূলে এসে পড়ে এবং জাহাজের ব্যবসায়ীদের কোন আমান না থাকে, তবে তাদের শত্রুর কাছ থেকে পাওয়া সম্পদ (Fay) হিসেবে মনে করতে হবে। কিন্তু তারা যদি কূটনৈতিক কার্যোপলক্ষে এসেছে বলে দাবী করে, তবে তাদের কূটনৈতিক নিরাপত্তা (Immunity) দান করতে হবে এবং ইমামের কাছে যেতে অনুমতি দিতে হবে। ইমাম যদি দেখেন যে, তাদের

কাছে পরিচয়-পত্র নেই, তবে তাদের কয়েদ করা, দাসে পরিণত করা কিংবা হত্যা করা যেতে পারে। তাদের ধন-সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা চলবে।

নৌ-বাহিনী সংগঠন

মুসলিম নৌ-বাহিনী যতই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকে, এর দক্ষতা এবং সংগঠন-শক্তি ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে সমুদ্রে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতারূপে যখন মুসলিম নৌ-শক্তি সর্বাধিক শক্তিশালী হয়, তখন মুসলিম রণপোত ও বাণিজ্য বহর পরিচালনা-নৈপুণ্য, সামুদ্রিক-জ্ঞান ও নৌ-কলাকৌশলের দিক থেকে সর্বোচ্চ যোগ্যতা অর্জন করে এবং তদানীন্তন যুগের অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌ-বাহিনী ও নৌ-সংগঠন সম্পর্কে বিস্তর তথ্য পাওয়া গেছে। অন্যান্য মুসলিম এলাকার ব্যাপারেও বোধহয় এ তথ্যগুলো প্রযোজ্য। লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে চালু জাহাজের চাইতে ভূমধ্যসাগরের জাহাজগুলো ছিল আকারে অনেক বড় ও উন্নতমানের। জাহাজ তৈরীর জন্য মুসলমানেরা উৎকৃষ্ট কাঠ আমদানী করতেন এবং সুদক্ষ পরিচালনা ও দ্রুত গমনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংযোজিত করতেন। বিশাল সমুদ্রে চলাচলের সময় জাহাজের ফাটল ও ছিদ্র সহজেই মেরামত করে নেয়া চলত। চলমান জাহাজের চারদিকে কয়েকজন জাহাজীকে সাঁতার দেবার শিক্ষা দেয়া হত। এরা মোম ও সহজলভ্য অন্যান্য জিনিস দিয়ে জাহাজের ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিতেন।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মত নৌ-বাহিনীর এডমিরাল বা "আমীরুল বাহরকে" পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হত। স্বয়ং খলিফার অনেক ক্ষমতারও তিনি অংশীদার ছিলেন। স্থলে যেমন খলিফা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন, তেমনি "আমীরুল বাহরের" কাজ হল সমুদ্র-পথে শাসন চালান। নৌ-জেহাদীদের পরিচালনা এবং অস্ত্রাদির তত্ত্বাবধানের জন্য একজন কায়েদ বা কাপ্তেন নিয়োজিত হতে এবং পাল ও দাড় পরিচালনার জন্য একজন সরদার বা "রইস" থাকতেন। যদি আমিরুল-বাহর নৌ-অভিযান পরিচালনা নিজহস্তে গ্রহণ না করতেন, তবে কোন নিম্নপদস্থ আমীরের হাতে এ কাজের ভার দেয়া হত। গ্রীকগণ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করার ফলে মুসলমানদের সমূহ ক্ষতি সাধিত হবার পর মুসলমানরা নিজেদের যুদ্ধ-জাহাজে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলন করেন। এসব জাহাজকে হারাক্কাস বা আগ্নেয় জাহাজ বলা হত। এগুলো থেকে শত্রু-জাহাজে দাহ্য-বস্তু নিক্ষেপে করা হত।

মুসলমানেরা কম্পাস ব্যবহার করতেন। তবে বোধহয় পরবর্তী যুগে এর প্রচলন হয়। প্রথম যুগের মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন-বিশারদগণ এর কোন উল্লেখই করেন নি। প্রাথমিক ইউরোপীয় কম্পাসের মত এ কম্পাস-পঞ্জীতে বত্রিশটি বিন্দু ছিল। কিন্তু

এটুকু ছাড়া এ দুটোর মধ্যে আর কোন সাদৃশ্য নেই। মুসলমানেরা চারটি প্রধান বিন্দুর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা এ বিন্দুগুলোকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত করেন নি। বিভিন্ন তারকার নামের সঙ্গে মিলিয়ে এঁরা বিন্দুগুলোর নামকরণ করেছেন। প্রধান চারটি বিন্দুকে তাঁরা "আল-জিহাত আল-আ'রবা" বা চারদিক বলে অভিহিত করেছেন। এগুলো হলে ঃ "ইয়া" বা উত্তর (ধ্রুবতারারও ওই একই নাম); "মাতলা" বা পূর্ব; "মাগরিব" বা পশ্চিম। "মাতলা" ও "মাগরিব" সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত থেকে গৃহীত হয়েছে। "কুতব" বলতে দক্ষিণ বোঝায়, মেরুর ওই একই নাম। কম্পাসের বিন্দুগুলো পশ্চিম দিকে উত্তর থেকে দক্ষিণে চিহ্নিত করা হয়। যে তারকা যে দিকে অস্ত যায়, সেই অনুসারেই হয় এক একটি বিন্দুর নামকরণ। পূর্বের দিকেও পর পর একই নামকরণ করে শুধু "মাতলা" কথাটি জুড়ে দেয়া হয়।

একাদশ অধ্যায়
যুদ্ধ-লব্ধ ঃ গানিমা

যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের অর্থ ও প্রকৃতি

মুসলিম আইনে সম্পত্তির ওপর অধিকার বিস্তারের দুটি পন্থা আছে ঃ "ইহরায" ও "নকল"। "ইহরায" বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন জিনিস দখল করা। একে মৌলিক দখলও বলা যেতে পারে। আর "নাকল" হল সর্বজনস্বীকৃত চুক্তির মাধ্যমে বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির হস্তান্তর। বলপূর্বক হোক আর না হোক, যুদ্ধের ফলে অমুসলিমদের কাছ থেকে ধনসম্পদ লাভ করার সাথে সাথে বন্টনের পূর্বমূহূর্ত পর্যন্ত তার ওপর সামগ্রিকভাবে সব মুসলিম যোদ্ধার মৌলিক দখলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, যদিও অমুসলিমগণ এ সম্পদের অধিকারী, তবু ইসলাম গ্রহণ না করে অবিশ্বাস বজায় রাখার ফলে এবং মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার শাস্তি হিসেবে ধনসম্পদের ওপর তাদের দখল বরবাদ হয়ে যায়।

"গানিমা" কথাটি কেবল জোরপূর্বক অমুসলিমের কাছ থেকে অর্জিত সম্পদ সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়। এর মধ্যে যে কেবল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তা-ই নয়, যুদ্ধবন্দী বা "আসরা" এবং নারী ও শিশু বা "সাবিও" থাকে। গানিমা লাভ করতে হলে পূর্বাহ্নে শক্তি প্রয়োগ ও ইমামের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ, শক্তি প্রয়োগ না করে ধনসম্পদ অর্জিত হলে তা শত্রুপক্ষ থেকে অর্জিত সামগ্রিক সম্পদ (Fay) বলে গণ্য হবে। আর ইমামের অনুমতি যদি না থাকে এবং তা এক বা ততোধিক জেহাদী দ্বারা অধিকৃত সম্পত্তি হয়, তবে তাকে চুরি করা জিনিস মনে করা হয়, তা গানিমার পর্যায়ে পড়বে না। ইমামের অনুমতিই নিছক যুদ্ধকে জেহাদে রূপান্তরিত করে এবং যুদ্ধ পরিচালনা ও যুদ্ধপ্রাপ্ত ধনসম্পদ অর্জন ও দাবীদারদের মধ্যে বন্টনের ব্যাপারে আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করে। মুমিনদের মধ্যে যারা যুদ্ধে যোগদান করেন, গানিমা তাদেরই প্রাপ্য। যুদ্ধের শেষে যারা এসে হাজির হন, এতে তাদের কোন দাবীই নেই।

অবশ্য ধনসম্পদ দখলের পূর্বে যারা এসে উপস্থিত হন, তাদের কথা স্বতন্ত্র। খলিফা হযরত উমরের কাছ থেকে পাওয়া হযরত মুহাম্মদের (সঃ) একটি বাণী এ আইনের ভিত্তি। এ বাণীতে আছে ঃ "জেহাদে যাঁরা শরীক হন, গানিমা কেবল তাঁদেরই

প্রাপ্য।" আইনবিদগণও এ সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে একমত প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধে জয়লাভের পূর্বে যদি নব-প্রেরিত সেনাদল পথে থাকে, সে সব সৈন্য অথবা যদি কোন জেহাদী অসুস্থতা ও অন্যান্য বিশেষ কারণ হেতু যুদ্ধে যোগদান করতে অসমর্থ হন, তবে তাঁরাও গানিমার অংশ পেতে পারেন।' কোন কোন আইনবিদ এ সুপারিশ করেছেন। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই যদি কোন যুদ্ধরত জেহাদীর মৃত্যু হয়, তবে তাঁর প্রাপ্য গানিমার অংশ তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রদান করতে হবে।

গানিমা বণ্টন

যুদ্ধ-জয়ের পর গানিমা বন্দোবস্ত করতে হবে। বিজয়ের পূর্বে গানিমা বণ্টন করা নিয়ম নয়। কারণ, যুদ্ধ-জয়ের ওপরই গানিমা লাভ করা নির্ভর করে। বিজয়ের ফলেই সম্পত্তির ওপর শত্রুদের অধিকার বিলুপ্ত হয় এবং তাদের সম্পদের ওপর মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে তারা এ সম্পদ বণ্টন করে দিতে পারেন। যদি মুসলমানরা যুদ্ধে জয়লাভ করেন ও যুদ্ধ চলতেই থাকে, তবে পরিপূর্ণভাবে বিজয়লাভ না করা পর্যন্ত গানিমা বেটে দেবার কাজ স্থগিত রাখতে হবে। যুদ্ধে জয়লাভ না করতে পারলে গানিমার সুষ্ঠু বণ্টন ও গানিমা সম্পর্কিত আলোচনা চালানো উচিত নয়। কারণ, এতে জেহাদীদের মনোযোগ যুদ্ধক্ষেত্রের দিক থেকে গানিমা বণ্টনের বিষয়ে নিবিষ্ট হতে পারে।

গানিমার বণ্টন-কার্য দারুল হারবে চালানো যেতে পারে অথবা দারুল ইসলামে নিয়ে গিয়েই গানিমা বণ্টন করা যেতে পারে। হানাফীপন্থীগণ দারুল হারবে গানিমা বণ্টন করার বিরোধী, যদি না বিশেষ অবস্থায় পড়ে ইমাম দারুল হারবে গানিমা বণ্টনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বানু মুস্তালিক, হাওয়াযিন, হোনায়েন ও খায়বারের যুদ্ধে দারুল হারবেই গানিমা বণ্টন করেন। তাঁর ব্যবস্থা অনুসরণ করে আউযায়ী দারুল হারবেই গানিমা বণ্টনের উপদেশ দিয়েছেন। আবু ইউসুফ বলেন, রাসূল আকরম (সঃ) দারুল হারবেই গানিমা বণ্টন করেছেন। কারণ, এসব যুদ্ধ-জয়ের পরই দারুল হারবের কতকগুলো অঞ্চল দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বদরের যুদ্ধের পর মুসলমানরা মদিনায় না পৌছানো পর্যন্ত তিনি গানিমা বণ্টন করেন নি। এ বিষয়ে ইমাম মালিক আউযায়ীর সঙ্গে একমত পোষণ করেন। কিন্তু শাফেয়ীপন্থীগণ বিষয়টি নির্ধারণের ভার ইমামের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিবেচনা করবেন। দারুল হারবে গানিমা বণ্টন করা যদি তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তবে তিনি সেই হুকুমই দেবেন। আর তিনি যদি গানিমা বণ্টন স্থগিত রাখতে চান, তবে গানিমা দারুল ইসলামে নিয়ে যেতে হবে।

বদরের যুদ্ধের (খৃস্টীয় ৬২৪ সন) পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) গানিমা বন্টনের ব্যাপারে অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগ করতেন। আরবীয় আচার-ব্যবহার অনুসারেই তখন তিনি গানিমা বন্টনের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাই আল্লাহ-প্রদত্ত এ আইন-বিধান মারফত বিষয়টির মীমাংসা হয় ঃ

"যখন তোমরা গানিমা লাভ কর, তখন তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য দান কর, এবং নিকট আত্মীয়, এতিম দরিদ্র ব্যক্তি ও মুসাফিরদের জন্যে রাখো"(৮ ঃ ৪২)।

গানিমার এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য। কিন্তু এ অংশ কি করে খরচ করা হবে, এ নিয়ে তীব্র মত-বিরোধের সৃষ্টি হয়। নেতৃস্থানীয় আইনবিদগণ তাঁদের মতামত এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

ইবনে আব্বাস বলেন যে, এই এক পঞ্চমাংশ ছ'ভাগে ভাগ করা হত। এক ভাগ আল্লাহর জন্য (কাবা শরীফের জন্য ব্যয়িত হবে); দ্বিতীয় ভাগ রাসূলুল্লাহ'র (সঃ) জন্য; তৃতীয় ভাগ নিকট আত্মীয়-স্বজনের জন্য; চতুর্থ ভাগ এতিমের জন্য; পঞ্চম ভাগ গরীব লোকদের জন্য ও ষষ্ঠ ভাগ মুসাফিরদের জন্য বরাদ্দ করা হত। আতা ইবনে আবিরুবাহ ও আল হাসান ইবনে মুহাম্মদ বলেছেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এক পঞ্চমাংশের একটি অংশ পাবেন। আল্লাহর সম্পর্কে আয়াতটি অন্যান্য অংশের পূর্বসূচনা, তাই এ ভাগ গণনা করা উচিত নয়। হাম্বলী আইনবিদগণ এই একই মত পোষণ করেন।

হানাফী আইনবিদগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, গানিমার এক-পঞ্চমাংশ এ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা উচিত ঃ একটি রসূলের (সঃ) (যা তাঁর মৃত্যুর পর খলিফার অধীনে যাবে); অন্যটি নিকট আত্মীয়-স্বজনের এবং তৃতীয়টি এতিম, গরীব লোক ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে।

মালিকী আইনবিদগণ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এক পঞ্চমাংশ গানিমা শত্রুপক্ষ থেকে উদ্ধার করা সামগ্রিক সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হবে; অর্থাৎ তা মুসলিম সমাজভুক্ত গরীব ও ধনীর মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বেটে দিতে হবে। ইমাম মালিক আরও বলেন যে, যদি ইমাম ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর অংশ নবী করীমের (সঃ) আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও বন্টন করে দিতে পারেন।

শাফেয়ী আইনবিদগণ বলেন যে, এক পঞ্চমাংশ গানিমা আল-কোরআনের বিধান অনুসারে পাঁচভাগে ভাগ করতে হবে। আল্লাহ ও রাসূল এর একভাগ পাবেন।

হযরত মুহাম্মদের (সঃ) ওফাতের পর আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) অংশ সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়। এক মত অনুসারে এভাগ অন্যান্য সবার মধ্যে বেটে দিতে

হবে। আবার অন্যান্য আইনবিদ বলেন, এ ভাগ ইমামকে দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, যুদ্ধের প্রস্তুতির কাজে এ অংশের সদ্ব্যবহার করতে হবে।

নিকট আত্মীয় কথাটি নিয়েও তখন মতবিরোধ দেখা দেয়। কোন কোন আইনবেত্তা নিকট আত্মীয় বলতে বানু হাশিম গোত্র বুঝেছেন। আবার অন্যান্য আইনবিদ বানু হাশিম ও বানু আবদুল মুত্তালিবকে নিকট আত্মীয়ের পর্যায়ে এনেছেন।

পাঁচভাগের একভাগ পুরুষ ও সাবালক যুদ্ধরত জেহাদীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। আউযায়ী বলেছেন, মহিলা এবং শিশুদেরও গানিমার অংশ দিতে হবে। কিন্তু অন্যান্য আইনবিদ এর বিরোধিতা করেছেন। ইবনে হাম্বল তাদের কিছু অংশ দিতে চান। কিন্তু তা পুরুষের অংশের চাইতে কম হবে।

বিভিন্ন আইনের মযহাব হিসেবে গানিমার চারভাগ বিভিন্ন উপায়ে বণ্টন করতে হবে। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী বলেন, তিনভাগ অশ্বারোহী সৈন্যকে দিতে হবে (দু'ভাগে অশ্বের জন্য ও একভাগ অশ্বারোহীর জন্য) এবং একভাগ পদাতিক সৈন্যরা পাবেন। ইমাম ইবনে হাম্বল ও ইমাম মালিক ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা দু'ভাগ অশ্বরোহীকে দিয়েছেন (একভাগ অশ্বের জন্য ও অপর ভাগ অশ্বারোহীর জন্য)। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, পশুকে মানুষের চাইতে বেশী দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়। পদাতিক সৈন্যকে তিনি এক অংশ দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফার সুবিখ্যাত শিষ্য আবু ইউসুফ তাঁর ওস্তাদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনি অশ্বারোহীকে তিনভাগ দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা ও শায়েবানীর মতে, যদি অশ্বারোহী একাধিক অশ্ব এনে থাকেন, সে ক্ষেত্রেও তিনি আর বেশী অংশ পাবেন না। আবু ইউসুফ ও ইমাম ইবনে হাম্বল উর্ধ্বপক্ষে দুটি অশ্ব পর্যন্ত গানিমার অংশ দিতে চেয়েছেন। এছাড়া পদাতিক সৈন্যরাই কেবল অংশ পেতে পারবেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্ব ভিন্ন অন্যান্য পশু যারা আনবেন, তারা কোন অংশ পাবেন না।

ইমাম অবশ্য গানিমার বিশেষ অংশ দেবার জন্য যুদ্ধ-জয়ের পূর্বে কিংবা যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে প্রতিশ্রুতি দান করতে পারেন। আইনের ভাষায় বলতে গেলে, ইমামের "তানফীলে"র ক্ষমতা রয়েছে, যার বদৌলতে তিনি প্রয়োজন মনে করলে জেহাদীদের অংশ বাড়িয়ে দিতে পারেন।

ইমাম বৈধ অধিকার অনুযায়ী অমুসলমানদের হত্যা করে তাদের সম্পত্তি অধিকার করার অনুমতি জেহাদীদের দিতে পারেন। এ ক্ষমতা প্রয়োগ করার ব্যাপারে অবশ্য মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক বলেন, ইমাম যদি তাঁর "তানফীল" ক্ষমতার মারফত বিজয়ী জেহাদীকে ধন-সম্পদ অধিকার করার অনুমতি না দেন, তবে তিনি তা দখল করতে পারবেন না। বাস্তুত্যাগী অমুসলিমদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি যদি আত্মসাৎ করা না

হয়, তবে ইমাম শাফেয়ী বিজয়ী জেহাদীদের শত্রুপক্ষের ধন-সম্পদ দখল করার অনুমতি দেন। আর কোন কোন আইনবিদ বলেন যে, গানিমা বন্টনের সাধারণ নিয়ম অনুসারেও যুদ্ধ-লব্ধ ধন-সম্পদ বেটে দেয়া যেতে পারে।

পরিশেষে, বিশ্বাসীদের ধন-সম্পদ যখন আবার অমুসলিমদের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়, তার কথা ধরা যাক।

প্রথমতঃ, হযরত আলীর (রঃ) মতামতের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন এ সম্পত্তি গানিমার অংশ বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, এ সম্পত্তি মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয়তঃ, যদি উদ্ধারকৃত সম্পদ গানিমা হিসেবে বিভক্ত হবার পর সাবেক মালিক কর্তৃক দাবী করা হয়, তবে তাতে তার আর কোন অধিকার নেই। তবে বণ্টন করার পূর্বে যদি তিনি দাবী পেশ করতে পারেন, তবে তিনি তার সম্পদ ফিরে পেতে পারেন। চতুর্থতঃ, যদি উদ্ধারকৃত সম্পদ শক্তি-বলে অমুসলিমরা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে সাবেক মালিক এ সম্পদ বন্টনের পূর্বে ফেরত পেতে পারেন। তবে যদি অমুসলিমগণ এ মাল বিনা শক্তি প্রয়োগে ছিনিয়ে নিয়ে থাকে, তবে সাবেক মালিক গানিমা বণ্টনের পূর্বে বা পরে ফেরত পেতে পারবেন।

স্থাবর সম্পত্তি

শক্তি-বলে যখন অস্থাবর সম্পত্তির মত স্থাবর সম্পত্তিও অধিকার করা হয়, তখন তা গানিমার অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। অস্থাবর সম্পত্তির বণ্টন খুব বেশী সমস্যার সৃষ্টি করে নি। কিন্তু স্থাবর সম্পদের বণ্টন ও মালিকানা বিভিন্ন জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশেষ আইন মারফত এ সমস্যার সমাধান করা হয়। বিভিন্ন মযহাবে এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত রয়েছে। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জীবদ্দশায় জেহাদীদের মধ্যে জমি বণ্টন থেকে শুরু করে সম্পত্তিতে রাষ্ট্রীয় অধিকার পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। কিন্তু হযরত উমরের (রাঃ) জমি সম্বন্ধীয় নির্দেশের পূর্বে এ সম্পর্কে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিল না। সামরিক কারণে হযরত উমর নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেন যে, জমি থেকে তার মালিককে বঞ্চিত করা ও তাদের অপসারণ করা চলবে না। তবে তাদের খারাজ বা ভূমি-রাজস্ব এবং জিযিয়া দিতে হবে। এ শুল্ক থেকে পাওয়া অর্থ বিশ্বাসীদের ভরণপোষণের কাজে ব্যয়িত হবে। মুসলমানগণ যেমন কৃষিকার্যে নিযুক্ত হতে চাইতেন না, তেমনি তাদের এ বৃত্তি গ্রহণ করতে অনুমতিও দেয়া হত না। এ নিয়ম প্রথম সাওয়াত নামক ভূ-খণ্ডের ওপর (দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া বা ইরাক) বলবৎ করা হয়। পরে গানিমার অংশ হিসেবে নতুন জমি অধিকৃত হলে সেখানেও মৌলিকভাবে এ

নিয়মই প্রযোজ্য হতে থাকে। জমির তত্ত্বাবধায়কের ইসলাম গ্রহণ বা মুসলমানের কাছে জমি বিক্রয়ের ফলে সাবেক কৃষকের কাছ থেকে জমি হস্তান্তর অনুমোদিত হয় নি। তবু ইমাম মাঝে মাঝে বিশেষ অবস্থায় এ অনুমতি প্রদান করেছেন।

অধিকাংশ লোকের ইসলাম গ্রহণ এবং জমি হস্তান্তর বৈধ বলে গণ্য হবার ফলে আইনবিদগণ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেন ও বিভিন্ন মযহাবের লোকের বিভিন্ন মত পেশ করেন। হাম্বলী আইনবিদগণ বলেন যে, ইমাম ইচ্ছা করলে স্বচ্ছন্দে জমি জেহাদীদের মধ্যে বেটে দিতে পারেন কিংবা জমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে মনে করতে পারেন। আবার জমির মালিকদের জমি যে অবস্থায় আছে, তিনি সে অবস্থাতেও রেখে দিতে পারেন। এ জন্যে তাদের অবশ্য খারাজ দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা খায়বারের নজির দেখিয়ে বলেন যে, রাসূলে আকরম (সঃ) এ স্থানের জমি অংশতঃ বন্টন করে দেন ও বাকীটুকু রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। ইমাম মালিক সব স্থাবর সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের অধীনে সামগ্রিক সম্পদ হিসেবে এবং জমির ফসলের অংশকে সরকারী আয়ের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। মালিক আইনবিদদের মতে, জমি কখনই বন্টন করে দেয়া চলবে না। শাফেয়ী আইনবিদগণ সাধারণ-নীতি অনুসরণ করে অন্যান্য সম্পদের মত জমিকেও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করেছেন এবং জেহাদীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া যাবে বলে সাব্যস্ত করেছেন। অবশ্য জেহাদীরা যদি এ জমি গ্রহণ করতে অসম্মত হন, তবে তা সামগ্রিক সম্পদে পরিণত হয়।

যুদ্ধ-বন্দী

যুদ্ধ-বন্দীদের 'গানিমার' অংশ হিসেবে গণ্য করার রীতি খুবই প্রাচীন এবং পুরাকাল থেকেই এ প্রথা চলে আসছে। পারসিকগণ যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি অমানুষিক ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করত। বন্দীদের অন্ধ করে দেয়া হত, শারীরিক কষ্ট দেয়া হত, মেরে ফেলা হত কিংবা ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হত। ইহুদীদের রীতি পারসিকদের চাইতেও কম নৃশংস ছিল না। যুদ্ধ-বন্দীদের গানিমার অংশ হিসেবে গণ্য করে মুসলমানেরা তাদের প্রতি যে ব্যবহার করতেন, তা পূর্ববর্তীদের চাইতে কম কঠোর ছিল না। যুদ্ধ-বন্দীদের সম্পর্কে আইন আল-কোরআনের এ নির্দেশের মধ্যে পাওয়া যায় ঃ

"লোক-ক্ষয়ী যুদ্ধ ব্যতিরেকে কোন নবীর পক্ষেই যুদ্ধ-বন্দী লাভ করা সম্ভব হয় নি"(৮ ঃ ৬৮)।

"তাই, যখন তোমরা যুদ্ধে অবিশ্বাসীদের মোকাবেলা কর, তখন তাদের রেহাই দিও না; তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার পর চুক্তির শর্ত কঠোরভাবে স্থির কর। অতঃপর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সুযোগ-সুবিধা প্রদান কর অথবা ছেড়ে দাও" (৪৭ ঃ ৪—৫)।

যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন আইনপন্থীদের মধ্যে নানামতের সৃষ্টি হয়েছে। আইনবিদরা এ চারটি পন্থার যে কোন একটি অনুসরণ করতে ইমামকে পরামর্শ দিয়েছেন ঃ

প্রথমতঃ, ইমাম যুদ্ধ-বন্দীদের সবাইকে বা কিছুসংখ্যককে মেরে ফেলার হুকুম দিতে পারেন। আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, বিশেষ কারণ ভিন্ন হত্যা করা উচিত নয়। শত্রুপক্ষকে দুর্বল করে দেবার জন্য বা বৃহত্তর মুসলিম স্বার্থের খাতিরে এ নীতির প্রয়োজন হতেও পারে। আউযায়ী বলেন যে, যুদ্ধ-বন্দীকে হত্যার পূর্বে মৃত্যুদণ্ডের বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে তাকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি আল-কোরআনের নির্দেশানুযায়ী "ফিদা" (যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্ত করার জন্য ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করে তাদের মুক্ত করে দিতে পারেন; অথবা ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকেও তাদের ছেড়ে দিতে পারেন। খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) ফিদা নিয়ে মুক্ত করার বিরোধী ছিলেন।

তৃতীয়তঃ, তিনি মুসলিম যুদ্ধ-বন্দীদের সঙ্গে এসব বন্দীদের বিনিময় করতে পারেন। খলিফা হযরত উমর (রাঃ) মুসলিম যুদ্ধ-বন্দীদের মুক্ত করার ওপর বিশেষ জোর দেন। তাঁর মতে, এজন্য গানিমা থেকেও অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে কিংবা বায়তুল মাল থেকে টাকা দিয়ে তাদের মুক্ত করা যেতে পারে। ইমাম মালিক বলেন যে, যুদ্ধ-বন্দীদের যদি দাসে পরিণত করা না হয়, তবে হয় তাদের হত্যা করতে হবে নতুবা মুসলিম যুদ্ধ-বন্দীদের সঙ্গে বিনিময় করতে হবে। আব্বাসীয় আমলে এটাই সাধারণ নীতি হয়ে দাঁড়ায় এবং চুক্তি মারফত বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়।

চতুর্থতঃ, ইমাম যুদ্ধ-বন্দীদের দাসে পরিণত করতে পারেন। দাসদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে।

যুদ্ধ-বন্দী হিসেবে সুবিখ্যাত পারসিক সেনাপতি আল হারমুযানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইনি প্রথম ইরাক অভিযানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। হারমুযান খৃস্টীয় ৬৪০ সনে বন্দী হন এবং তাঁকে মদিনায় প্রেরণ করা হয়। খলিফা হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার মনস্থ করেন। হারমুযানকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আল-হারমুযান জবাব দেন (মুগীরা ইবনে শূবা দোভাষী ছিলেন) ঃ

'প্রাক-ইসলামী যুগে আল্লাহ নিরপেক্ষ ছিলেন এবং আমাদের যুদ্ধ করার সুযোগ দান করেন। আর এভাবেই আমরা আপনাদের ওপর জয়ী হই।'

হযরত উমর (রাঃ) বললেন ঃ 'না। এর কারণ হল, আপনারা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, আর আমরা তা ছিলাম না। এখন বলুন, আপনি কেন শান্তির ওয়াদা পালন করেন নি?'

হারমুযান জবাব দিলেন ঃ 'আমার ভয় হয়, আপনি আমার কথা শেষ হবার পূর্বেই আমাকে হত্যা করবেন'।

তৃষ্ণায় প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় তিনি পানি চাইলেন। খলিফা বললেন ঃ 'তাকে শান্তিতে পানি পান করতে দাও'।

বন্দী বললেন ঃ 'না, আমার ভয় হয়, কেউ আমাকে অজান্তে হত্যা করবে।'

'হযরত উমর (রাঃ) বললেন ঃ 'পানি পান না করা পর্যন্ত আপনার জীবন নিরাপদ।'

হারমুযান ভাবলেন, তিনি জয়ী হয়েছেন। তাই তিনি পানি মাটিতে ফেলে দিলেন। খলিফা আর এক পেয়ালা পানি আনতে বললেন। কিন্তু হারমুযান বললেন যে, তাঁর আর পানির দরকার নেই। 'আমি পানি চাই নি, চেয়েছি নিরাপত্তা (আমান)। আর তা ত' আপনি আমাকে দান করেছেন।

হযরত উমর বললেন ঃ 'মিথ্যাবাদি! আমি তোমাকে হত্যা করব।' খলিফার পারিষদগণ বাধা দিয়ে বললেন যে, তাঁকে ত' ইতিমধ্যেই আমান দেয়া হয়ে গেছে। তখন খলিফা তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দানের আইনগত পন্থা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কোন কিছুই খুঁজে পেলেন না। তাই তাঁকে ক্ষান্ত হতে হল। তিনি বললেন ঃ 'লোকটা আমায় ঠকিয়েছে। কিন্তু আমি ত সে লোকের জীবন বাঁচাতে পারি না, যে ব্যক্তি বার বার বিশ্বাসঘাতকতা করে অতগুলো বিশ্বাসীকে হত্যা করেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যে পর্যন্ত আপনি ইসলাম গ্রহণ না করেন, সে পর্যন্ত আপনি প্রতারণা দ্বারা বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন না।' তৎক্ষণাৎ সেখানেই আল-হারমুযান ইসলাম কবুল করলেন। অতঃপর স্বাধীনভাবে তিনি মদিনায় বসবাস করতে থাকেন এবং বায়তুল মাল থেকে একটি বৃত্তি লাভ করেন।

আইনজ্ঞগণ এ সম্বন্ধে একমত যে, সাবীকে হত্যা করা যাবে না। এর মধ্যে অনেক মহিলা ও শিশু থাকে। তাদের দাসে পরিণত করে বণ্টন করে দিতে হবে। কোন কোন মহিলা ও শিশুকে মৃত্যুদণ্ড দান করা হয়। কিন্তু রাসূল করীম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মহিলা ও শিশু হত্যার বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন। সাবীদের বিনিময়ে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার রীতি তিনিই প্রবর্তন করেন।

শত্রুপক্ষ কর্তৃক ধৃত মুসলিম বন্দীগণ শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না এবং তাদের হুকুম তামিল করবেন না। যদি তারা পালিয়ে যেতে পারেন কিংবা শত্রুপক্ষের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে পারেন, তবে তা করবেন। যদি মুসলিম বন্দীগণ পালিয়ে না যাবার ওয়াদা দিয়ে থাকেন, তবে তিনি তা যথাযোগ্যভাবে পালন করবেন। মুসলিম বন্দীগণ কখনও শত্রুপক্ষকে মুসলমানদের প্রয়োজনীয় খবরাখবর দিবেন না। এটাই তাদের কর্তব্য। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও শরীক হবেন না ও ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারবেন না। অবশ্য জোরপূর্বক যদি তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। যদি কোন মুসলিম মহিলা শত্রু-হস্তে বন্দী হন, তবে তাঁকে প্রহার করলেও তিনি তাদের কোন দাবী দাওয়া মেনে নেবেন না। তাঁর জীবন বিপন্ন

হলে অবশ্য অন্য কথা। ইমাম লোক বা সম্পত্তি বিনিময়ের দ্বারা বন্দীদের মুক্ত করার বন্দোবস্ত করবেন।

দাসদের অবস্থা

যুদ্ধে পরাজিত শত্রুকে দাসে পরিণত করার রীতি খুবই প্রাচীন। পুরাকালে প্রাচ্যে এ নীতি প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ দাসই ছিল বিদেশী। অবশ্য আরবীয় দাস যে একেবারে ছিল না, তা নয়। এরা ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজেদের মুক্ত করতে পারত। ইসলামী আইনের ভিত্তি ছিল, আরবীয় আচার-বিধি। তাই এ আইন দাস প্রথাকে স্বীকার করেই নিয়েছিল। কিন্তু ইসলামী আইন ও ধর্মের চুলচেরা বিচারে দেখা যায় যে, ইসলাম দাসদের নৈতিক মান উন্নত করেছে এবং তাদের সামনে মুক্তির বিপুল সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। পুণ্যবান মুসলিমকে দাসমুক্ত করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। আর দাস-মুক্তির ফলে বেহেশতে তাঁদের জন্য রয়েছে অপরিমিত নেয়ামত। যাই হোক, তবুও দাস প্রথা উনবিংশ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হওয়া অবধি আংশিকভাবে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল।

ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বা যুদ্ধে অর্জিত গানিমা হিসাবে দাসদের ওপর কর্তৃত্ব ব্যাপিত হত। গানিমার মারফতই মুসলিম যুদ্ধ আইনে দাস প্রথা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। ক্রয়-বিক্রয় আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় নয়। কারণ, তা বিক্রয়ের আইনের মধ্যে পড়ে। শত্রুপক্ষের পরাজয়ের পর ইমাম যদি বিজিত এলাকার সমগ্র অধিবাসীকে দাসে পরিণত করতে পারেন, তবে জেহাদীদের মধ্যে গানিমা হিসেবে তাদের বন্টন করে দিতে পারেন। যখন বিজিত এলাকার অধিবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করে না এবং তাদের জমিজমা বহাল রেখে তাদের কাছ থেকে খারাজ আদায় করতেও ইমাম রাজী হন না, তখনই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যারা দাস গ্রহণ করেন, তারা দাসদের নিজের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতে পারেন। আইনের এরূপ ব্যাখ্যাই দেয়া হয়েছে। কিন্তু নৈতিক দিক থেকে মুসলমানদের অভিমত এই যে, দাসদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং করুণা প্রদর্শন করতে হবে। গানিমা বন্টনের ব্যাপারে মহিলাকে তার স্বামীর কাছ থেকে এবং শিশুদের তাদের মাতা-পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না।

সাধারণতঃ আরবদের দাসে পরিণত কর হত না। কিন্তু রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও খলিফা আবু বকরের (রাঃ) আমলে কিছু কিছু আরবকে দাসে পরিণত করা হয়। রাসূল (সঃ) বানু মুসতালিক গোত্রের আরবদের দাস করে নেন। কিন্তু যখন তিনি এ গোত্রের জুবাইরিয়া নাম্নী সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি এদের একশো জনকে মুক্ত করার আদেশ দেন। হাওয়াযিন গোষ্ঠীর কয়েক হাজার ব্যক্তিকে তিনি দাস করে নেন। কিন্তু আত্মীয়তা ও দাবী-দাওয়া পেশ করার দরুন তিনি ছ'হাজার দাস মুক্ত করে দেন। খলিফা আবু বকর (রাঃ) বানু নাজিরার লোকদের দাস করে নেন। খলিফা

উমর (রাঃ) কিন্তু আরবদের দাসে পরিণত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বার বার তাঁর বাণী উল্লিখিত হয়েছে, 'আরবদের ওপর মালিক হওয়া (অর্থাৎ তাদের দাসে পরিণত করা) চলবে না'। সিরিয়া ও ইরাকের অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের কৃষিকার্যে নিযুক্ত রেখে তিনি খারাজ গ্রহণ করতেন; এতেই তিনি অধিক উৎসাহী ছিলেন।

মুসলমানদের দাস প্রথার সঙ্গে দাসমুক্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। প্রভুর কাছ থেকে দাস বিশেষ সুযোগের ভিত্তিতে বা ক্ষতিপূরণ দিয়ে মুক্তি লাভ করতে পারত। ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের তাগিদে আল-কোরআন ও হাদিসে দাসমুক্ত করতে আহ্বান করা হয়েছে। কাজেই মুসলিম সমাজে দাসদের স্থায়ীভাবে দাসত্বের নিগড়ে বন্দী করা হত না। দাস জীবদ্দশায়ই মুক্তির ভরসা পেত। মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী জগতের বাইরে দাস প্রথার রীতি নীতি তখনকার দিনে অনেক বেশী কঠোর ও অনমনীয় ছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়
যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

যে জাতি আল্লাহর নিকট হতে পূর্ব থেকেই বিজয়ের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল, তারা কি করে শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ না করলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে পারে? ইসলামের মধ্যে আল্লাহর মহিমান্বিত শক্তি নিহিত রয়েছে। তাই শত্রুপক্ষ পরাজিত হতে বাধ্য। কারণ, যেখানে ইসলাম সেখানেই রয়েছে সাফল্য। যদি ইমাম বা তাঁর সেনাপতিগণ দেখেন যে, বিজয় লাভ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ছে, তখন তাঁদের ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। কারণ, এর ফলে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত তাঁরা জয়লাভ করতে পারবেন। এতে খুব বেশী সময় লাগলেও কিছু আসে যায় না। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন ঃ

"হে বিশ্বাসীগণ! সবর কর। দেখা যাক তোমাদের মধ্যে কে বেশী ধৈর্যধারণ করতে পার। দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; তবেই কৃতকার্য হতে পারবে" (৩ ঃ ২০০; ২ ঃ ১৪৯)।

বিজয় লাভ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার বিরুদ্ধে আল-কোরআনে অনেক সাবধান বাণী রয়েছে। আর হাদিসে যে কেবল এর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারীই আছে তা নয়, যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকে গোনাহ বা পাপের কাজ বলেও গণ্য করা হয়েছে।

মাওয়ার্দী তাঁর 'আহকাম-উস-সুলতানিয়া'তে নসিহত করেছেন ঃ 'বিজয়ের শুভমুহূর্ত না আসা অবধি ইমাম কখনোই যুদ্ধ বন্ধ করবেন না।' তিনি আরও বলেন যে, যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য সর্বদা ধৈর্যধারণ করা অপরিহার্য। এর থেকে এই চারটি ফলাফলের যে কোন একটি লাভ করা যেতে পারে ঃ

প্রথমতঃ, শত্রুরা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আমাদের সঙ্গে সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে, আর একই পর্যায়ের বাধ্যবাধকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ, আল্লাহর দয়ায় ইমাম মুশরিক গোত্রসমূহের ওপর বিজয়ী হলে এবং বিজিতরা অমুসলিম থাকলে তাদের জীবন ও ধন-সম্পদ মুসলমানদের কবলে আসবে।

তৃতীয়তঃ, শান্তি-চুক্তির ফলে শত্রুপক্ষ শুল্ক দিতে বাধ্য হবে।

চতুর্থতঃ, শত্রুপক্ষ আমানের (নিরাপত্তা) মারফত শান্তি লাভ করতে পারে।

মাওয়ার্দী অবশ্য যুদ্ধে অকৃতকার্য হওয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। তিনি ও অন্যান্য বহু আইনবিদদের কাছে মুসলমানদের যুদ্ধে পরাজয় বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

কোন কোন আইনবিদ বলেন যে, যদি মুসলমানদের ওপর বিপদ নিপতিত হয় (অর্থাৎ তাদের পরাজয় ঘটে), তবে ইমাম শত্রুপক্ষের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে পারেন। কিন্তু 'হোদায়বিয়ার সন্ধি'তে যতটা সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী মেয়াদের চুক্তি সম্পাদন করা চলবে না। বিশেষ কারণ বিদ্যমান থাকলেই কেবল এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলবে। সন্ধির মেয়াদ পার হয়ে গেলেই মুসলমানেরা আবার জেহাদ শুরু করবেন। অবশ্য ইমাম যদি মনে করেন যে, পুনরায় যুদ্ধ করার মত শক্তি তাঁর আছে, তবেই জেহাদে নামতে হবে। আর ইমাম যদি মনে করেন যে, যুদ্ধ শুরু করবার মত শক্তি মুসলমানদের নেই, তবে তিনি চুক্তির মেয়াদ পূর্বের মতই বাড়িয়ে দিতে পারেন; কিন্তু তার বেশী নয়। তিনি যদি চুক্তির মেয়াদ পূর্বকথিত চুক্তির চাইতে বেশী বাড়িয়ে দেন, তবে তা আইন বহির্ভূত বলে গণ্য হবে।

আল-কোরআনের যে নির্দেশে বলা হয়েছে যে, বিশজন বিশ্বাসী দু'শজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন, (যে নির্দেশ অন্য আর একটির দ্বারা নাচক হয়ে গেছে ঃ "এক হাজার বিশ্বাসী দু'হাজার অবিশ্বাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন; কারণ, আল্লাহ "জানেন যে, তোমাদের দুর্বলতা আছে" ৮ ঃ ৬৬-৬৭) তার ভিত্তিতে কোন, কোন আইনবিদ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা যদি শত্রুপক্ষের সৈন্যের অর্ধেক হয়, তবে তাদের (মুসলিমদের) আর যুদ্ধ করতে হবে না। অন্যান্য আইনবিদগণ বলেন যে, শক্তির পরিমাণ কেবল জনবলের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শত্রুর অস্ত্র-শস্ত্রের ওপরই এটা নির্ভর করবে। তাই কোন মুসলমান যদি দেখেন যে, শত্রুপক্ষের কোন সৈন্য তার চেয়ে অধিকতর এবং পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, তবে তিনি পশ্চাদপসরণ করতে পারেন। ইমাম আবু হানিফা বলেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে যখনই বুঝতে পারবেন যে জয়লাভ করা অসম্ভব কেবল তখনই পশ্চাদপসরণ করা যেতে পারে। মালিকী আইনবিদগণ পশ্চাদপসরণ করা কেবল তখনই অনুমোদন করেন, যখন অধিক অগ্রসর হওয়ার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু তাঁরা যদি দেখেন যে, পশ্চাদপসরণ করলেও মৃত্যু অবধারিত, তবে তাঁরা মৃত্যুবরণ করে যুদ্ধ করে যাবেন। ইমাম ইবনে হাম্বল পশ্চাদপসরণ কেবল তখনই সমর্থন করেন যখন দেখা যায় যে, শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা বিশ্বাসীদের সৈন্য সংখ্যার দ্বিগুণ। ইবনে হোদাইল বলেন যে, যদি বিশ্বাসীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে চরম দুর্দশা ও সংকটে পতিত হন, যেমন তৃষ্ণা ও ক্ষুধার ফলে যদি তাঁরা যুদ্ধ পরিচালনার শক্তি হারিয়ে ফেলেন, তবেই শুধু পশ্চাদপসরণ করা যেতে পারে।

আওযায়ী এ বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ 'যদি ইমাম দেখতে পান যে, তাঁর সৈন্যদল দুর্বল হয়ে পড়েছে অথবা মুসলমানগণ গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, তবে বার্ষিক শুল্ক দানের শর্তের ভিত্তিতে হলেও শত্রুপক্ষের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।' আওযায়ী উমাইয়া আমলের লোক। তাই, তাঁর সমসাময়িক

কয়েকজন উমাইয়া খলিফা বাইজান্টীয়দের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, তিনি তারই স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

মুসলিম আইনবিজ্ঞানে যুদ্ধে পরাজয়ের প্রশ্নটি এক হেঁয়ালীপূর্ণ বিষয়। অনিবার্য কারণে বাধ্য না হলে এতে পরাজয়বরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে আরো নির্দেশ রয়েছে যে, যথেষ্ট সৈন্যসংখ্যা না থাকলে ইমামকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে হবে; অথবা যদি পরাজিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে তাঁকে পশ্চাদপসরণ করে অবশিষ্ট বিশ্বাসীদের জীবন রক্ষা করতে হবে। পরাজিত মুসলমানরা সব সময়েই একথা বলেছেন যে, যতদিনই অপেক্ষা করার দরকার হোক, শত্রুপক্ষের সঙ্গে অবশ্যই পুনরায় তাদের যুদ্ধ করতে হবে।

ইসলামী জগতে যখন সাধারণ যুদ্ধ চালু হয়ে গেল, তখন জেহাদ ঘোষণার ন্যায়ানুগতার ওপর জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন নির্ভর করত না। সৈন্যদের মনোবল ও সেনাপতিদের রণকৌশলের ওপরই সব নির্ভর করত। তুরতুশী সাহসিকতা ও মনোবলের ওপর খুব বেশী জোর দিয়েছেন। আর আল-হাসান ইবনে আবদুল্লাহ্ অস্ত্র-শস্ত্রের কার্যকারিতার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুনের অভিমতের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন যে, যুদ্ধ-জয়ের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠতার চাইতে কতগুলো সুপ্তশক্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, যেমন যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতি এবং রণকৌশল। কোন মুসলিম শাসক ধর্মীয় উদ্দেশ্যবিহীন সাধারণ যুদ্ধে লিপ্ত হলে অবিশ্বাসীদের হাতে যদি বিশ্বাসীরা পরাজিত হন, তবে তাতে দোষণীয় কিছুই নেই।

তৃতীয় খণ্ড

শান্তি সম্বন্ধীয় আইন

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ভূমিকা

একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, জেহাদ দারুল হারবকে দারুল ইসলামে পরিণত করার একটি মাধ্যম বিশেষ। যদি কখনও পূর্ণাঙ্গভাবে এ উদ্দেশ্য সাধিত হত, তবে দারুল হারবের আর কোন অস্তিত্ব থাকত না এবং অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভিন্ন জেহাদের আর কোন প্রয়োজনই হত না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যেতে পারে যে, ইসলামী আইনবিজ্ঞানে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠা। এই কারণেই বোধহয় খারেজীদের মত জেহাদ ধর্মের ষষ্ঠ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয় নি। শান্তিপ্রতিষ্ঠার অস্থায়ী হাতিয়ার হিসেবেই জেহাদের ভূমিকা কার্যকরী হয়েছে। ধর্মের নীতিগুলোর মধ্যে জেহাদ অন্যতম স্থায়ী নীতি হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, ইসলামের ধর্মীয় আইনবিজ্ঞান শান্তিপূর্ণ বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আর একটি অতি আদর্শবাদ (Utopia) পেশ করেছে। খৃস্টধর্মের মতই ইসলাম মানবজাতির মুক্তি এনে দেবার সাধনা করেছে। মুসলিম শক্তি ক্ষীয়মান হয়ে আসার পরেও মুসলিম আইনবিদ ও দার্শনিকগণ আদর্শস্থানীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মত রাষ্ট্র সম্পর্কীয় সুদূরপ্রসারী নীতির উদ্ভাবন করে খোদায়ী রাষ্ট্রের আদর্শ সংজ্ঞা ও পরিকল্পনা পেশ করেছেন। এ রাষ্ট্রে খোদাভীরু মুসলমানগণ পরিপূর্ণ সুখ-শান্তিতে বসবাস করবেন। আবদুল কাহির আল-বাগদাদী ও আল-মাওয়ার্দী দুনিয়ার সব বিশ্বাসীকে নিয়ে বিরাট আইনগত কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত নিখিল বিশ্বভিত্তিক একটি ইসলামী রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন। এ রাষ্ট্র এক ইমাম দ্বারা পরিচালিত হবে, যাঁর ক্ষমতা কখন কখন স্থানীয় শাসকদের দ্বারা টলায়মান, বিচ্ছিন্ন ও সঙ্কুচিত হলেও অবিভাজ্য বলে গণ্য হবে। আল-ফারাবী ও ইবনে সিনা খোদায়ী রাষ্ট্রের খলিফাকে একাধারে দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রধান বা খলিফা হিসেবে মনে করেছেন। ফারাবীর মতে সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাবয়ব রাষ্ট্রই সত্যিকারভাবে সার্বজনীন রাষ্ট্র।

নানা কারণে অন্যান্য বিশ্বরাষ্ট্র ব্যবস্থার মতই ইসলামী রাষ্ট্র এ আদর্শ কেবল আংশিকভাবেই রূপায়িত করতে পেরেছিল। পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে বিশাল ভূখণ্ডের ওপর ইসলাম প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু বিশ্বঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যান্য প্রয়াসের মতই এ প্রচেষ্টাও যুগপৎ অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের বিরোধিতার ফলে ব্যর্থ

হয়। ইসলামের অভ্যন্তরে ক্রমশঃ ধর্মীয় ও আইনগত সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়ানোর ফলে আদি সংস্থার মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। সব লিখিত ইতিহাসেই দেখা যায়, সমস্ত বিশ্ব-সাম্রাজ্যের মধ্যে এই একইধারা বিদ্যমান ছিল। কারণ, প্রতিটি নতুন বিশ্ব-সাম্রাজ্য তার নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারা, বিধি-ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানাদি পৃথিবীর এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। সভ্যতার ক্রমব্যাপ্তির দিকেও আর একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কারণ, বিশ্ব-সাম্রাজ্য গঠন করতে হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, আদান-প্রদান, ধন-সম্পদ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। সভ্যতার ব্যাপ্তি যত অধিকতরভাবে সুসমঞ্জস হয়ে গড়ে ওঠে, ততই ক্ষমতার বণ্টন ব্যবস্থা ভারসাম্যের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ফলে, সাম্রাজ্য হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ফেডারেশনে পরিণত হয়, নতুবা স্বাধীন রাজনৈতিক সংস্থায় পরিণত হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইনগত বিরোধ ও সুন্নী মযহাবের ঐতিহাসিক ক্রমোন্নতির সমর্থনে কতকগুলো খিলাফত, প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র এবং কতিপয় ক্ষুদ্রতর রাজনৈতিক গোষ্ঠীর জন্ম হল।

যদি বাইরে থেকে কোন স্থায়ী শত্রুর হামলার সম্ভাবনা থাকত কিংবা কোন সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা থাকত, তবে অভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হত। এর ফলে অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে একত্রিত হতে পারত এবং দলাদলিতে না মেতে বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তে পারত।

খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন মুসলিম শক্তি ক্ষমতার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল, তখন বাইজান্টীয় হামলার আশঙ্কা কেবল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এর ফলেই উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে আসেনি। অধিকন্তু, পূর্বাঞ্চলে আব্বাসীয়দের ওপর বাইজান্টীয় চাপের ফলে স্পেনে উমাইয়াগণ আব্বাসীয় আক্রমণ থেকে রেহাই পেল। তাই উমাইয়াগণ পশ্চিমী খৃস্টান রাষ্ট্রপুঞ্জের খণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করার সুযোগ পেলেন। খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো যেমন পাশ্চাত্য (রোমান) ও প্রাচ্য (গোড়া) এ দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রেও বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হল। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি-সাম্যের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থার সৃষ্টি না হলে খৃস্টান রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্র দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একে অপরের সম্মুখীন হত এবং বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের জন্য তাদের মধ্যে সর্বক্ষণ বিরোধ লেগেই থাকত। খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে পূর্ব ও পশ্চিম ইসলামী সাম্রাজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ ও বিভাগীকরণ আরম্ভ হল। ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে পূর্ব 'ইসলামী' সাম্রাজ্য এ অবস্থা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। ক্রুসেড যোদ্ধাগণ দুশো বছর ধরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে এবং বাইরের শক্তির বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু পূর্বদিক থেকে মোঙ্গলদের আক্রমণ অভ্যন্তরীণ গোলযোগকে

আরও মারাত্মক পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। আব্বাসীয়দের পতনের ফলে আরো দুটো মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন হয়। এগুলো হল ঃ মামলুক ও উসমানীয় সাম্রাজ্য। পশ্চিম মুসলিম সাম্রাজ্যও এই একই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

সার্বজনীন মুসলিম রাষ্ট্রব্যবস্থা বা ইসলামকে সার্বজনীন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা অসম্ভব প্রমাণিত হওয়ার ফলে অনিবার্যভাবে পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করা হল ঃ ইসলামী জগৎ ও সমর জগৎ। এখানে স্মরণযোগ্য যে, মুসলিম আইনবিজ্ঞানে এ শ্রেণী বিভাগ ছিল নিতান্তই সাময়িক। কিন্তু গোটা ইসলামী ইতিহাসে এ পার্থক্যবোধ সবসময়েই চলে এসেছে। আইনের দিক থেকে দেখা যায় যে, এ দুই জগতের সম্পর্ক কখনও শান্তিভিত্তিক হয়ে গড়ে ওঠেনি। এক জগৎ সবসময়েই আর একটির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল; কিন্তু এ যুদ্ধকে প্রকৃত যুদ্ধ বলে মনে করা উচিত হবে না। এটা এমন এক বিষয় যা পশ্চিমী আইনের ভাষায় 'অস্বীকৃতি' Non-recognition) বলে আখ্যায়িত হতে পারে। অর্থাৎ মুসলিম আইনের আওতায় আসতে হলে গোড়া থেকেই সত্য ধর্ম ও খাঁটি ইমানের যে সব অত্যাবশ্যকীয় বিধি-বিধান রয়েছে, সমর জগৎ তা গ্রহণ করতে পারে নি। একারণেই সমর জগৎ মুসলিম আইনের আওতায় আসেনি।

তবে এ 'অস্বীকৃতির' ফলে আপোষ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং চুক্তি সম্পাদনে কোন বাধা ছিল না। এ ব্যবস্থা অনেকটা আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের অনুরূপ ছিল। কারণ, এ ব্যবস্থার ফলে চুক্তিবদ্ধ দু'দলের মধ্যে সমতার কোন প্রশ্ন ছিল না কিংবা এসব চুক্তিকে স্থায়ী বলেও মনে করা হত না। আধুনিক আইনবিজ্ঞানে এ অবস্থার মত একটা জিনিস আছে, তা হল অবস্থাভেদে বিদ্রোহের (Insurgency) স্বীকৃতি। এতে যেমন পরে কার্যতঃ বা আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেবার কোন বাধা নেই, তেমনি বিদ্রোহ-কবলিত সরকারের স্বীকৃতিও এর মধ্যে নেই। এর দ্বারা শুধু এইটুকু বোঝানো হয়েছে যে, একটি বিশেষ পরিবেশে কোন রাষ্ট্রে আইন রূপায়িত করার জন্য ক্ষমতাবান সংস্থার প্রয়োজন। অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার সময় (আধুনিক পরিভাষায় 'স্বীকৃতি') ইসলামের সংজ্ঞা অনুযায়ী তাকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। (ইসলামী দৃষ্টিতে স্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে, অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম আইনের প্রয়োগক্ষেত্র সম্প্রসারণ)। এর মধ্যে শুধু এই অনুমোদনটুকু রয়েছে যে, সমর জগৎ যতদিন মুসলিম কর্তৃত্বের বাইরে থাকবে, ততদিন সেখানে এক ক্ষমতাবান সংস্থার প্রয়োজন।

কোন কোন আইনবিদ অবশ্য, বিশেষ করে শাফেয়ীগণ, পৃথিবীর আর একটি তৃতীয় বিভাগের কথা বলেছেন। তা হল ঃ দারুস সুলহ (শান্তির রাজ্য) বা দারুল আহদ (চুক্তির জগৎ)। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে বা যুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের পর যদি অমুসলিম রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায়, তবে তাদের আংশিক স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ অবস্থায় অবশ্য অমুসলিম রাষ্ট্রকে হয় বাৎসরিক শুল্ক বা জিযিয়া দিতে

হবে অথবা তাদের এলাকার অংশ-বিশেষ দিয়ে দিতে হবে। অন্যান্য আইনবিদ, বিশেষ করে হানাফীরা, এ তৃতীয় বিভাগটি মেনে নেননি। তাঁরা বলেছেন যে, যদি কোন রাষ্ট্রের অধিবাসীরা ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং শুল্ক জিযিয়া দিতে রাজী হয়, তবে তারা দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য হবে এবং ইমামকে অবশ্যই তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে হবে। নতুবা এ রাষ্ট্র দারুল হারব বলে বিবেচিত হবে।

মোটামুটি একথা বলা যায় যে, জেহাদের মতই আইনের চোখে শান্তি আইনও ছিল নিছক সাময়িক পন্থা। এর মাধ্যমে যুদ্ধ-বিরতির কালে মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হত। দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক পারস্পরিক মর্যাদা স্বার্থের ভিত্তিতে পরিচালিত হত। কিন্ত এর দ্বারা এ দুই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কারণ, দারুল হারবের অধিবাসীদের ইসলাম কবুল না করা পর্যন্ত কিংবা ইসলাম স্বীকৃত ধর্মের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দারুল হারবের পক্ষে কোন স্বাভাবিক বা স্থায়ী মর্যাদা লাভ করা সম্ভব হত না। অবশ্য কার্যতঃ সক্রিয় জেহাদের নীতি মন্দীভূত হয়ে আসে এবং এ অবস্থা মুসলমানদের গা-সওয়া হয়ে যায়। ক্রমেই তাঁরা শান্তি-আইনের স্থায়িত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে একটি রাষ্ট্রপুঞ্জের আওতায় একীভূত করার আধুনিক প্রবণতার সঙ্গে এ ক্রমবিকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে।

চতুর্দশ অধ্যায়
আইনের আওতা

ব্যক্তি ঃ বিশ্বাসী

মুসলিম আইন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, বিভিন্ন আঞ্চলিক গোষ্ঠীকে নয়। মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করলেও বিশ্বাসীকে মুসলিম আইন মেনে চলতে হবে। আবার অনুরূপভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম জনসাধারণ ঠিক মুসলমানের রীতি অনুযায়ী আইন-কানুন মানতে বাধ্য থাকে না। অবশ্য, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করার ফলে তাদের কতকগুলো কর্তব্য পালন করতেই হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আওতা (Jurisdiction) ব্যক্তির ধর্মের ওপরই নির্ভরশীল। আর ধর্মের ওপর ভিত্তি করেই ব্যক্তি মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন এবং একই সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবেও গণ্য হতে পারেন। সাধারণভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী, কেবল তিনিই মুসলমান বলে পরিচিত হতে পারেন। আইন ও ধর্মের দিক থেকে বিষয়টি অতটা সহজ নয়।

কোন কোন মুসলিম আইনবিদ বলেছেন যে, যেকোন ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদের (সঃ) রিসালাতে বিশ্বাস করবেন এবং তিনি যে সব নীতি প্রচার করেছেন সেগুলো সত্য বলে জানবেন, কেবল তিনিই মুসলমান বলে গণ্য হবেন। এ ঘোষণার পরে তিনি যা-ই বলুন না কেন, তাতে কিছুই আসে যায় না। অন্যান্য আইনবিদরা বলেন যে ব্যক্তি ধর্মের পাঁচটি মূলনীতি পালন করেন বা যিনি কেবলমাত্র কাবা শরীফের দিকে মুখ করে ইবাদাত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তিনিই মুসলমান। ইমাম আবু হানিফা এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি কাবা শরীফের অবস্থান সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন, তবু তিনি মুসলমান বলে গণ্য হবেন। আবদুল কাহির আল-বাগদাদী অবশ্য এসব সংজ্ঞাকে খুব বেশী ব্যাপক ও অপ্রামাণ্য বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, তাঁরা মুসলমান বলে গণ্য হবেন যাঁরা এমন বিশ্বাস করেন যে নিখিল-বিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে এবং স্রষ্টা এক—আর তাঁর পূর্ব অস্থিত্ব, তাঁর গুণাবলী, তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে গভীর আস্থা স্থপন করেন—আর তাঁর নিছক মানবিক ব্যক্তিগত রূপ অস্বীকার করেন। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) রিসালাত, তাঁর সার্বজনীন নবুয়ত, তাঁর আইনের শাশ্বত রূপ, তিনি যা আদেশ করেছেন সব সত্য বলে মনে করা, আল-কোরআনকে আইনগত রীতি-নীতির উৎস-মূল বলে জানা এবং কাবা-শরীফের দিকে মুখ করে ইবাদাত—যিনি এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেন এবং যে ধর্মবিরোধী প্রবণতা তাঁকে অবিশ্বাসের পথে নিয়ে যেতে পারে, তা অনুসরণ করেন না—তিনিই সত্যিকার সুন্নীপন্থী বলে বিবেচিত হবেন।

আল-বাগদাদী বলেন যদি কোন মুসলমান কোন একটি ধর্মবিরোধী মযহাবে বিশ্বাস করেন, তবে ইসলামী রাষ্ট্র তার অধিকার ও কর্তব্য সীমিত করতে বাধ্য। বাগদাদীর মতে তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে সমাহিত করা হবে এবং তিনি যুদ্ধে যোগদান করলে যুদ্ধলব্ধ ক্ষতিপূরণ, শুল্ক ও গানিমার অংশ লাভ করতে পারবেন। মসজিদে ইবাদাত করতেও তাকে বাধা দেয়া যাবে না। কিন্তু তিনি উম্মা বা মুসলিম সমাজ-বহির্ভূত বলে গণ্য হবেন। তার মৃতদেহের দাফনকালে কোন নামাজ পড়া হবে না: তার পেছনে নামাজ ও জানাজা পড়াও সিদ্ধ হবে না। তিনি কোন পশু জবেহ করলে তাও হালাল হবে না। তিনি সুন্নী মহিলাদের বিবাহ করতে পারবেন না। কোন সুন্নী পুরুষও অনুরূপ মতাবলম্বী পরিবারের কোন মহিলাকে বিবাহ করতে পারবেন না।

উল্লেখযোগ্য যে, কোন ব্যক্তিকে মুসলিম সমাজের সদস্য হতে হলে তাঁকে ইমানের পূর্ববর্ণিত নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করতেই হবে। তাই, ইসলাম নাগরিকদের ধর্ম ও জাতীয়তা উভয়েরই প্রতীক। কোন কোন আইনবিদ ও ধর্মবেত্তা ইসলাম ও বাহ্যিক আত্মসমর্পণ এবং ইমান বা আন্তরিক আত্মসমর্পণে (বিশ্বাস) পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কিন্তু নাসাফী প্রমুখ আইনবিদরা এ দুটোকে একই পর্যায়ের বলে মনে করেন।

শিয়াপন্থীগণ ইসলাম ও ইমানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। ইমানের মধ্যে অভ্রান্ত ইমামের প্রতি আনুগত্য (ওয়ালাইয়া) এবং আস্থাবোধও নিহিত রয়েছে। শিয়াদের কাছে ইসলাম সকল বিশ্বাসীর ধর্ম বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া সকলেই 'ইমান'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এরাই খাঁটি ও নিষ্ঠাবান ধর্ম-বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তি ঃ কাফের ও মুরতাদ

ইমানের বিপরীত হচ্ছে কুফর অবিশ্বাস। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে, সে কাফের। যে মুসলমান মুশরিক হয়ে যায় বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) বলা হয়। কাফেরদের শাস্তি-বিধান সম্পর্কে ধর্মবেত্তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, কাফের পরকালে জাহান্নামী হবে এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে। আবার কেউ বলেন যে, এ দুনিয়াতেও তাদের আংশিক শাস্তি ভোগ করতে হবে। আইনবিদ ও ধর্মবেত্তাগণ এ সম্বন্ধে সম্মিলিত অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মুরতাদ হয়ে যাওয়া ইহকালে ও পরকালে আইনতঃ দণ্ডনীয়। সে ব্যক্তি কেবল পরকালের নাজাত থেকেই বঞ্চিত হবে তাই নয়, রাষ্ট্র তার মৃত্যুদণ্ডের বিধান করবে। আল-কোরআনের এ আইন নিম্নলিখিত নির্দেশাবলীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ঃ

১। "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় এবং বিশ্বাসহীন (বেঈমান) অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় তারা হচ্ছে এই শ্রেণীর লোক, যাদের

কাজ এ পৃথিবীতে ও পরকালে বৃথা বলে গণ্য হবে। অগ্নিই হল তাদের আবাসভূমি এবং অনন্তকালে তারা সেখানে বাস করবে।" (২ ঃ ২১৪)

২। "কেন তোমরা মুনাফিকদের বিষয়টি নিয়ে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছ? তাদের তোমরা মিত্র বলে মনে কর না, যে পর্যন্ত তারা তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করবার জন্য হিজরত করে। যদি তারা পুনরায় বিরোধিতা শুরু করে, তবে তাদের ধরার চেষ্টা কর এবং যেখানে পাও, হত্যা কর।" (৪ ঃ ৯০-৯১)

৩। "হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার ধর্ম থেকে দূরে সরে যায়, তবে আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নিজের প্রিয় এমন এক জাতি উত্থিত করবেন, যারা তাঁকে ভালোবাসবে এবং যারা বিশ্বাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে ও অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে ও নিন্দাকারীদের নিন্দাকে ভয় করবে না; এটাই হল আল্লাহর রহমত। যার প্রতি ইচ্ছা, আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। সব কিছুর ওপরই আল্লাহর দখল রয়েছে এবং তিনি সবকিছুই জানেন।" (৫ ঃ ৫৯)

৪। "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাসী হয়—অবশ্য, যাকে জোর করে ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় অথচ যার হৃদয় ঈমানের প্রতি অটল রয়েছে, সে ব্যক্তি ছাড়া—এবং যে তার হৃদয়কে অবিশ্বাসে ডুবিয়ে দেয়, তাদের প্রতি আল্লাহর গযব; তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি।" (১৬ ঃ ১০৮)

যদিও এ চারটি আয়াতের মধ্যে কেবল দ্বিতীয়টিতে ধর্ম পরিত্যাগকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ডের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, তবু সব ভাষ্যকারই এ সম্বন্ধে একমত প্রকাশ করেছেন যে, যে বিশ্বাসী খোলাখুলিভাবে বা গোপনে ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় এবং অবিশ্বাসে অটল থাকে, তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। ইসলাম থেকে যে ব্যক্তি দূরে সরে যায়, তাকে মৃত্যুদণ্ড দান সম্পর্কে হাদিসে আরও সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরম (সঃ) বলেছেন যে, "যে তার ধর্ম পরিত্যাগ করে, তাকে হত্যা করতে হবে।" ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়েও যারা শাস্তি ভোগ করে নি, তাদের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য। কিন্তু হযরত মুহাম্মদের (সঃ) ওফাতের পর রিদ্দার (রিদ্দা—দল ত্যাগ বা পৃথক হওয়া) যুদ্ধ-জয়ের পর এ আইন খুব কঠোরভাবে কার্যকারী করা হয়। ধর্ম পরিত্যাগ করা সম্পর্কে আইনটি খোলাফা-ই-রাশেদীনের ব্যবহার-বিধি দ্বারা সমর্থিত হয়েছে এবং ইজমা বা ঐক্যমত দ্বারা বিধিবদ্ধ রয়েছে। এ আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন মতবিরোধ নেই।

মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া চলবে না। তাকে প্রথমে সাবধান করে দিতে হবে এবং ইসলামে প্রত্যাবর্তন কিংবা মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেয়ার জন্য ৩ দিন সময় দিতে হবে। হানাফী ও হাম্বলী আইনবিদগণ ছাড়া আর সব আইনবিদই ধর্মত্যাগের অপরাধের ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষদের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত করেছেন। ইমাম

আবু হানিফা বলেছেন যে, নারীদের ইসলামে ফিরে আসতে বাধ্য করার জন্য প্রহার থেকে শুরু করে কারাবাস পর্যন্ত শাস্তি দেয়া যেতে পারে। শিশু ও উন্মাদদের হত্যা করা চলবে না, যে পর্যন্ত না উন্মাদ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক না হয়। তরবারীর সাহায্যে মুরতাদকে হত্যা করতে হবে, আগুনে পুড়িয়ে নয়। কারণ, কেবল আল্লাহতালাই আগুনের মাধ্যমে শাস্তি বিধান করেন। ইমামের হুকুম অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। অবশ্য কোন কোন আইনবিদ বিশেষ করে শাফেয়ী আইনবিদগণ মনে করেন যে, দাস যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তবে তার প্রভু তাকে হত্যা করতে পারেন।

যদি একদল মুরতাদ সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে হুমকী প্রদর্শন করে, তবে ইমাম জেহাদ ঘোষণা করে জেহাদের বিধান কার্যকরী করবেন। এ সম্বন্ধে যুদ্ধের আইনে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। (বিভিন্ন প্রকারের জেহাদের অধ্যায় দেখুন)।

মুরতাদ সম্পর্কীয় আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) আমলে কয়েকজন বিশ্বাসীর মুশরিক হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়নি। মক্কাবাসীদের সঙ্গে মহানবীর যে চুক্তি সম্পাদিত হয় (৬৩০ খৃস্টাব্দ), তার মাধ্যমে মক্কার যে সব অধিবাসী চুক্তিটি সম্পন্ন হবার পূর্বে মুসলিম সমাজে যোগ দিয়েছিল, তাদের নিজধর্মে ফিরে যাবার পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। রিদ্দার যুদ্ধের পর মুরতাদদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। কারণ, ইসলাম তখন আরব উপদ্বীপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। তখন থেকেই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুদণ্ডের আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং তার সুষ্ঠু রূপায়ণ ইমামের কর্তব্যরূপে পরিগণিত হয়।

রাষ্ট্রপ্রধান ঃ ইমাম

খিলাফতের প্রশ্নের মত আর কোন প্রশ্ন নিয়ে ইসলামে এতখানি বাকবিতণ্ডা হয় নি। অন্য কোন বিষয়ে আইনের মূলনীতি লংঘনের এমন নজিরও আর বড় একটা পাওয়া যায় না। কারণ, এ বিষয়টি নিয়ে দলগত বিভেদ ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। আইনবিদ ও ধর্মবেত্তাগণ ইমামতের (খিলাফতের) প্রকৃতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজের দলের মতামতকেই বড় করে তুলে ধরেছেন। কিন্তু খিলাফতের ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে কেউ বেশী আলোচনা করেন নি।

ইসলামী আইনবিজ্ঞানে ইমাম রাষ্ট্রের প্রধান নন। স্বয়ং আল্লাহই রাষ্ট্রের মালিক। কার্যতঃ কিন্তু ইমামই সর্বক্ষেত্রে প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কার্যপরিচালনা করেন। নির্বাচন বা মনোনয়ন, যে ভিত্তিতেই তাঁকে নিয়োগ করা হোক না কেন, তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রে আইনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখা এবং বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে সমগ্র রাষ্ট্রের

মুখপাত্র হিসেবে কাজ করা। ইমামতের প্রকৃতি ও কার্যক্রম আসলে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। কাজেই এ বিষয়টা এখানে ততটুকুই আলোচনা করা যাক, যতটুকু বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনায় প্রয়োজন হয়।

ইমামের কর্তব্য হল জেহাদের মারফত বিশ্বব্যাপী আল্লাহর বাণীর সার্বভৌমত্ব কায়েম করে ইসলামের মূল উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করা। যুদ্ধ ও শান্তিকাল উভয় সময়েই ইমাম এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং বিশ্বাসীদের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের সম্পর্ক নিরূপণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন বাস্তবায়িত করেন। যুদ্ধ পরিচালনার হুকুম তিনিই জারী করেন, নব-বিজিত দেশে আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করেন এবং আইন অমান্য করলে শাস্তি-বিধান করেন।

জেহাদ কখন চালিয়ে যেতে হবে বা কখন তা স্থগিত বা বন্ধ রাখতে হবে এসব ব্যাপারে তিনিই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শত্রুপক্ষের দাবী স্বীকার করে নিয়ে কখন তাদের সঙ্গে সন্ধি বা শান্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সমঝোতায় আসতে হবে, তা তিনিই স্থির করেন।

ইমামের ক্ষমতা ব্যাপক হলেও তারও সীমা আছে। আইনের আওতার মধ্যে থেকেই তাঁকে এ ক্ষমতা পরিচালনা করতে হবে; অর্থাৎ দেখতে হবে, যাতে সুষ্ঠুরূপে আইনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য সাধনের ওপর দৃষ্টি রেখে যদি ইমাম তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তবেই তিনি মুসলমানদের আনুগত্য দাবী করতে পারেন নতুবা তাঁকে ইমামের পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। তবে কি করে তাঁকে অপসারণ করা যাবে, সেটাই সমস্যা। অপসারণ করা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

বৈদেশিক সম্পর্ক নিরূপণের ব্যাপারে ইমাম তাঁর ক্ষমতা সমরাঙ্গণে যুদ্ধরত সেনাপতিদের বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ওপর ন্যস্ত করতে পারেন। অনেক সময়ে এঁদেরকে আপোষ-আলোচনা চালানো, জেহাদ পরিচালনা এবং যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি বণ্টনের পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হত। কিন্তু যে কোন বিষয়ে ইমামের অনুমোদন করার বিশেষ ক্ষমতা (Veto power) রয়েছে। এ ক্ষমতা বলে তিনি ইচ্ছা করলে কোন চুক্তি অনুমোদন না-ও করতে পারেন এবং যে গৃহীত কর্মপন্থা বা ব্যবস্থা মুসলিম স্বার্থবিরোধী, তা' বাতিল করে দিতে পারেন। ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী কাজের জন্য তিনি তাঁর প্রতিনিধিদের (শাসনকর্তাদের) শাস্তি-বিধানও করতে পারেন।

পৃথিবীতে ইমাম আল্লাহর খলিফা। আল্লাহর খলিফা হিসেবে তাঁর কাজ হল আল্লাহর আইন কার্যে পরিণত করা। খারেজী দল ভিন্ন আর সব মাযহাব অনুযায়ী স্বাভাবিক এবং নীতিগতভাবে ইমামের শাসন অতীব প্রয়োজনীয়। ইমাম যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন, কার্যপরিচালনায় অসমর্থ হয়ে পড়েন বা ইমামতের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন তবে নতুন ইমাম নিযুক্ত করা মুসলিম সমাজের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হয়। কিন্তু ইমাম যদি শত্রুর হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়, সে ক্ষেত্রে তিনিই আইনগত ইমাম বলে গণ্য হবেন। মুসলিম সমাজ অবশ্যই যুদ্ধ বা কূটনীতির মারফত তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

দারুল ইসলামের বিভিন্ন অংশে একাধিক ইমাম নিয়োগের ফলে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কোন অমুসলিম শাসক কর্তৃক মুসলিম ইমামের স্বীকৃতি তখন খুব বড় প্রশ্ন ছিল না। কারণ, অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রদত্ত স্বীকৃতি মুসলিম আইনে বৈধ্য বলে গণ্য হয় না। এক মুসলিম ইমামের সঙ্গে অপর মুসলিম ইমামের আইনগত সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারেই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হয়। সাধারণ মুসলিম আইন-বিজ্ঞানে গতানুগতিকভাবে (Classical Theory) অবশ্য এ নীতি পেশ করা হয়েছে যে, যেহেতু আল্লাহ এক এবং আইনের বিধানও একটি বৈ দু'টি নয়, কাজেই শাসকও একজন হতে বাধ্য। আল-বাকিল্লানী ইবনে রুশদ ও ইবনে খালদুন প্রমুখ আইনবিদ এ নীতি পেশ করেছেন যে, যদি দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ সুবিস্তীর্ণ হয় এবং কোন কোন এলাকা মাঝপথে সমুদ্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, তবে দুই বা ততোধিক ইমাম নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু একাধিক খলিফার (ইমামের) স্বপক্ষে আর কোন যুক্তি ইবনে রুশদ ও ইবনে খালদুন দেখাতে পারেন নি। ইমামদের পারস্পরিক আইনগত সম্পর্কও তাঁরা ব্যাখা করতে পারেন নি। ফলে একাধিক ইমামতের আইনগত ভিত্তি শিথিলই রয়ে গেছে। আর এর দরুন অনেক অননুমোদিত রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে। মুসলিম আইনবিদগণের বাস্তববিমুখিতাই এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এজন্যই 'অস্বীকৃতি' মুসলিম আইনে বড় কথা হয়ে রইল। বোধহয় একথা বলা যেতে পারে যে, আব্বাসীয় খিলাফতের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খিলাফতের অস্তিত্বকে ইসলামী জগতের পশ্চিমাঞ্চলের আইনবিদগণ তদানীন্তন পূর্বাঞ্চলের আইনবিদদের চাইতে অধিকতর আইনগত সমর্থন জানিয়েছেন। ইমামের প্রজা বা বিদেশী হিসাবে অমুসলিমদের ওপর আইন প্রয়োগ করার বিষয়টি পরবর্তী দুই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল ঃ দারুল ইসলাম

দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হলেও এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পেশ করা হয় নি। আমরা জানি যে, ইসলামী আইনে ব্যক্তিকে মুসলিম সমাজের সদস্য হিসেবেই এ সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়; যে ভূখণ্ডে তিনি বাস করেন, ইসলামী আইন তার সঙ্গে ব্যক্তিকে সংযুক্ত করে না। এ সত্ত্বেও মুসলমানদের একটি অঞ্চলে বাস করতেই হয়। কাজেই তারই আলোকে আইন-বিধি রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। এ আইনে মুসলিম সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রের মর্যাদা নির্ণীত হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মর্যাদা নির্ধারিত হয় নি। আইনের দৃষ্টিতে কোন এলাকার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ইসলামের প্রতি সেখানকার অধিবাসীদের প্রকৃত আনুগত্যের ওপরই নির্ভর করে, ইসলামের প্রতি আনুগত্যের নিছক ঘোষণার ওপর নির্ভর করে না। তাই যে অঞ্চল বা রাষ্ট্রের অধিবাসীরা মুসলিম আইন পালন করেন, তাকে দারুল ইসলাম (মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল) বা রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা হয়।

দারুল ইসলামের সংজ্ঞাটি যে খুব ব্যাপক, তাতে সন্দেহ নেই। দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীকে কিংবা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যককে

যথাযথভাবে আইনের বিধান পালন করতে হবে, না এতে অন্য কোন শর্ত রয়েছে তা এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আবদুল কাহির আল-বাগদাদী বলেন যে, যে অঞ্চলের অধিবাসীরা দ্বিধাহীন চিত্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং যেখানে জিম্মীদের ওপর মুসলিম রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নামই দারুল ইসলাম। আবার অনেক আইনবিদ বলেন যে, কোন মুসলিম ভূখণ্ড দারুল ইসলাম বলে পরিগণিত হবে, যখন বিশ্বাসীগণ ধর্মীয় কর্তব্য স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবেন।

দারুল ইসলামের আর একটি মাপকাঠি হল এই যে, এখানে শুক্রবারে জুমার নামাজ এবং ঈদের উৎসব প্রতিপালিত হওয়া চাই। আইনবিদগণ আরও বলেন যে, যেখানে খলিফার প্রতিনিধিরূপে ওয়ালী অবস্থান করেন কেবল সেখানেই এ নামাজ পড়া যেতে পারে। ওয়ালীর কর্তৃত্বাধীনেই কেবল নামাজ সিদ্ধ বলে গণ্য হয়। আইনের সুপরিচালনার জন্য এখানে একজন বিচারকও (কাজী) থাকা চাই।

দারুল ইসলামের ভূখণ্ড (আল-ওয়াতান) শক্তিবলে বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে লাভ করা যেতে পারে। প্রত্যেক শুক্রবার মসজিদের ইমামের মিম্বরে একটা চিহ্ন পেশ করা হয়। এ চিহ্নটি যদি তরবারী হয় তবে বুঝতে হবে যে, এ নগর বা দেশ শক্তিবলে দখল করা হয়েছে। যদি চিহ্ন হিসেবে কাঠের তৈরী লাঠি রাখা হয়, তবে বুঝতে হবে এ দেশ বা শহর শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্জিত হয়েছে। কায়রো নগরী শান্তিপূর্ণ উপায়ে দখল করা হয়েছে। দামেস্ক সম্পর্কে অবশ্য মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, নগরের এক অর্ধাংশ শক্তিবলে ও অপর অংশ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দখল করা হয়। সুতরাং, একটি কাঠের তরবারী দিয়ে দু'টি চিহ্ন একত্রিত করা হয়েছে। মদিনার অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করে; তাই এখানকার মিম্বরে কোন চিহ্নই স্থান পায়নি।

কিন্তু যদি স্বাধীনভাবে নামাজ পড়া সম্ভব না হয়, তবে সে মুসলিম ভূখণ্ডে আর দারুল ইসলাম বলে গণ্য হবে না। হানাফী আইনবিদগণ দারুল ইসলামের দারুল হারবে পরিণত হবার তিনটি উপায় নির্দেশ করেছেন ঃ

প্রথমতঃ যদি অবিশ্বাসীদের আইন-ব্যবস্থা কার্যকরী হয়;

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন ভূখণ্ড অমুসলিম অঞ্চল দ্বারা দারুল ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়;

তৃতীয়তঃ, যদি এখানে মুসলমান ও জিম্মীদের পক্ষে নিরাপদে বসাবস করা সম্ভব না হয়।

কোন কোন হানাফী আইনবিদ বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, শরিয়তের জায়গায় যে মুহূর্তে অবিশ্বাসীদের আইন-বিধি কার্যকরী হয়, তখনই সে অঞ্চল আর দারুল ইসলামের অংশ বলে গণ্য হতে পারে না। ফলে, বিশ্বাসীগণের পক্ষে এখানে বাস করা যদি কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, তবে তাদের দারুল ইসলামে হিজরত করতেই হবে। অবশ্য মুসলমানরা যদি দেখেন যে, অমুসলিমদের আইন কার্যকরী করা সত্ত্বেও তারা নিরাপদে বসবাস করতে পারছেন এবং নামাজ পড়তে কোন বাধা নেই তবে আইনের চোখে তা মুসলিম অঞ্চল বলে গণ্য হবে। এর ফলে হয়ত মুসলমানেরা

এখানে আবার ফিরে আসতেও পারেন; অথবা যারা রয়ে গেলেন, তাঁরা অমুসলিমদের ইসলামে আহ্বান জানাবার সুযোগ পেলেন।

বৈধভাবে মুসলিম আইন প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ওপরে নির্ভর করেই মুসলিম আইনবিদগণ কোন রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হিসেবে গণ্য করেছেন। যদি গুটিকয়েক বিশ্বাসীও মুসলিম আইন মেনে চলেন, তবে এ স্থানে আইনের চোখে মুসলিম অঞ্চল বলে সাব্যস্ত হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে নেতৃস্থানীয় মুসলিম সুধীবৃন্দ পাক-ভারত উপমহাদেশের ব্যাপারে এ ব্যাখ্যাকেই সমর্থন জানিয়েছেন। যদিও উপমহাদেশটি ইংল্যাণ্ডের অধীনে ছিল, তবুও তাকে মুসলিম অঞ্চল বলে গণ্য করা হয়; কারণ, শাসক মুসলমান না হলেও চলে যদি শরিয়তের অধিংকাংশ বিধান রূপায়িত করা হয়। কোন দেশে কাজী অমুসলিম শাসক কর্তৃক নিযুক্ত হলেও (মুসলমানদের সম্মতি নিয়েই তাঁকে নিযুক্ত করা হত) তিনি মুসলমান হিসেবে যদি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন—যাতে নামাজ ঠিকমত আদায় করা হয় ও শরিয়তের বিধান সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়—তবে সে দেশ মুসলিম দেশ বলে গণ্য হবে।

মুসলিম অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ

মুসলিম আইনবিদগণ ইসলামী ভূখণ্ডকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নানা বিভাগ ও উপ-বিভাগে বিভক্ত করেছেন। কোন কোন লেখক গোষ্ঠীগত বা উপজাতীয় বিভাগের ওপর জোর দিয়েছেন। আবার কেউ বা রাজবংশের ওপর ভিত্তি করে বিভাগ নির্ণয় করেন (একটি অঞ্চলের এক এক রাজবংশের রাজত্বের ওপর ভিত্তি করে এ বিভাগ নিরূপণ করা হয়েছে, যেমন উত্তর আফ্রিকায় আগলাবিগণ, মিসরে ফাতেমিগণ ও ইরানে বুয়াহিদগণ)। অন্যান্য লেখক বিশেষ করে ভূগোল-বিজ্ঞানীগণ আঞ্চলিক ভিত্তিতেই বিভাগ নির্ধারণ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, আল মোকাদ্দসী দারুল ইসলামকে আরব ও আজমে (ইরান) বিভক্ত করেছেন। আজমকে আবার আটটি অঞ্চলে এবং আরবকে ছটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। 'হুদুদুল আলমে'র লেখক যে কেবল অমুসলিম অঞ্চল নিয়েই লিখেছেন তা নয়, অমুসলিম-অধ্যুষিত ভূখণ্ডের ওপরও আলোকপাত করেছেন। তিনি পৃথিবীকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ এশিয়া, ইউরোপ ও লিবিয়া। এ তিনভাগকে আবার একান্নভাগে ভাগ করা হয়েছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে ইসলামী অঞ্চলকেও বিভক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু মুসলিম আইনে এসব শ্রেণীবিভাগের বৈধতা স্বীকৃত হয় নি। কারণ, এ আইন-বিধানে মুসলিম কর্তৃত্বের বিভাগ বা গোষ্ঠীগত এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয়নি। কেবলমাত্র একটি উম্মা (উম্মতে মোহাম্মদী) বা জাতির অস্তিত্বই এ আইন ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছে। যিনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করেন, তিনি যে বংশের শাসক দ্বারাই শাসিত হোন না কেন এবং দারুল ইসলামের যে অঞ্চলের অধিবাসীই হোন না কেন, তিনি এই উম্মতের সদস্য বলেই

গণ্য হবেন। মুসলমানরা নির্বিবাদে এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারতেন। এ ব্যাপারে আনুগত্যের কোন প্রশ্নই উঠত না। কারণ, সব মুসলিম শাসককে নিজ নিজ রাষ্ট্রে একই আইন-বিধি রূপায়িত করতে হয় এবং একই ধর্ম পালন করতে হয়। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (মৃত্যু ১৪০৬ খৃস্টাব্দে), মরক্কী দার্শনিক ইবনুল আরাবী (মৃত্যু ১২৪০ খৃস্টাব্দ), ইবনে জুবাইর (মৃত্যু ঃ ১২২৭ খৃস্টাব্দ) ও ইবনে বতুতা প্রমুখ পরিব্রাজক ও প্রখ্যাত মুসলমান বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং স্বচ্ছন্দে তাঁদের বাসস্থান পরিবর্তন করেন। এ থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম জগতে সাংস্কৃতিক ঐক্য (রাজনৈতিক ক্ষমতা-বিভাগ ও মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর ভৌগোলিক পার্থক্য সত্ত্বেও) স্থায়ী ঐক্য-বন্ধনীর কাজ করে।

আইন ও ধর্মবেত্তাগণ দারুল ইসলামের কোন শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করেন নি, কিন্তু স্থানের পবিত্রতা ও ধর্মীয় তাৎপর্যের দিক থেকে কোন কোন অঞ্চলের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। আল-মাওয়ার্দী দারুল ইসলামকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ 'হারাম,' হেজাজ ও অবশিষ্ট মুসলিম ভূখণ্ড। শরিয়তের এ তিন বিভাগের প্রত্যেকটির ওপর কতকগুলো নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শুল্ক ধার্য, অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার ও ভূমির মালিকানা—এ সব বিষয় এ বিধানগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নিরাপদ স্থানকে 'হারাম' বলে। কোন কোন আইনবিদের মতে এর মধ্যে মক্কা ও এর শহরতলীকে ধরতে হবে। অন্যান্যদের মতে মক্কা ও মদিনা এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। শেষের মতটাই নির্ভুল বলে সাব্যস্ত হয়েছে। পরবর্তী যুগের আইনবিদগণ দুটো 'হারাম' বা নিরাপদ স্থানের উল্লেখ করেছেন (আল-হারামাইন আশ-শারিফাইন) মক্কা ও মদিনা। এ নগরী দুটির হেফাজত ও সংরক্ষণ খলিফার বিশেষ কর্তব্য বলে গণ্য করা হয়। হাদিসের মতে এ দুটো নগরী পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থানে অবস্থিত রয়েছে।

'হারাম' অঞ্চলে কেবল মুসলমানরাই গমনাগমন ও বসবাস করতে পারেন। কোন অমুসলিমকেই—তা সে কেতাবীই হোক আর মুশরিকই হোক—এসব নগরীতে বসবাস করতে দেয়া হয় না; কিংবা এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে দেয়া হয় না। ইমাম আবু হানিফা অবশ্য কেতাবীদের এ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গমনাগমন করার অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু বসবাস করতে অনুমতি দেন নি। কিন্তু অন্যান্য আইনবিগণ এ ব্যতিক্রমটুকুও মেনে নেন নি। সাধারণতঃ হারামের বাসিন্দাগণকে যুদ্ধে যোগ দিতে হয় না। কারণ, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ অঞ্চলে রক্তপাত করা নিষিদ্ধ করে গেছেন। কোন কোন আইনবিদের মতে মক্কার অধিবাসীগণ যদি বিদ্রোহও করেন, তবু তাদের শাস্তি দেয়া চলবে না। কিন্তু অধিকাংশ আইনবিদ ইমাম কর্তৃক এসব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা অনুমোদন করেছেন। হারাম অঞ্চলের গাছপালা ও জীবজন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। তাই, এখানকার গাছপালা কেটে ফেলা বা জীবজন্তুকে ধ্বংস বা হত্যা করা অনুমোদন করা হয় নি। কিন্তু গৃহপালিত পশু হত্যা ও কৃষিজাত দ্রব্য কর্তন করা চলবে। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য এ নিয়মগুলো সব সময়ে প্রতিপালিত হয় নি। তবু, এ নিয়মগুলোর মধ্যে ইসলামের আদি আবাসভূমির প্রতি মুসলমানদের গভীর শ্রদ্ধা প্রতিভাত হয়েছে।

মুসলিম অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে হেজাযের স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে। মুসলমানদের দৃষ্টিতে হারাম অঞ্চলের পরেই হেজাযের স্থান। এ অঞ্চলে অমুসলিমগণ পরিভ্রমণ করতে পারেন। কিন্তু এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার তাদের নেই। হাদিসে বর্ণিত হযরত মুহাম্মদের (সঃ) একটি বাণীই এ নিয়মের ভিত্তি রচনা করেছে ঃ "আরব উপদ্বীপ থেকে অবিশ্বাসীদের বিতাড়িত কর।" কোন কোন আইনবিদ সংকীর্ণভাবে এ নীতির ব্যাখ্যা করেছেন এবং আরব উপদ্বীপ বলতে শুধু মক্কা ও মদিনাকেই বুঝেছেন। কেউ কেউ হেজাযকেও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার কেউ বা গোটা আরব উপদ্বীপকে এর মধ্যে ধরেছেন। যদি কোন অমুসলিম হেজায পরিভ্রমণকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে তার মৃতদেহ এখান থেকে অপসারণ করে এ অঞ্চলের বাইরে কবরস্থ করতে হবে। কারণ, এ অঞ্চলে কবর দেয়ার অর্থ স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দেয়া। কেননা, এ অঞ্চলে অমুসলিমের স্থায়ী বসবাস আইন-বিধানে অনুমোদিত হয় নি।

পরিশেষে বলা যায় যে, হেজাযকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখার কারণ এই যে, এই অঞ্চলেই রাসূলে আকরম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নবুয়ত লাভ করেন, ইসলাম প্রচার করেন, আর তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময় এখানেই অতিবাহিত করেন। রাসূলের (সঃ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সব কিছুই হেজাযেই ছিল। তাঁর বহিরাচ্ছাদন (আলখেল্লা) ও পোশাক অবশ্য হেজাযের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হযরতের খফিলাগণ খিলাফতে অধিষ্ঠিত হবার সময়ে এগুলোকে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই রক্ষা করে এসেছেন।

তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে দারুল ইসলামের অবশিষ্ট অংশ। আরব উপদ্বীপের বাইরে যে সব অঞ্চল মুসলানদের দখলে এসেছিল এগুলো এরই অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম আইনে এ বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করা হত না। কেতাবীগণ এ অঞ্চলে জিম্মী হিসেবে বসবাস করতে পারতেন। আমান লাভ করে হারবীগণও এ অঞ্চল সফর করার অনুমতি লাভ করতেন। জিযিয়া কর প্রদান সাপেক্ষে মুশরিকদেরও এখানে বসবাস করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত না। এ অঞ্চলকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ

(ক) 'উশর' অঞ্চল ঃ যে অঞ্চলের আদি মালিক বা বাসিন্দাগণ মুসলমান হয়েছে।

(খ) দখলীকৃত অঞ্চল (১) ঃ যা' মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়; এ অঞ্চলও উশর ভূমি নামে অভিহিত।

(গ) দখলীকৃত অঞ্চল (২) ঃ যার অধিকার সাবেক বাসিন্দাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়; কিন্তু এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের রাজস্ব বা খারাজ দিতে হত।

(ঘ) মাওয়াত বা পতিত জমি ঃ মুসলমানগণ কর্তৃক সংস্কারের ফলে যে অঞ্চল উশর ভূমিতে রূপান্তরিত হয়।

বিভিন্ন পর্যায়ের ভূমিব্যবস্থা সমন্বিত অঞ্চলের শাসন এবং আইনের বিধান অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনীতির আওতায় পড়ে, কাজেই এখানে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

পঞ্চদশ অধ্যায়
মুসলিম রাষ্ট্রে বিদেশী ঃ হারবী মুস্তামিনগণ

বিদেশী নাগরিক ও মুসলিম আইন

মুসলিম আইনে কেবল মুসলমানেরাই পূর্ণ আইনগত অধিকার ভোগ করলেও অমুসলিমগণও মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করার অনুমতি পেলে মুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কতকগুলো আইনগত অধিকার ভোগ করতে পারেন। মুসলিম আইনে মুসলমানই পূর্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার ভোগ করেন; মুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর নির্ভর করেই আর সবাই বিভিন্ন প্রকার অধিকার লাভ করেন। আইনের চোখে যারা পূর্ণাঙ্গ অধিকার ভোগ করে না, তারা হচ্ছে হারবী, মুস্তামিন ও জিম্মী। জিম্মীদের সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। তাই এখানে আর সে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

হারবী

মূলতঃ যে দেশের লোকই হোক না কেন, দারুল হারবে অবস্থানকারীদেরই হারবী বলা হয়। এদের মধ্যে কিতাবী ও মুশরিক উভয়ই থাকতে পারেন; যেহেতু আইনের দৃষ্টিতে দারুল হারবের সঙ্গে দারুল ইসলামের যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান থাকে, সুতরাং এ-দিক থেকে বিদেশী হারবীদের সঙ্গেও মুসলমানদের যুদ্ধগত সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। মুশরিক হারবী মুসলমানদের মোকাবেলা করলেই আল-কোরআনের এ নির্দেশের (৯ ঃ ৫) আওতায় এসে পড়বে ঃ "মুশরিকদের যেখানে পাও, মেরে ফেল।" কেতাবী হারবীর জীবনরক্ষা করা যেতে পারে; কিন্তু তাকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে কয়েদ করা চলবে এবং দাসেও পরিণত করা যেতে পারে। অবশ্য বিশেষ অনুমতি বা আমান (নিরাপত্তার সনদ) নিয়ে হারবী নির্বিবাদে দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে পারেন।

এ সনদ বলে তিনি তার পরিবার ও ধন-সম্পদ নিয়ে কিছুদিনের জন্য দারুল ইসলামে পরিভ্রমণ বা বসবাস করতে পারেন।

আমান

আমানকে নিরাপত্তাচুক্তি বা সনদ বলা যেতে পারে। এর ফলে হারবী দারুল ইসলামে মুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিরাপত্তা বা রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার লাভ করে। দারুল ইসলামে বসবাস করার সময় মুসলমানদের সঙ্গে তার যুদ্ধাবস্থার অবসান

হয় এবং হারবী তখন "মুস্তামিন" বা নিরাপদ ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করেন। আমানের মেয়াদ এক বছরের কম হতে হবে। এক বছরের অধিক সময়ের জন্য আমান প্রার্থী হলে তাকে জিযিয়া দিতে হবে এবং তিনি জিম্মা পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবেন।। এক বছরের অধিক সময়ের জন্য আমান প্রার্থী হলে।

অস্থায়ীভাবে যুদ্ধ-বিরতির (মুহা'দানা অথবা মুও'য়াদা) ফলে ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি কিংবা ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসী মুসলিমগণ আমান প্রদান করতে পারেন। প্রথমটির নাম সরকারী আমান। আর দ্বিতীয়টিকে বেসরকারী আমান বলা যেতে পারে।

সরকারী আমান ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক সাধারণতঃ একটি ভূখণ্ডের সমগ্র অধিবাসীকে বা একটি নগরের অধিবাসীকে বা জনকয়েক হারবীকে প্রদান করা হয়। শান্তিচুক্তিতে প্রায়ই এই ধরনের আমানের প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকে। এর শর্তানুসারে হারবীগণ নিরাপদভাবে চলাফেরা করতে পারেন। সেনাপতি আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য এক বা ততোধিক হারবীকে আমন প্রদান করতে পারেন। আমানের আওতায় থাকাকালে হারবীগণ মুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে রক্ষণাবেক্ষণ দাবী করতে পারেন। আমানের উদ্দেশ্য সাধিত হবার পর মুস্তামিনকে তার নিজের দেশে নিরাপদভাবে পৌঁছে দেয়া হয়।

হারবীর অনুরোধক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক যেকোন মুসলিম হারবীকে বেসরকারী পর্যায়ে আমান প্রদান করতে পারেন। এ আমান মুক্ত, দাস বা নর ও নারী সব মুসলিমই দিতে পারেন। বিশ্বাসী মুসলমানের আমান-প্রদানের ক্ষমতা সম্পর্কে অবশ্য আইনবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। দাস এবং নারী ও পুরুষকে আমান প্রদান করার অধিকার মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী আইনবেত্তাগণ অনুমোদন করেছেন। জেহাদী না হলে কিংবা প্রভু কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত না হলে দাসকে আমান প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করতে হানাফী আইনবিদগণ অস্বীকার করেছেন। আউযায়ী খারিজীদের পর্যন্ত আমানের অধিকার প্রদান করেছেন। নীতিগতভাবে শিশু ও উন্মাদকে সাধারণতঃ আমান প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয় নি। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর মতে বয়স্ক হলেই কেবল শিশুগণ আমান প্রদানের অধিকার লাভ করবে। আউযায়ী দশ বছর বয়স্ক শিশুকে আমান প্রদানের অধিকার দান করেছেন। সব মতাদর্শের আইনবিদগণই নীতির দিক থেকে জিম্মীদের আমান প্রদানের ক্ষমতা অস্বীকার করেছেন।

আমান প্রদানের পদ্ধতি খুবই সহজ।' এ নিয়ে আইনবিদদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। যে ভাষাভাষীই হোক না কেন, হারবীর পক্ষ থেকে আমান লাভের মনোভাব জানবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতিসূচক একটি বাক্য বা ইশারাই আমান প্রদানের

পক্ষে যথেষ্ট। আমান প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে সামান্য একটি ইঙ্গিত দান বা অভিবাদনই হারবীকে নিরাপত্তার অধিকার লাভের নিশ্চয়তা দান করে। যদি কোন বিশ্বাসী আমান না দেয়ার সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু তার ইঙ্গিতে হারবীগণ আমান লাভ করেছেন বলে মনে করে থাকেন, তবে তা বৈধ আমান বলে গণ্য হবে।

এ প্রসঙ্গে আল-হারমুযানের ঘটনাটি মনে করা যেতে পারে। এখানে আমান প্রদানের কোন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ছলে বা কৌশলে না হলেও অন্ততঃপক্ষে হারমুযান আমান পেয়ে গিয়েছে, এ কথাই অপ্রত্যক্ষভাবে ধরে নেয়া হয়েছিল। আমান না নিয়েই যদি কোন হারবী দারুল ইসলামে প্রবেশ করে এবং পরে আমান লাভ করতে না পারে, তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। ইমাম শাফেয়ী এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তাকে চার মাসের সময় দেয়া উচিত। চার মাস পর তাকে হয় দারুল ইসলাম পরিত্যাগ করে যেতে হবে (তাকে নিরাপদে সীমান্ত এলাকায় পৌছে দেয়া হবে), নতুবা জিযিয়া প্রদান করে জিম্মী পর্যায়ভুক্ত হতে হবে। অন্যান্য আইনবিদ বলেছেন যে, এই হারবীকে বহিস্কৃত করা উচিত। অবশ্য দারুল হারবে পৌছা পর্যন্ত অবশ্যই তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোন হারবী কার্যোপলক্ষে ইমামের কাছে কোন বার্তা বহন করে নিয়ে আসে, তবে তাকে আমান ব্যতিরেকে ইমামের কাছে যেতে দেয়া হত। কারণ, তখন সে কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা (immunity) লাভের অধিকারী। কিন্তু ইমাম যদি বুঝতে পারেন যে, দূতের কোন পরিচয়-পত্র নেই কিংবা সে আদৌ কোন বাণী নিয়ে আসে নি, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দান বৈধ হবে।

ভুলক্রমে বা জাহাজডুবীর ফলে হারবী দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে পারে এবং আমান ব্যতিরেকে মুসলমানদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে। অধিকাংশ আইনবিদ বলেন যে, এক্ষেত্রে ইমাম স্বেচ্ছায় হারবীকে মুক্ত করে দিতে পারেন বা অবস্থা বিবেচনা করে অবিলম্বে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। তিনি ক্ষতিপূরণ নিয়েও তাকে মুক্ত করতে পারেন।

মুস্তামিনদের অধিকার ও কর্তব্য

কোন হারবী যখন মুস্তামিন হিসেবে গণ্য হয়, তখন তার সঙ্গে তার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে আসতে অনুমতি দেয়া হয়। হেজাযের পবিত্র নগরগুলো ছাড়া দারুল ইসলামের সব শহরেই সে পরিভ্রমণ করতে পারবে। জিম্মীর মর্যাদা লাভ করে জিযিয়া প্রদান করলে সে দারুল ইসলামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। সে জিম্মী মহিলাকেও বিবাহ করতে পারে এবং তাকে দারুল হারবে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু

হারবী যদি মহিলা হয় এবং কোন জিম্মীকে বিবাহ করে, তবে তার স্বামীকে সে দারুল হারবে নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ, এতে শত্রুপক্ষ দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পাবে। নিরাপদভাবে চলাফেরা করার অধিকার ভোগকালে মুস্তামিন আইনের আওতায় ব্যবসায়-বাণিজ্যও পরিচালনা করতে পারবে।

আবার মুস্তামিনকে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদিকে সম্মানের চক্ষে দেখতে হবে এবং সে এমন কিছু বলবে না বা করবে না যাতে ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পেতে পারে। তার কার্যক্রমে ইসলামের স্বার্থ যাতে বিপন্ন না হয়, সে সম্পর্কে তাকে সতর্ক থাকতে হবে। সে যদি মুস্তামিনের ছদ্মবেশে দারুল ইসলামে গুপ্তচর বৃত্তির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশ করে থাকে, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দান বিধিসম্মত। সামরিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র কিংবা দাস-দাসী বা অন্য কোন রকমের হাতিয়ার কিনবার অধিকার তার নেই। এগুলো তার পক্ষে নিষিদ্ধ পণ্য (contraband) হিসেবে গণ্য হবে; কারণ, এর ফলে দারুল হারব দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে। নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা অবৈধ। এ ধরনের দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে মুস্তামিনকে তার টাকা দিয়ে দিতে হবে এবং মুস্তামিনও বিক্রেতাকে অস্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দেবে। অস্ত্রশস্ত্রের বেচাকেনা যদি বন্ধ নাও হয়ে থাকে, তবু কোনমতেই হারবীকে এসব অস্ত্রশস্ত্র দারুল হারবে নিয়ে যেতে দেয়া চলতে পারে না। সুদভিত্তিক চুক্তিও নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে।

মুস্তামিন যদি আইন ভঙ্গ করে বা কোন অপরাধ করে, তবু তার আমান নষ্ট হবে না। কিন্তু তাকে সমুচিত শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইমাম শাফেয়ী দু'রকমের নিয়ম লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করেছেন। যদি সে সম্মান ও আদব-কায়দা বিষয়ক আচার লঙ্ঘন করে, তবে তার ফলে তার আমানের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে, একথা বলে তাকে সাবধান করে দিতে হবে। আবার সে যদি দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিষয়ক কোন আইন ভংগ করে, তবে তাকে বিশ্বাসী বা জিম্মীদের মতই সমানভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ বলেছেন যে, মুস্তামিনকে শাস্তি দেয়া চলবে না; সে ব্যভিচার করলেও তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তির বিধান নেই; তবে সে যদি চুরি করে বা ডাকাতি করে, তবে সে অপহৃত জিনিস তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। কিন্তু সে যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করে বা তার হাত কেটে ফেলে, তবে তাকে হত্যা করা বা তার হাত কেটে ফেলা বৈধ। যদি দুই বা ততোধিক মুস্তামিন মুসলিম বিচারকের কাছে হাজির হয়ে বিচারপ্রার্থী হয় ও শরিয়তের বিধান দ্বারা পরিচালিত হতে

চায়, তবে তাঁরা সে বিচার পরিচালনা করতে পারবেন। কিন্তু যদি কোন মুসলমান মুস্তামিনকে আক্রমণ করে, তবে মুসলমানটি ইমাম ও তাঁর প্রতিনিধিদের (শাসনকর্তা) কাছে শাস্তি ভোগ করবে। মুসলমানরাও শরিয়ত বিরুদ্ধ ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হবার বা অবৈধভাবে জিনিসপত্র খরিদ করার অধিকার পাবে না।

আমানের মেয়াদের সমাপ্তি

আমানের মেয়াদ (এক বছরের বেশী নয়) ফুরিয়ে যাবার ফলে বা মুস্তামিন দারুল ইসলাম পরিত্যাগ করলে আমানের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। সে যদি আবার দারুল ইসলামে ফিরে আসতে চায়, তবে তাকে নতুন করে আমান সংগ্রহ করতে হবে। ইমাম যদি বুঝতে পারেন যে, মুস্তামিন গোপনে দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত আছে বা তার কার্যাবলী মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী, তবে আমান নাকচ করে দেয়া যেতে পারে ও ইমাম মুস্তামিনকে ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বহিস্কৃত করে দিতে হবে। কোন মুসলমান যদি আমান দিয়ে থাকেন ও আমান ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর বলে গণ্য হয়, তবে ইমাম সে মুসলমানকেও শাস্তি দিতে পারেন।

মুস্তামিন যদি তার ধন-সম্পদ দারুল ইসলামে রেখে ফিরে যায় এবং দারুল হারবে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীগণ দারুল হারবে নিয়ে যেতে পারবে না। ইসলামী রাষ্ট্র তা বাজেয়াপ্ত করে নেবে। কিন্তু মুস্তামিন যদি দারুল ইসলামে অবস্থানকালে মারা যায়, তবে তার প্রতি প্রদত্ত আমান এ সম্পত্তির ওপরও প্রযোজ্য হবে এবং তার উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পদ দারুল ইসলামের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে।

আমানের গুরুত্ব

মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে অস্থায়ী শান্তিপূর্ণ স্থাপন করার ব্যাপারে আমান প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক সর্বক্ষণ যুদ্ধ-ভিত্তিক ও অশান্তিপূর্ণ মনে করা হত। তাই আমানের অবর্তমানে অস্থায়ী শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনও এক রকম অসম্ভব ছিল। মুসলিম অমুসলিম সম্পর্কের মধ্যে আমান এমন সহজ স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল, যার ফলে মুসলিম ও অমুসলিম একে অপরের রাষ্ট্রে পরিভ্রমণ করার অনুমতি লাভ করে। মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করার সময় আমান বিদেশীদের পাসপোর্টের কাজ করে। সাধারণভাবে যখন মুসলমান ও অমুসলমানদের পক্ষে দারুল ইসলাম থেকে বাইরে যাওয়া বা দারুল ইসলামে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল

না, তখন পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র ছাড়া কোন জিনিসপত্রের আদান-প্রদানও সম্ভব হত না। আমানের মারফত সীমান্তে লোক ও মালপত্র চলাচল অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। আমান না থাকলে দুটি বিরোধী দেশের মধ্যে বেআইনী আদান-প্রদান সংঘটিত হত ও এদের মধ্যে খুব বেশী মনকষাকষিও শুরু হয়ে যেত। যুদ্ধ-বিরতি কালে বার বার আমান প্রদানের ফলে মুসলিম ব্যবসায়ী ও বিদেশী রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা খুব সহজ হয়ে পড়ে।

ষোড়শ অধ্যায়
অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম

অমুসলিম রাষ্ট্র ঃ দারুল হারব

দারুল ইসলাম হল সেই রাষ্ট্র যেখানে মুসলিম শাসক কর্তৃক মুসলিম আইন বাস্তবে রূপায়িত হয়; কিংবা সেই রাষ্ট্র যা অমুসলিমদের অধিকারে গিয়ে পড়লেও অনেকটা স্বাধীনভাবেই মুসলিম আইন পালন করতে সক্ষম হয়। আর যে রাষ্ট্রে অমুসলিম আইন রূপায়িত হয় এবং যেখানে মুসলমান তাঁর নিজস্ব বিধি-বিধান পালন করতে পারেন না, তা' অমুসলিম ভূখণ্ড বলে বিবেচিত হবে। কাজেই দারুল হারব হল এমন একটি ভূখণ্ড যা মুসলিম আইনের সম্পূর্ণ আওতাবহির্ভূত। আইনগত সাম্যের ভিত্তিতে দারুল ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা দারুল হারবের নেই। কাজেই এ দু'ভূখণ্ডের মধ্যে কোন ব্যবস্থা বা চুক্তি সম্পাদিত হলে তা' সল্পস্থায়ী হতে বাধ্য। কারণ, এর মধ্যে অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতিও দেয়া হয় না, কিংবা উভয় রাষ্ট্রের স্বাভাবিক যুদ্ধাবস্থার ক্ষেত্রেও কোন পরিবর্তন হয় না।

মুসলিম আইনের বাইরে হলেও দারুল হারবকে পূর্ণ নৈরাজ্য (No man's land) বলে মনে করা চলে না; কারণ, এ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে বলে দারুল হারব মুসলিম আইনের আওতায় দারুল ইসলামের সঙ্গে মুসলিম সামরিক আইন অনুযায়ী সম্পর্ক নির্ণয়ের অধিকার লাভ করে। যুদ্ধকালে মুসলমানেরা তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী অমুসলিম যোদ্ধা ও সাধারণ নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণ করতে বাধ্য হন।

জেহাদের বিরতিকালে যখন অস্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিদেশী শাসক বা শাসকদের ইসলাম আংশিকভাবে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু ইসলামের এ স্বীকৃতি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতির (Recognition) পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ, অমুসলিম শাসকদের কার্যকলাপ ইসলাম অনুমোদন করলে তবেই বলা যায় যে, ইসলাম আধুনিক পরিভাষার সংজ্ঞা অনুযায়ী তাদের 'অনুমোদন' দান করেছে। ইসলাম যে অমুসলিম শাসনকে আংশিক স্বীকৃতি দেয় তার অর্থ হল এই যে, কোন অঞ্চলে শাসন ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অস্তিত্ব না থাকলে মানবসমাজ টিকে থাকতে পারে না। এদিক থেকে নীতিগতভাবে এ বিধান মেনে চলা হয় যে, যদি ঘটনাক্রমে কোন মুসলমানকে অমুসলিম রাষ্ট্রে পরিভ্রমণ বা বসবাস করতে হয়, তবে তিনি সেখানকার কর্তৃপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন কিংবা তার বিরোধিতা করতে পারবেন না। অবশ্য ইমাম

কর্তৃক তিনি যদি অনুরূপ কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করার জন্য আদিষ্ট হন, তবে সেকথা স্বতন্ত্র। আমান মারফত যদি তিনি এ অমুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করে থাকেন, তবে নিজেদের আইন-বিধান মেনে চলার মত অমুসলিম আইন মানতেও তিনি বাধ্য থাকবেন। এ রাষ্ট্রের আইন ও মুসলিম আইনের মধ্যে যদি কোন বিরোধ দেখা দেয়, তবে তিনি কোনটি পালন করবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই (অর্থাৎ মুসলিম আইনই তিনি পালন করবেন)।

আমানের অধীনে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের কার্যাবলী

অমুসলিমগণ যেমন আমানের অধীনে তাদের অধিকার ও কার্যাবলীর ওপর কয়েকটি পরিসীমা স্বীকার করে নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেন, তেমনি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত না হলেও মুসলমানগণও অনুরূপ পরিসীমার আওতায়ই অমুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করে থাকেন। মুসলমানরা যে পর্যন্ত আমানের অধিকার ভোগ করেন, সে পর্যন্ত তারা অমুসলিমদের কোন রকম ক্ষতিসাধন করতে পারবেন না। তা ছাড়া যদিও সুদ, মদ ও শূকরের গোশত বিক্রয় অমুসলিম রাষ্ট্রের আইনে বৈধ বলে বিবেচিত হয়, তবু এগুলোর বিষয়ে অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে মুসলমানদের মুসলিম আইন মেনে চলতে হবে। কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে, যে কোন মুসলমান যে দেশেই বাস করুন না কেন, মুসলিম আইন তার ওপর সব সময়েই প্রযোজ্য হবে এবং দারুল হারবে থাকাকালে কোন মুসলমান যদি কোন ওয়াদা দিয়ে থাকে, বা চুক্তি সম্পাদন করে থাকে, তবে দারুল ইসলামে ফিরে গেলেও তাকে তা পালন করতে হবে। আবার সেখানে থাকাকালে সে যদি টাকা কর্জ নিয়ে থাকে বা কোন জিনিস চুরি করে থাকে, তবে দারুল হারব ত্যাগ করে যাবার পরেও সে তা' ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু দারুল হারবে বসবাসকালে মুসলিমগণ এমন কিছু করতে পারবে না, যাতে সে রাষ্ট্রে দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দারুল হারবে বসবাসকারী মুসলমানগণ দারুল হারব কর্তৃপক্ষের নিকট দারুল ইসলাম সম্পর্কে কোন গোপন তথ্য সরবরাহ করতে পারবে না কিংবা দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে, এ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং সমর সরঞ্জাম উৎপাদনের কাজে সাহায্য করতে পারবে না। কেতাবী হলেও মুসলমানদের পক্ষে হারবী মহিলাকে বিবাহ না করাই শ্রেয়। কারণ, এর ফলে তার সন্তান-সন্ততিদের হয়তো দারুল হারবের জন্য কাজ করতে হতে পারে।

যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন মুসলমান শত্রু-রাষ্ট্রে অবস্থান করার সময়ে অন্য মুসলমানের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে বা এমন কোন অপরাধ করেছে যাতে উক্ত মুসলমানের ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তবে দারুল ইসলামে ফিরে আসার পর তার শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

আমান ব্যতিরেকে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম

আমান না নিয়েই যদি কোন মুসলমান দারুল হারবে প্রবেশ করে থাকেন, তবে আমানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মত তিনি এ রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানতে বাধ্য থাকবেন না। মুসলিম আইন মতে আমানবিহীন মুসলমানের সঙ্গে অমুসলিম রাষ্ট্রের যুদ্ধগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এমতাবস্থায় অমুসলিম রাষ্ট্রের আইন-বিধি মেনে নিতে তিনি বাধ্য থাকবেন না। যদি ইমামের অনুমতিক্রমে কোন মুসলমান দারুল হারবে প্রবেশ করেন, তবে যুদ্ধকালে জেহাদীরা যেমন শত্রুপক্ষের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন, এবং তাদের লোকদের বন্দী করতে পারেন, তিনিও সে ক্ষেত্রে তা করতে পারবেন। মুসলিম আইনে নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে। কাজেই যদি কোন মুসলমান দারুল হারবে অবস্থানকালে ব্যভিচার করে, শূকরের গোশত খায় বা মদ পান করে থাকে, তবে দারুল ইসলামে ফিরে আসার পর তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুদ ও ঋণের বিষয় দুটি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে হানাফী আইনবিদগণ আইনের কঠোরতা কিছুটা শিথিল করেছেন। ইমাম আবু হানিফার মতে অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইন প্রযোজ্য হবে না।

মুসলিম যুদ্ধবন্দী

যে সব মুসলিম যোদ্ধা শত্রুর হস্তে বন্দী হয়ে দারুল হারবে নীত হন এবং দারুল হারব কর্তৃপক্ষ বাধ্যবাধকতা ভিত্তিক (যেমন পলায়ন না করা কিংবা পুনরায় দারুল হারবে ফিরে আসার ওয়াদা) প্রতিশ্রুতি নিয়ে (On parole) তাদের মুক্ত করেন, তবে তাদের সে প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করতে হবে। যদি কোন মুসলমান যুদ্ধবন্দীকে ক্ষতিপূরণের (Ransom) টাকা আনবার জন্য দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হয়, তবে তিনি অবশ্যই তার প্রতিজ্ঞা পালন করবেন এবং টাকা সংগ্রহ না করতে পারলেও শত্রুর নিকট ফিরে যাবেন। কোন কোন আইনবিদ বিশেষ করে শাফেয়ীগণ বলেন যে, এ অবস্থায় ওয়াদাবদ্ধ হলেও মুসলমান বন্দীগণ ওয়াদা রক্ষা করার জন্য দারুল হারবে ফিরে যেতে বাধ্য থাকবে না। আর যদি বন্দীগণ কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে থাকেন, তবে তারা যে শুধু স্বচ্ছন্দে পলায়ন করতে পারেন তাই নয়, দারুল ইসলামে ফিরে যাবার পথে তারা শত্রুপক্ষের ধন-সম্পদ বিধ্বস্ত করতে এবং শত্রুপক্ষের লোকদের হত্যা করতে পারেন।

দারুল হারবে অবস্থানকালে মুসলিম বন্দীগণ যে শুধুমাত্র মুসলিম আইন পালন করতেই বাধ্য থাকবেন তা নয়, দারুল হারবের আইন যদি মুসলিম আইনের বিরোধী না হয়, তবে সে আইনও তারা পালন করবেন। তবে প্রতিকূল পরিবেশে তারা যদি

মুসলিম আইন পালন করতে না পারেন, তবে সে কথা স্বতন্ত্র। তারা যদি গানিমার অংশ লাভ করার প্রতিশ্রুতিও পান, তবু কোনক্রমেই তারা শত্রুপক্ষের সৈনিকদের সঙ্গে একযোগে যুদ্ধে যোগদান করতে পারবেন না। ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর কোন তথ্যাদিও তারা শত্রুদের নিকট সরবরাহ করতে পারবেন না। মুসলিম আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ এমন কাজ করতে যদি বন্দীকে বাধ্য করা হয় (যেমন ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা), তবে এজন্য তাকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। মহিলা বন্দীকে যদি শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই প্রথমদিকে তা সহ্য করার চেষ্টা করতে হবে; কিন্তু পরে তিনি যদি মৃত্যুর আশংকা করেন, তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে শত্রুদের দাবীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে পারেন।

সপ্তদশ অধ্যায়
জিম্মীদের মর্যাদা

ইসলাম ও অমুসলিম নাগরিক

সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর মর্যাদা বিভিন্ন আইন-ব্যবস্থায় বিভিন্নভাবে নিরূপিত হয়েছে। যে সব জাতি গোড়ার দিকে মুসলিম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাদের সাথে সম্পর্ক নিরূপণের ক্ষেত্রে ইসলাম এক চমকপ্রদ পরীক্ষাকার্য চালায়। কালক্রমে এসব চুক্তির স্বীকৃত ব্যবস্থাবলী মুসলিম আইনের পরবর্তী সংযোজিত অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়। যে সব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তারা ভিন্ন আর সব চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীকেই যে কোন মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণের কলেমা (মূল কালাম) 'শাহাদাত' পাঠ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে যোগদানের অবারিত সুযোগ দান করা হয়। যতদিন পর্যন্ত জিম্মীগণ তাদের নিজের ধর্মেই আস্থাবান থাকত, ততদিন তারা তাদের নিজেদের আইন-কানুন পালনের অধিকার ভোগ করত (অবশ্য এটা যদি বৃহত্তর মুসলিম স্বার্থবিরোধী না হয়)। যদি তারা স্বেচ্ছায় মুসলিম আইন-ব্যবস্থার আওতায় আসতে চাইত, তবে কোন বাধাই ছিল না। জিম্মীদের কানুন ও বিচার বিভাগীয় পরিচালনার বিষয়টি এক পৃথক গবেষণার বস্তু। কাজেই তা বর্তমান আলোচনার এলাকার বাইরেই পড়ে।

জিম্মীর অর্থ ও তাৎপর্য

ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে কেবল আহলে কিতাব ছিল তাই নয়, এর মধ্যে পৌত্তলিক (আবদাত আল-আসনাম) ও অগ্নিপূজকও ছিল। এদের অবশ্য আরবীয় উপদ্বীপের বাইরে বসতি স্থাপন করতে হত। কেতাবীদের মধ্যে খৃস্টান, ইহুদী, মাজিয়ান (জরথুস্ত্রীয়), সামারীয় ও সেবীয়গণ রয়েছে। সাধারণতঃ আরবদেশে মুশরিক বা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসীগণকে জিম্মীর মর্যাদা দেয়া হত না।

চুলচেরা বিচারে মাজিয়ানরা কেতাবী বলে গণ্য হতে পারে না। কারণ, হাদিসে জানা যায় যে, আল্লাহর ওপর তাদের বিশ্বাস ছিল না এবং তাদের কোন কেতাবও ছিল না। যেহেতু তাদের একজন উপাস্য ছিল সেজন্য রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) ও প্রাথমিক যুগের খলিফাগণ তাদের কেতাবী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের জিম্মীর মর্যাদা দান করেছেন।

দারুল ইসলামের অভ্যন্তরে বা বাইরে যেখানেই বাস করত না কেন, যাদের ধর্মীয় কেতাব ছিল তাদেরই 'আহলুল-কেতাব' বা কেতাবী বলে গণ্য করা হত। দারুল ইসলামে যে সব আহলুল কেতাব বাস করত ও যারা মুসলিম কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল, তাদের জিম্মী নামে অভিহিত করা হত। 'জিম্মা' কথাটির অর্থ হল এমন চুক্তি, বিশ্বাসী মুসলিম যার মর্যাদা দিতে স্বীকৃত হন। এ চুক্তি লঙ্ঘন করলে তাকে নিন্দার্হ হতে হয় (জাম—নিন্দা)। আইনের বিচারে দেখা যায় যে, জিম্মা কথাটি বলতে একটি বিশেষ অবস্থা ঝুঝায়; এ অবস্থা লাভ করলে ব্যক্তি কতকগুলো অধিকার লাভ করেন, যেগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ছাড়াও এ অধিকারের মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য আমান প্রদান করা হয়। কিন্তু এর ফলে সে ব্যক্তি পূর্ণ নাগরিকত্ব লাভ করে না। কারণ, কেতাবী যদিও আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন কিন্তু রসূলের ওপর ঈমান আনেন না। তাই তাকে সত্যিকার বিশ্বাসী বলে গণ্য করা যেতে পারে না। সেজন্য তিনি মুসলিম-ভ্রাতৃত্বের পূর্ণ সদস্যরূপে গণ্য হতে পারেন না। কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বা নিপীড়ন থেকে রেহাই পাবার জন্য জিম্মীকে জিযিয়া প্রদান করতে হয়।

প্রশ্ন উঠেছে যে, দুনিয়াতে সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা যখন ইসলামের উদ্দেশ্য, তার পরিপ্রেক্ষিতে জিযিয়া নিয়ে অবিশ্বাসী বা কুফুরীকে স্থায়ী করা যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে কি-না। সারাখসী বলেন যে, অর্থকরী দিকটা এখানে খুব বড় কথা নয়। অতি উদারভাবে অমুসলিমকে যে ইসলামে আহ্বান করা হত, এরমধ্যে তা-ই মূর্ত হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের মধ্যে বসবাস করার অনুমতি লাভ করার ফলে জিম্মীগণ ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য দ্বারা আকৃষ্ট হন এবং তার ফলে ইসলাম গ্রহণ করতে তারা সম্মত হতেও পারেন।

হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সঙ্গে জিম্মীদের চুক্তি

প্রখ্যাত আইন ও ধর্মবেত্তাগণ কর্তৃক লিখিত আইন-পুস্তকে জিম্মী ও মুসলমানদের সম্পর্ক নির্ণয় করে অনেক আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হয়েছে। অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোর প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক মুসলিমদের বিধান ও কার্যাবলীর পর্যালোচনা পরবর্তী যুগের পরিবর্তন সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করবে।

হযরতের (সঃ) সঙ্গে স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ কেতাবীগণের সম্পর্কের মধ্যে ধর্মীয় উদারতা ও সজ্ঞান সতর্কতা প্রত্যক্ষ করা যায়। 'মদিনা-চুক্তি'তে (৬২৩ খৃস্টাব্দ) একথাই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। আউস ও খাযরাজ গোত্রের সঙ্গে মুসলমানদের এ চুক্তিটি সম্পন্ন হয়। ইহুদীগণও চুক্তিতে শরীক হয়। এতে ইহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

"বানু আউস গোত্রের ইহুদীগণ মুসলমানদের সঙ্গে একই (রাজনৈতিক) জাতি বলে বিবেচিত হবে। ইহুদীরা তাদের নিজেদের ধর্মে বিশ্বাসী থাকবেন এবং মুসলমানদের নিজেদের (আলাদা) ধর্ম থাকবে।

"হযরত মুহাম্মদের (সঃ) অনুমতি ছাড়া কোন ইহুদী মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে পারবে না।

"মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হলে ইহুদীগণ যুদ্ধব্যয় বাবদ অর্থ প্রদান করবেন।"

এ চুক্তিতে ইহুদীদের ওপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় নি। হযরতের (সঃ) বৃহত্তর কওমের মধ্যে পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায়রূপে তাদের অবস্থান করতে হবে, বিধি-নিষেধের মধ্যে শুধু এইটুকু। তাদের যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করা হত না। অবশ্য যুদ্ধে যোগদান করার জন্য তাদের আহ্বান করা হত। তারা যুদ্ধে যোগদান করলে সম্মিলিত যুদ্ধ-তহবিলে তাদের কিছু অর্থ প্রদান করতে হত। তাদের প্রতি কোন বিশেষ শুল্ক ও জিযিয়া তখনও ধার্য করা হয় নি। জিযিয়া আল-কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে বিধিবদ্ধ হয় ঃ

"কেতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওপর ও শেষ দিনে ঈমান আনেনি এবং যারা আল্লাহর ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছেন, তা নিষেধ করে নি এবং যারা সত্যকে স্বীকার করে না তাদের সঙ্গে সংগ্রাম কর ও তাদের অবনত করে জিযিয়া আদায় কর"। (৯ ঃ ২৯)।

কেতাবীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কয়েকটি সাবধানবাণী ছাড়া আল-কোরআন আর কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করে নি। ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকলে, আল-কোরআন ও হাদিসে যে কেবল কিতাবীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে তা নয়, তাদের আক্রমণ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার জন্যও উদাত্ত আহ্বান জানান হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাবালা, জারাশ, আধরুহ, মাকনা, খায়বার, নাজরান ও আয়লা—এই সব কেতাবীদের প্রতি যে সনদ প্রদান করেন তা আবু ইউসুফ ও বালাজুরী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এসব সনদে জিযিয়া প্রদানের বিনিময়ে তাদের জীবন, ধন-সম্পদ ও ধর্ম-বিশ্বাস রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। নাজরান গোত্রকে দেয়া নিম্নোক্ত সনদটি এ বিষয়ে দিকদর্শনের কাজ করছে ঃ

> "পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটা হল সেই সনদ যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) নাজরানের অধিবাসীদের দান করেন। নাজরানের অধিবাসী, তাদের ফলমূল, ধন-সম্পদ ও দাস-দাসীদের প্রতিও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। এগুলোর তারা ভোগ করবে। কিন্তু দু'হাজার পোশাক বা 'হুলাল আল-আওয়াকী' তারা দান করবে। এর মধ্যে এক হাজার রজব মাসে দিতে হবে, আর এক হাজার সফর মাসে দিতে হবে। প্রত্যেকবার শুল্ক প্রদানের সময়ে এক আউন্স করে রৌপ্য দিতে হবে। যদি ফসল এর চাইতে বেশী বা কম হয়, তবে ফসলের অনুপাতে শুল্ক ধার্য হবে। মুসলমানরা নাজরানের অধিবাসীদের কাছ থেকে ঢাল, ঘোড়া, নানাপ্রকার জীবজন্তু এবং অন্যান্য দ্রব্য পেতে পারবেন। ঊর্ধ্বপক্ষে ২০ দিন তারা

আমার দূতদের আপ্যায়িত করবে ও তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করবে। কিন্তু তারা সে দ্রব্যাদি এক মাসের বেশী নিজেদের কাছে রাখতে পারবে। ইয়ামন ও মা-আররাতে যদি যুদ্ধ বাধে তবে তারা ত্রিশজন সৈন্যের পোশাক-পরিচ্ছদ আর ত্রিশটি ঘোড়া ও ত্রিশটি উট সরবরাহ করবে।

"ঋণ হিসেবে আমার দূতদের জন্য প্রদত্ত জিনিসপত্র যদি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তার জন্য নাজরানের অধিবাসীদের সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। তাদের উপস্থিত অনুপস্থিত সবাই জীবন, ধন-সম্পদ, জমি-জমা, ধর্ম, পরিবার, চার্চ ও নিজস্ব দ্রব্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহর আশ্রয় এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের (সঃ) প্রতিশ্রুতি লাভ করবে। কোন পাদ্রী বা সাধুকে তার চার্চ বা মঠ থেকে অপসারণ করা চলবে না এবং তাদের পৌরহিত্য পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা চলবে না। তাদের ওপর কোন প্রকার জোর-জুলুম বা নিপীড়ন করা চলবে না। আমাদের ফৌজ তাদের জমি অধিকার করবে না। যারা সুবিচার চায়, তারা তা লাভ করবে। উৎপীড়ক কিংবা উৎপীড়িত বলে কিছু থাকবে না। যারা সুদের ব্যবসায় করে, তারা আমার কাছে রেহাই পাবে না। অপরের অপরাধের জন্য কাউকে দোষী করা চলবে না। এ চুক্তি বহাল রাখার জন্য আল্লাহর প্রদত্ত রক্ষাকবচ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদের (সঃ) প্রতিশ্রুতিই আইনগত ভিত্তি রচনা করবে। এ চুক্তি ততদিন বলবৎ থাকবে যতদিন নাজরানের অধিবাসীগণ বিশ্বস্ততার সাথে চলবে আর তাদের কর্তব্য পালন করবে এবং কোন প্রকার অত্যাচারে শরীক হবে না। এ চুক্তিটি নিম্নলিখিত সাক্ষীবৃন্দের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় ঃ আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, গায়লান ইবনে আমর, বানু নাসর গোত্রের মালিক ইবনে আউফ, আল-আকরা ইবনে হাবিস আল-হানযালী ও আল-মুগীরা ইবনে শুবা। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর এ চুক্তিটি সম্পাদনার কাজ করেন।"

আয়লা বা আকাবার খৃস্টানদের প্রতিও হযরত মুহাম্মদ (সঃ) অনুরূপ একটি সনদ প্রদান করেন। এর দ্বারা তিনি সর্বশেষ কেতাবী সম্প্রদায়কে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক পর্যায়ে আনবার চেষ্টা করেন। এর ফলে আরব দেশের ওপর ইসলামের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়লার খৃস্টানদের প্রধান ইয়াহুন্নার (জন) কাছে লিখিত এক পত্রে তিনি ইসলামের সঙ্গে খৃস্টানদের শান্তি স্থাপন করতে আহ্বান করেন। চিঠিখানি এই ঃ

"ইয়াহুন্না ইবনে রুবা ও আয়লার অধিবাসীদের প্রতি। আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্'র সব প্রশংসা যিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই। আপনাকে লিখিতভাবে না জানিয়ে আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব না। ইসলাম গ্রহণ করুন কিংবা জিযিয়া প্রদান করুন এবং আল্লাহ, তাঁর নবী ও নবীর প্রতিনিধিদের

মান্য করুন। প্রতিনিধিদের সম্মান করুন ও তাঁদের উত্তম পোশাক প্রদান করুন। কিন্তু এ পোশাক যেন বিজাতীয় পোশাক না হয়। জায়েদকে পোশাকে সজ্জিত করুন যাতে আমি ও আমার প্রতিনিধিগণ সন্তুষ্ট হতে পারি। আপনি যদি জল ও স্থলপথে নিরাপত্তা লাভ করতে চান, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করুন। এতে আপনি আরব বা বিদেশী শত্রুদের প্রতিটি আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবেন। যদি আপনি আমার দাবীতে সম্মত না হন, তবে আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনার লোকজন হত্যা করে এবং আপনাদের মহিলা ও শিশুদের বন্দী না করে আপনার কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ করতে চাই না। আমি আল্লাহর রাসূল। আমি আল্লাহকে, তাঁর কিতাবগুলোকে, তাঁর নবীদের এবং মরিয়মের পুত্র ও আল্লাহর-বাণী হযরত ইসাকে (আঃ) সত্য বলে জানি। আমি তাঁকে আল্লাহর নবী বলে বিশ্বাস করি।

"বিপদ নিপতিত হবার পূর্বে আমার আবেদন গ্রহণ করুন। আমার সেনাপতিদের আমি আপনার কাছে পাঠিয়েছি। হারমালাকে আপনি তিন ওয়াসক যব দেবেন। কারণ, হারমালা আপনার পক্ষ হয়ে আমার কাছে সুপারিশ করেছেন। আল্লাহর দয়া না হলে এবং তাঁর সুপারিশ না থাকলে আমার ফৌজের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে আপনার কোন যোগাযোগ বা সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হত না। আমার প্রতিনিধিদের আপনি যদি মান্য করেন, তবে আল্লাহ, মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারিগণ আপনার প্রতিবেশীরূপে গণ্য হবেন। আমার প্রতিনিধিদের মধ্যে রয়েছেন শুরাহবিল, উবাই, আবু হারমালা, হোরাইস ইবনে যায়েদ আত্-তাঈ।

"আপনার সঙ্গে তাঁদের যে চুক্তি হবে, তাই আমি মেনে নেব। আপনি স্বচ্ছন্দে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আশ্রয় অবলম্বন করতে পারবেন। আপনি যদি এতে স্বীকৃত হন, তবে আপনার ওপর শান্তি।

"মাকনার লোকদের তাদের বাসভূমিতে পাঠিয়ে দিন।"

ইয়াহুন্না হযরত মুহাম্মদের (সঃ) তাঁবুতে উপস্থিত হলেন। অতিথি হিসেবে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করা হয় ও তাঁকে একটি লম্বা আলখেল্লা উপহার দেয়া হয়। আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। পরিশেষে নিম্নলিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ঃ

"পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি ঃ

"এটি হল একটি নিরাপত্তা সনদ যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ইয়াহুন্না ইবনে রুবা ও আয়লার অধিবাসীদের প্রদান করেছেন। সিরিয়া, ইয়ামন বা সমুদ্র-উপকূল থেকে আগত তাদের জাহাজ, পরিব্রাজক এবং সঙ্গীদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।

"যারা গোলযোগের সৃষ্টি করে, তাদের ধন-সম্পদ তাদের রক্ষা করতে পারবে না। তাদের যারা ধরে নিতে পারবে, তারা এদের অধীনস্থ হয়ে যাবে।

"আয়লার অধিবাসীদের পানির ঝরণায় যাওয়া নিষেধ করা অবৈধ হবে। তাদের ব্যবহৃত স্থলপথ ও জলপথ থেকে তাদের বঞ্চিত করা যাবে না।

"আল্লাহর রাসূলের অনুমতিক্রমে এ চুক্তি জুহাইন ইবনে আস-সালত ও শুরাহ্-বিল ইবনে হাসান কর্তৃক লিখিত হয়।"

উপরে বর্ণিত দলিলগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে যে কেবল গোড়াতে মুসলিম ও কেতাবীদের পরস্পর সম্পর্কই ধরা পড়েছে তাই নয় এর মধ্যে সারল্য এবং মুসলিম-অমুসলিম সামাজিক বিভেদের অনুপস্থিতিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একথা অবশ্য বলা যায় যে, সাবধানতাই শান্তিপূর্ণ উদার নীতির পত্তন করে। তবু একথা সত্য যে, কেতাবীদের প্রতি হযরত মুহাম্মদের (সঃ) শিক্ষা খুব উদার ছিল। প্রথমতঃ, তাঁর ধর্ম প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর প্রতি ঈমান। আর তাঁকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করার অর্থ তাঁর কর্তৃত্বও স্বীকার করে নেয়া। কিন্তু এ রীতি গৌণভাবে প্রথম রীতির দ্বারা সীমিত হয়েছে। কেতাবীদের আল্লাহর রাসূলের (সঃ) ওপর ঈমান না থাকলেও আল্লাহর ওপর তাদের ঈমান ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সনদগুলো মেনে নেবার ফলে তারা "আল্লাহর রাসূল" একথাগুলো ব্যবহার না করলেও তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। ব্যবহারিক সমস্যা সম্পর্কে হযরত (সঃ) খুব বাস্তববাদী ছিলেন। সেইজন্য তিনি এই সমঝোতা এই আশায় মেনে নেন যে, উদারতার ফলে কেতাবী ভাইরা সহজেই সত্যধর্ম গ্রহণ করতে পারবে। এ নীতি অনুসরণ করেই জিযিয়া ভিন্ন আর কোন বিভেদমূলক পন্থা অনুসরণ করা হয় নি। মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাতের মতই জিম্মীদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া হত। কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হওয়ার ফলেই কখনও কখনও হযরতকে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু এর মধ্যে বিন্দুমাত্র ধর্মীয় অনুদারতা ছিল না।

জিম্মাদের সম্পর্কে হযরত উমরের আইন

আইনবিদগণ আল-কোরআনের নির্দেশ ও হযরতের কার্যাবলী ছাড়াও খলিফা প্রথম উমরের (রাঃ) সনদের উল্লেখ করে থাকেন। এ সনদে মুসলিম রাষ্ট্র সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কেতাবীদের অবস্থার পূর্ণব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সনদটিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সনদটি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। কিন্তু শুরুতে এ কথা বলে রাখা ভাল যে, হযরত উমর (রাঃ) বোধহয় একই দলিলে সনদটিতে উল্লেখিত শর্তাদির বিবরণ প্রদান করেন নি। কিন্তু সাধারণতঃ তাই ধরে নেয়া হয়।

আবু ইউসুফ ও বালাযুরীর বর্ণনা অনুসারে ইরাক ও সিরিয়ার খৃস্টানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে সমঝোতার পৌছানোর ব্যাপারে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আবু উবায়দা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন। খলিফা উমর (রাঃ) এ চুক্তিগুলো অনুমোদন করেন। বালাযুরী প্রদত্ত চুক্তির বিষয়গুলো আবু ইউসুফের সঙ্গে মিলে যায়। আর আবু ইসুফের প্রদত্ত দলিলই এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করছে। তাই এ দলিলগুলো এখানে বিশদভাবে বিবৃত করা হবে। আবু ইউসুফ বলেন যে, প্রধান

সেনাপতি খালিদের সেনাবাহিনী ইরাকে শক্তি বলে অনেক শহর দখল করেন; কিন্তু হিরা অঞ্চলে তাঁকে কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। ফলে তাঁর সঙ্গে হিরার অধিবাসীদের এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। হিরার খৃস্টানদের সঙ্গে মুসলিম কর্তৃপক্ষের এটাই ছিল প্রথম চুক্তি। চুক্তিটির বিবরণ নীচে দেয়া হল ঃ

"পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটা খালিদ বিন ওয়ালিদ ও হিরার অধিবাসীদের মধ্যে চুক্তি। খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাকে ইয়ামা'মা থেকে অগ্রসর হয়ে ইরাকের অধিবাসীদের (আরবীয় ও পারসিকদের) নিকট আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনার আহ্বান জানাবার জন্য এবং ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য ও ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃত হলে তাদের নরকাগ্নি সম্পর্কে সাবধানবাণী দেবার জন্য আদেশ করেছেন। ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁরা মুসলমানদের সঙ্গে সমান দাবী-দাওয়া ও কাজ-কর্মের অধিকার ভোগ করবে। পরিশেষে আমি হিরায় পৌছে আয়াস-বিন-কাবিসা আততাঈ ও শহরের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমি তাদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে আহ্বান করি। কিন্তু তারা তাতে রাজী হন নি। তাই, আমি তাঁদের জিযিয়া প্রদান করতে অথবা যুদ্ধের সম্মুখীন হতে আহ্বান করি। তাঁরা জবাব দেন ঃ 'আমরা যুদ্ধ চাই না। কেতাবীরা যেমন জিযিয়া প্রদান করে শান্তি স্থাপন করেন, আমরাও অনুরূপ জিযিয়া দিয়ে শান্তি লাভ করতে চাই।' আমি এ প্রস্তাব মেনে নিলাম ও গণনা করে দেখলাম যে, তাদের জনসংখ্যা সাত হাজার। এক হাজার বৃদ্ধ জিযিয়া থেকে রেহাই পেলেন। ছ' হাজার লোকের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া ঠিক হল। জিযিয়ার পরিমাণ হবে ৬০ হাজার দিনার।

"একথা স্বীকৃত হল যে, হিরার অধিবাসীগণ তাদের চুক্তি লঙ্ঘন করবে না এবং আরব বা ইরানী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না। তাদের কেউ যদি দুর্বল ও বৃদ্ধ বা পীড়িত হয়ে পড়ে বা ধনী অবস্থা থেকে গরীব হয়ে যায় তবে তাকে আর জিযিয়া দিতে হবে না। সে ও তার পরিবার দারুল ইসলামে অবস্থান করলে বায়তুল মাল থেকে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হবে। তারা যদি দারুল ইসলাম পরিত্যাগ করে, তবে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করা হবে না। তাদের যদি কোন দাস ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সর্বাপেক্ষা অধিক দাম নিয়ে তাকে বিক্রয় করে দিতে হবে ও বিক্রয়-লব্ধ অর্থ তার প্রভুকে দিতে হবে। সামরিক পোশাক ছাড়া কেতাবীগণ যে কোন পোশাক পরিধান করতে পারবে; অবশ্য সে পোশাক যেন মুসলমানদের পোশাকের মত না হয়। তাদের মধ্যে কেউ যদি সামরিক পোশাক পরিধান করে, তবে তাকে গ্রেফতার করা চলবে

এবং সেজন্য তাকে কারণ দর্শাতে হবে। এ কারণ যদি যথোপযুক্ত না হয়, তবে একটি সামরিক পোশাকের দাম তার কাছ থেকে আদায় করা হবে। ঠিক হয় যে, বায়তুল মালের মাধ্যমে জিযিয়া প্রদান করতে হবে। যদি তাদের কোন অর্থকরী সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে তারা তা বায়তুল মাল থেকে গ্রহণ করবে।"

এ চুক্তিটি মুসলিম ও অধিকৃত অঞ্চলের খৃস্টানদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলোর প্রথম। এ চুক্তির গুরুত্ব এই যে, এর দ্বারা উভয়পক্ষ অনেকগুলো বাধ্যবাধকতা মেনে নেন। খৃস্টানগণ পৌর-জীবন যাপন করতে, সামরিক পোশাক পরিধান না করতে এবং মুসলমানদের শত্রুকে সাহায্য না করার প্রতিশ্রুতি দেন। আর মুসলিম কর্তৃপক্ষ শুল্ক দেয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের ওপর হিসেব করে সামগ্রিকভাবে জিযিয়া গ্রহণ করবেন এবং এর বিনিময়ে তাদের নিরাপত্তার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আবু ইউসুফ বলেন, এটাই প্রাচ্যের প্রথম জিযিয়া। এতে বোঝা যায় যে, এ চুক্তিটি মুসলিম কর্তৃপক্ষ ও ইরাকের খৃস্টানদের মধ্যে সম্পাদিত প্রাথমিক চুক্তি। এর মধ্যে এমন কোন কিছুর ব্যবস্থা নেই, যা অসম্মানজনক বলে গণ্য হতে পারে। জিযিয়া প্রদান করা বা সামরিক ব্যাপারে শরীক না হওয়ার মধ্যে আপত্তিজনক কিছুই নেই। কারণ, পরাজিত হবার ফলে স্বভাবতই সামরিক ও বেসামরিক ক্ষমতা নিয়ে নেয়া হয় এবং মুসলিম কর্তৃপক্ষই দেশরক্ষার ভার নেন। আবার মুসলিম কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা লাভ করার বিনিময়ে জিযিয়া দেয়া হয়। মনে রাখা উচিত যে, জিম্মীদের ওপর কোন ভূমি-শুল্ক (খারাজ) ধার্য করা হত না। জিযিয়া পাইকারী-শুল্ক (মাথা-গণতি কর) ছিল না। একটি সামগ্রিক শুল্কের নামই জিযিয়া যার মধ্যে কোন অসম্মান বা হীনমন্যতা ছিল না। জিযিয়া বৃদ্ধি করার কোন কথাও জিযিয়ার মধ্যে ছিল না। বরং এতে এ কথাই লেখা ছিল যে, যদি ধনীগণ পরে জিযিয়া দিতে অসমর্থ হয়ে পড়েন, তবে তাদের আর জিযিয়া দিতে হবে না। তাদের বায়তুল মাল থেকে সাহায্য করা হবে। লক্ষ্য করার বিষয়, এতে কেতাবীগণ মুসলিমদের সঙ্গে একই ভিত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্রের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

আবু ইউসুফ বর্ণনা করেছেন যে, বানিকিয়া ও আইন-আততামর প্রভৃতি শহরও একই প্রকার চুক্তির আওতায় বশ্যতা স্বীকার করে। বালাযুরীও একথা সমর্থন করেছেন। সিরিয়ার বেলায় অবশ্য চুক্তিতে আরও কতকগুলো বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। আবু উবাইদার পরামর্শে খলিফা উমর (রাঃ) তা গ্রহণ করেন। পরে এগুলো মুসলিম শাসনাধীনে সব কেতাবীদের প্রতি প্রযোজ্য হয়। এ ব্যাপারে বালাযুরীর সঙ্গে তা'বারী ও ইয়াকুবী প্রায় একমত পোষণ করেন। চুক্তির কয়েকটি ধারায় অবশ্য কয়েকটি গরমিল দেখা যায়। সিরিয়া অভিযানের প্রত্যক্ষদর্শী মাখুলের মতে আবু ইউসুফ কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

"জিযিয়া দেবার বিনিময়ে মুসলমানদের সঙ্গে দামেস্কের অধিবাসীদের শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে মুসলমানেরা তাদের জীবন ও ধনসম্পদ এবং চার্চ রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেন। তারা কোন নতুন চার্চ নির্মাণ করতে পারবেন না। অবশ্য পুরাতন চার্চগুলো তারা সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করতে পারেন। দামেস্কের অধিবাসীগণ পুল সংস্কার করতে বাধ্য ছিলেন এবং একাজ তারা স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। তাদের অঞ্চল দিয়ে সফরের সময় তারা মুসলমানদের অভ্যর্থনা করতেন, তিনদিন আদর-আপ্যায়ন করতেন ও প্রয়োজন হলে তাদের পথ দেখিয়ে দিতেন। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রামকারীদের জন্য আলোক-সংকেতের ব্যবস্থা করতেন এবং কোন মুসলমানকে প্রহার বা অসম্মান করতে পারতেন না। নামাজের সময় তাদের ঘণ্টা বাজাবার অধিকার ছিল না। মুসলিম জনসমাবেশে তারা ক্রুশ বা শূকর নিয়ে যেতে পারতেন না। সামরিক পোশাক পরিধান করতে, অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে বা ধর্মীয় উৎসব ছাড়া ভোজের সময় নিশান বহন করতে তাদের অনুমতি দেয়া হত না।"

চুক্তির এ ধারাগুলো দামেস্কের অধিবাসীরা সানন্দে গ্রহণ করেন। ফলে অন্যান্য অনেক গোত্রও এ সব নীতির ওপর ভিত্তি করে মুসলিম কর্তৃপক্ষের অধীনে চলে আসে। যখন খলিফা উমরের (রাঃ) কাছে এগুলো অনুমোদনের প্রার্থনা জানানো হয়, তখন তিনি বললেন ঃ

"সিরিয়ার শহর ও নগরগুলোর অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পন্ন চুক্তিগুলো আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। এবং আমি আমার রাসূলের সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে তাঁদের মতামতও জানতে পেরেছি। এগুলো ও আল্লাহর কেতাবের ওপর ভিত্তি করে (৫৯ ঃ ৬-৮) আমি যে সিদ্ধান্তে এসেছি তা হল এই যে, যেদেশ আপনারা দখল করেছেন, তা সেখানকার অধিবাসীদেরই থাকবে, তারাই সেখানকার কৃষিকার্য পরিচালনা করবে। আর আল-কোরআনের নির্দেশ অনুসারে তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী আপনারা তাদের ওপর জিযিয়া ধার্য করবেন। তারা জিযিয়া দান করলে আপনারা তাদের কাছ থেকে আর কিছু চাইবেন না। আর জমি যদি সাবেক অধিবাসীদেরই থাকে, তবে মুসলমানেরা এর থেকে ফসল ভোগ করতে পারবে।

"তাই আপনারা তাদের (জিম্মীদের) ওপর জিযিয়া ধার্য করবেন; কিন্তু কখনও তাদের বন্দী করবেন না কিংবা তাদের ওপর কোন প্রকার অত্যাচার বা ক্ষতি সাধন করবেন না। সত্যিকার দাবী না থাকলে আপনারা তাদের কাছ থেকে ধনসম্পদও গ্রহণ করবেন না। তদের সঙ্গে আপনারা যে চুক্তি সম্পাদিত করেছেন, তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করবেন। উৎসবের দিনে বছরে একদিন করে ক্রুশ বের করা সম্বন্ধে বলতে চাই যে, তারা তাদের নিশান বাইরে না আনে, তবে শহরের বাইরে ক্রুশ আনতে তাদের বাধা দেবেন না।"

আবু ইউসুফ যদিও কেবল হযরত উমর (রাঃ), আবু উবায়দার অনুসৃত নীতি অনুমোদন করে যে পত্র লিখেছিলেন, তা হুবহু বিবৃত করেছেন, তবু একথা বলা যায় যে, হযরত উমর (রাঃ) খালিদের নীতি অনুমোদন করেন। পরবর্তীযুগে কেতাবীদের সঙ্গে যতগুলো চুক্তি সম্পাদিত হয়, সবই কিয়ামতের দিন অবধি চালু থাকবে।

আবু উবায়দার কাছে লিখিত পত্রে আমরা যে কেবল ক্রুশ ও চার্চ সম্পর্কে কতকগুলো নতুন নতুন দাবী সন্নিবেশিত দেখতে পাই তাই নয়, এগুলো সব জিম্মীদের জন্যই কার্যকরী করা হয়। অবশ্য ইরাকের খৃস্টানদের সঙ্গে সম্পন্ন খালিদের চুক্তিতে এসবের কোন উল্লেখ ছিল না। শত্রুপক্ষের নিকট হতে দখলকৃত জমিজমা সম্পর্কেও এ নীতির উল্লেখ দেখতে পাই। হযরত উমর (রাঃ) বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, গ্রামাঞ্চলের জমিজমা (শহর বা নগরের জমিজমা নয়) গানিমা হিসেবে যোদ্ধা বা জেহাদীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যাবে না। এ জমি হস্তান্তরিত করাও চলবে না। এসব জমি জিম্মী কৃষকদের (উলুজ) হাতেই থাকবে। তারাই জমি চাষ করবে এবং মুসলমান, তাদের বংশধর ও তাদের নিজেদের (কৃষকদের) কল্যাণে সামর্থ অনুযায়ী জিযিয়া প্রদান করবে। খেয়াল করার বিষয় যে, খালিদ ও আবু উবায়দা উভয়ের চুক্তিতেই জিযিয়া এমন একটি শুল্ক বলে গণ্য হয়েছে যার সাথে আয়ের উৎস বা পদ্ধতির কোন সম্পর্ক নেই। হযরত উমরের (রাঃ) চিঠিতে কেবল উক্ত জমিরই উল্লেখ আছে যা জিম্মীরা জিযিয়া প্রদান করে নিজেদের বলে দাবী করতে পারত। প্রশ্ন উঠতে পারে, হযরত উমর (রাঃ) কি খারাজ বা ভূমি-রাজস্ব হিসেবে অন্য কোন শুল্ক দাবী করতেন। অথবা জিম্মীরা কৃষক হিসেবে যখন জমির ওপরেই একান্তভাবে নির্ভর করত, তখন এ শুল্কের আর প্রয়োজন ছিল না—একি সত্য? আবু ইউসুফ ও বালাযুরীর প্রদত্ত চুক্তিগুলোর দলিল দেখে এর কোন সুরাহা করা যায় নি। অবশ্য দুজনেই বলেছেন যে, হযরত উমরের হুকুম-নামায় জিযিয়া ও খারাজ উভয়ই রয়েছে।

জিযিয়া ও খারাজ

জিযিয়া ও খারাজ (রাজস্ব) সম্পর্কে অনেকখানি অনিশ্চয়তা বিদ্যমান রয়েছে। ফলে বিজিত দেশে প্রাথমিক যুগের কর-ব্যবস্থার আইন সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ওয়েলহ'সেন বলেন ঃ জিযিয়া দেশ-জয় কালে ধার্য করা হত। নির্দিষ্ট অর্থ ও ফসলের নির্দিষ্ট অংশের সামগ্রিক নামই জিযিয়া। এর মধ্যে ভূমি-কর বা খারাজ ও ব্যক্তি-কর বা জিযিয়াও (মাথা-গণতি কর নয়) ছিল। কিন্তু শুল্ক আদায়ের পদ্ধতির সাথে মুসলিম শাসকদের কার্যের কোন সম্পর্ক ছিল না। জিযিয়া ও খারাজের মধ্যে কখনো কখনো একটিই ধার্য করা হত। কারণ, এদুটি কথার দ্বারা এক জিনিসই (শুল্ক) বোঝাত। পরবর্তীকালে মুসলিম-আইনবিদগণ জিযিয়া ও খারাজে পার্থক্য নির্দেশ করেন

এবং প্রাথমিক মুসলিম সমাজে তার (কাল্পনিক) প্রয়োগ করেন। বিজিত দেশে জমি কেনা থেকে মুসলমানদের বিরত করা ও নব-দীক্ষিত মুসলমানদের কাছ থেকে জিযিয়া না নেবার নীতি খলিফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (দ্বিতীয় উমর) প্রবর্তন করেন। অতঃপর সব জমি থেকে খারাজ সংগ্রহ করা সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। তা সে জমি জিম্মীরই হোক বা নব-দীক্ষিত মুসলমানদেরই হোক।

কার্ল বেকার ও প্রিন্স কেতানী প্রমুখ পণ্ডিতগণ ওয়েলহ'সেনের মতামত মেনে নিয়েছেন। কিন্তু দানিয়েল সি, ডেনেট এ মতের ঘোর বিরোধিতা করেছেন। ডেনেট কিন্তু ওয়েলহ'সেনের মতামতের অনেকটা সংস্কার বা উন্নতি-বিধান করেছেন। কতকগুলো অমীমাংসিত সমস্যারও তিনি সমাধান করেছেন। তিনি সত্যিই বলেছেন যে, শুল্কের ব্যাপারে কেবল এক বা অভিন্ন রীতি ছিল না। ডেনেট ওয়েলহ'সেনের সঙ্গে একমত যে, জিযিয়া ও খারাজ নিছক শুল্ক (Tribute) ছিল না। ডেনেট বলেন যে, জিযিয়া ও খারাজ বলতে শুল্কই বোঝাত। কারণ, শুল্ক সম্বন্ধে ধারণা বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল।

ডেনেটের মত ওয়েলহ'সেনের মতের চাইতে অনেকটা উন্নত ধরনের। কিন্তু এর মধ্যেও কয়েকটি দোষ রয়ে গেছে। শুল্ক অর্থে জিযিয়া ও খারাজ শব্দটি বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হত—(ওয়েলহ'সেন ও বেকারের মত অনুসরণ করে) কিন্তু সাধারণ কর হিসেবে যে ব্যবহৃত হত না—এ কথা কেবল আংশিক সত্য। আমরা আগেই বলেছি, খালিদের চুক্তিতে হিরার অধিবাসীদের ওপর গণনা-সাপেক্ষে জিযিয়া ধার্য হয়। (৭ হাজার লোকের মধ্যে ৬ হাজার লোকের ওপর ৬০ হাজার দিনার জিযিয়া ধার্য করা হয়)। এটা ছিল সামগ্রিক শুল্ক, ব্যক্তিগত কর নয়। শুল্ক কথাটি ব্যবহার করে ওয়েলহ'সেন ঠিকই করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এটা একটি শহরের অধিবাসীদের ওপর ধার্য করা হত। জিযিয়া ও খারাজ কর হিসেবে ব্যবহৃত হত মনে করে ডেনেট ভুল করেছেন। জিযিয়া কখনই সাধারণ কর হিসেবে গণ্য হত না। খারাজকেই শুধু কর হিসেবে মনে করা হত। কেননা, জিযিয়া আরব দেশে ও তার বাইরে মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই ব্যক্তিগত শুল্ক হিসেবে চালু হয়ে গিয়েছিল। ডেনেট নিজেই ক্রিস্টেনসেন ও লটের অনুমোদনক্রমে এ কথা স্বীকার করেছেন যে, মুসলিম বিজয়ের সময় সিরিয়া ও ইরাকে ব্যক্তিগত কর চালু ছিল। "জিযিয়া" কথাটি এসেছে আরামীয় "গাযিযা" থেকে। "জিযিয়া" ধার্য করার ব্যাপারে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীতে পার্থক্য নির্দেশ করা হত। আল-কোরআনে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে (৯ : ২৯)। তাই জিযিয়া ও খারাজকে এক জিনিস মনে করে জিযিয়াকে কর হিসেবে গণ্য করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

"খারাজ কথাটি (গ্রীক—"চোরেজিয়া") অবশ্য সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হত। আল-কোরআন বলেছে, বান্দার নেয়ামতস্বরূপ খারাজ ধার্য করা হয়। আবু ইউসুফ বালাযুরী, ইয়াকুবী ও ইবনে সাল্লাম "জমির খারাজ" এবং "মাথাপিছু বা কাঁধপিছু খারাজে"রই উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ কর ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু এসব আইনবিদের কেউই ভূমি-জিযিয়া কথাটাকে সাধারণ কর হিসেবে ব্যবহার করেন নি। কেবল ইবনে আবদুল হাকামই এভাবে ব্যবহার করেছেন। মিরসীয় প্রথাকেই বোধহয় তিনি অনুসরণ করতেন।

ইবনে সাল্লাম শুল্ককে "দারিওয়া" নামে অভিহিত করেন। কিন্তু শুল্ক কথাটি সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না। আবু ইউসুফ, এহিয়া ইবনে আদম ও কুদামা ইবনে জাফর প্রমুখ প্রাথমিক যুগের আইনবিদগণ অর্থনৈতিক ও শুল্কতত্ত্বের কেতাবগুলোর নাম রেখেছেন "কিতাবুল খারাজ"। কিন্তু কেউ এই শ্রেণীর কেতাবের নাম "কেতাবুল জিযিয়া" রাখেন নি। "লিসানুল আরব" ও "তাজউল আরুস" নামক বইতে ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও সাধারণ শুল্কের ('ইতাওয়া') উল্লেখ রয়েছে। কাজেই দেখা গেল, "খারাজই" সাধারণ কর হিসেবে ব্যবহৃত হত, জিযিয়া নয়।

যদিও প্রথমদিকে বিজিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানগণ কর্তৃক খারাজ ও জিযিয়া ধার্য করার মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল, তবু কিছুদিন পর বিশেষ করে খলিফা হযরত উমর বিন আবদুল আজিজের (মৃত্যু ঃ ৭২০ খৃস্টাব্দ) সময় থেকে এক্ষেত্রে সুসমঞ্জস নীতির প্রচলন হয়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনবিদদের 'জিযিয়া' ও 'খারাজ' সম্পর্কীয় বিধি-ব্যবস্থার এই সুসমঞ্জস রীতিকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

মনে রাখা উচিত যে, যেসব শহর শান্তিচুক্তির ফলে মুসলিম অধিকারে আসে, যেমন সাওয়াদের হিরা, উল্লাইস, আয়েন আততামর ও বনিকিয়া এবং সিরিয়ার দামেস্ক, বালাবাক, হিমস ও জেরুজালেম তাদেরকে শহরের জনসংখ্যার ওপর ভিত্তি করেই শুল্ক রূপে জিযিয়া দিতে হত। (যেমন হিরা শহরের অধিবাসীরা ৬ হাজার দিনার ও হামস শহরের অধিবাসীগণ ১ লাখ ৭০ হাজার দিনার দেয়)। প্রথমদিকে এ শুল্ক সাধারণ জিযিয়ার নিয়ম অনুসারেই ধার্য করা হত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেক জিম্মীকে ব্যক্তিগতভাবেই জিযিয়া দিতে হত। কারণ, প্রত্যেক শহরে জিম্মীদের যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তারা জিযিয়া থেকে রেহাই পেয়ে থাকে। ফলে অবশিষ্ট জিম্মীদের তখন জিযিয়ার সবটুকুই দিতে হত। এতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠল। কিন্তু স্থানীয় শাসকগণ এ ব্যাপারে কোন পরিবর্তন সাধন করেন নি। পরিশেষে দ্বিতীয় উমর এক ও অভিন্ন রীতির প্রবর্তন করেন ফলে আল-কোরআনের নীতি অনুসারে (সুস্থ ও সবল জিম্মীকে) ব্যক্তিগতভাবে মাথাপিছু জিযিয়া দিতে হত। এ প্রসঙ্গে ইরাকের নতুন

আবাসভূমি নাজরানিয়াবাসী খৃস্টানগণের কথা বলা যেতে পারে। বালাযুরীর বর্ণনায় জানা যায় যে, মৃত্যু ও নবধর্মে দীক্ষার ফলে জিম্মীদের সংখ্যা অনেক কমে আসে; তবু মা'বিয়া প্রমুখ শাসনকর্তাগণ কিছুতেই শুল্কের পরিমাণ কমাতে রাজি হন নি। খলিফা দ্বিতীয় উমর হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সঙ্গে সম্পন্ন জিম্মীদের চুক্তির পূর্ণব্যাখা করেন। ফলে সামগ্রিক শুল্ক মাথাপিছু হারে পর্যবসিত হল। মাথাগণতি (সবার ওপরে নয়) জিযিয়ার সুসমঞ্জস রীতির মাধ্যমেই এ বিবর্তন সম্ভব হল।

খলিফা প্রথম উমরও (রাঃ) অনুরূপভাবে যুদ্ধে বিজিত অঞ্চল ও চুক্তির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে অর্জিত অঞ্চল সম্পর্কে একই বিধান দেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্জিত অঞ্চলকে সামগ্রিক সম্পদ বলা হয় এবং যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলকে বলা হয়, 'গানিমা'। প্রথম অঞ্চল রাষ্ট্রীয় ভূমি। কিন্তু গানিমা হিসেবে যে সব অঞ্চল লাভ করা হয়, তা হযরত উমরের (রাঃ) আমলে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সময়ে বানু-কুরায়যার গানিমাভুক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে বণ্টন করে দেয়া হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এ গানিমা রাষ্ট্রীয় সম্পদরূপেও গণ্য হয়েছে। তবে খারাজের মত এখানেও অধিবাসীদের মধ্যে জমি বণ্টন করে ফসলের অংশ রাষ্ট্রকে দেবার রীতি ছিল। হযরত উমর (রাঃ) এ জমির হস্তান্তর নিষিদ্ধ করেছেন ও দু'রকমের জমির ওপর খারাজ বা ভূমি-কর ধার্য করেছেন। এটাই সাধারণ নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় এবং পরবর্তী যুগের খলিফাগণও এ রীতি অনুসরণ করেন। যদি কোন জিম্মী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তবে তার প্রতি ধার্য জিযিয়া থেকে তিনি রেহাই পাবেন। কিন্তু খারাজ বা ভূমি-কর তাকে দিতেই হবে। কোন জিম্মী যদি উত্তরাধিকারসূত্রে জমি-জমা পেয়ে থাকে বা তার কাছে জমি বিক্রয় করা হয়ে থাকে তবে রাষ্ট্রের খারাজ তাকেও মিটিয়ে দিতে হত। কোন কোন ব্যক্তিকে খারাজ থেকে রেহাই দেয়া হয়, আবার কোন কোন ব্যক্তিকে খারাজ দিতে হত। এ ব্যাপারে খলিফার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বা বিশেষ এখতিয়ার ছিল। তিনি খারাজ তুলে দিয়ে আরবীয় রীতি অনুযায়ী "উশর" (ফসলের $\frac{১}{১০}$) বসাতে অথবা খারাজও ধার্য করতে পারেন। খারাজ তুলে দিয়ে "উশর" বসানোর রীতি প্রথম উমরের (রাঃ) আমলে মোটেই প্রচলিত ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ) ও পরবর্তী খলিফাদের আমলে এটাই সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়ায়।

খালিদ ও আবু উবায়দার চুক্তি থেকে ভূমি-কর বা জিযিয়া ধার্য করার পদ্ধতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নযির পাওয়া যায় না। আবু ইউসুফ, বালাযুরী, এহিয়া ইবনে আদম ও অন্যান্য আইনবিদের লেখা থেকে জানা যায় যে, নারী শিশু, দরিদ্র ব্যক্তি, অন্ধ, অসুস্থ, উন্মাদ, বেকার ও দরিদ্র ধর্মযাজক ভিন্ন সব জিম্মীকেই জিযিয়া ছাড়া খারাজও দিতে হত। আবু ইউসুফের বর্ণনায় জানা যায় যে, প্রত্যেক জিম্মীকে তার সম্পদ ও আয় অনুযায়ী শুল্ক দান করতে হত। ইরাকে এ শুল্ককে জিম্মীদের অবস্থা অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা হয়ঃ বাৎসরিক যথাক্রমে ৪৮, ২৪ ও ১২ দিরহাম।

সিরিয়ায় জিযিয়ার অন্য হার বিদ্যমান ছিল। প্রতি জারিবের ওপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল কর হিসেবে দেবার পরও এক দিনার করে প্রদানের ব্যবস্থা কোন কোন চুক্তিতে বিধিবদ্ধ হয়।

হযরত উমরের সনদ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, খলিফা হযরত প্রথম উমর (রাঃ) জিম্মীদের মর্যাদা সম্পর্কে সুসামঞ্জস ও সর্বাঙ্গীন কোন নিয়ম নির্দেশ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে, আংশিকভাবে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) কার্যাবলী এবং আংশিকভাবে হযরত উমরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনামা ও পরবর্তী খলিফাদের কার্যধারার ওপর ভিত্তি করেই এসব নিয়ম-কানুন ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে। তবু আইনবিদ ও ধর্মবেত্তাগণের কাছ থেকে কতকগুলো দলিল পাওয়া গেছে। এসব দলিলে বিভিন্ন কানুন ও নীতির বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলো নাকি হযরত উমর জিম্মীদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নিরূপণের জন্যে জারী করেন। একেই হযরত উমরের সনদ বলা হয়। সিরিয়ার খৃস্টানগণ আবু উবায়দার নিকট যে দরখাস্ত পেশ করেন, হযরত উমর তা অনুমোদন করেন। এর বিবরণ নীচে দেয়া হল ঃ

"আপনারা যখন আমাদের দেশে আসেন, তখন আমরা আপনাদের নিকট থেকে জীবনের নিরাপত্তা এবং এখানকার অধিবাসীগণ ধর্মের স্বাধীনতা পেতে চায়। আর আমরা এসব বিষয়গুলো মেনে নিয়েছি—দামেস্ক ও এর চারপাশে কোন চার্চ, ধর্মস্থান বা ধর্মযাজকালয় নির্মাণ করা হবে না। যে সব চার্চ বিনষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলো আমরা সংস্কার করব না। মুসলিম বাসস্থান অঞ্চলেও এই একই রীতি অনুসৃত হবে। দিনে বা রাত্রিকালে চার্চগুলোতে সাময়িকভাবে অপেক্ষা করার অধিকার মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া চলবে না। পরিব্রাজক ও মুসাফেরের জন্যে দরজা সর্বক্ষণ খোলা থাকবে। চার্চে বা বাড়ীতে কোন গুপ্তচরকে আমরা আশ্রয় দেব না। মুসলিমদের প্রতি বিশ্বাসঘাতককে আমরা লুকিয়ে রাখব না। মৃদুভাবে আমরা চার্চে 'নাকুস' বাজাব। সেখানে আমরা ক্রুশ ঝোলাব না এবং উচ্চস্বরে উপাসনা বা ধর্ম-সঙ্গীত গাইব না, মিছিল করে আমরা ক্রুশ বা বাইবেল নিয়ে যেতে পারব না; ইস্টার বা বিশেষ রবিবারে আমরা মিছিল বার করতে পারব না; মৃতদেহের ওপর উচ্চস্বরে কাঁদা চলবে না বা মুসলিম-বাজারে আগুনসহ মৃতদেহ নিয়ে যেতে পারব না; মুসলিমদের কবরের নিকট আমরা কাউকে কবর দেব না; মুসলমানদের সমাবেশে মদ বিক্রয় বা পৌত্তলিকতার বাহ্যিক প্রদর্শনও নিষিদ্ধ। আমাদের ধর্মে মুসলিমদের প্রলুব্ধ করতে বা আহ্বান করতে পারব না; মুসলমানদের দাসদের আমরা রাখতে পারব না; আমাদের কোন আত্মীয়-

স্বজনকে আমরা ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারব না; আমাদের ধর্মের কোন প্রচার আমরা করব না; মুসলমানদের মত আমরা কালানসুয়া, পাগড়ী, জুতা ব্যবহার করতে পারব না; তাঁদের মত চুল ছাঁটতে বা অশ্বে আরোহণ করতে পারব না; তাঁদের ভাষা আমরা ব্যবহার করতে পারব না; তাঁদের নামের মত আমরা নাম গ্রহণ করতে পারব না; আমাদের সামনের চুল কাটতে হবে ও বিভক্ত করে রাখতে হবে; কোমরে যুননার ঝোলাতে হবে; আমাদের সিলমোহরে আরবী অক্ষর লেখা যাবে না; ঘোড়ার জিন ব্যবহার করা চলবে না; আমরা বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত্র রাখতে পারব না এবং তরবারী বহন করতে পারব না; মুসলমানদের সমাবেশে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে; তাদের রাস্তা দেখিয়ে দিতে হবে; তারা যখন চাইবেন, জনসভায় তাদের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াতে হবে; আমাদের বাড়ীঘর তাদের বাড়ীঘরের চাইতে উঁচু করে তৈরী করা চলবে না; আমাদের ছেলে-মেয়েদের আমরা কোরআন শেখাতে পারব না; ব্যবসায় ভিন্ন আর কোন ব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে শরীক হতে পারব না; আমাদের চলতি প্রথা-মত প্রত্যেকটি মুসলিম পরিব্রাজককে তিনদিন আপ্যায়িত করব ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করব। আমরা কোন মুসলমানকে অবমাননা করব না। যে ব্যক্তি মুসলমানকে আঘাত করবে, তার অধিকার ও দাবী-দাওয়া নস্যাৎ হয়ে যাবে।"

ওপরেরটিই একমাত্র দলিল নয়; ছোট-বড় এমনি ধারার আরো অনেক দলিল আছে। অবশ্য, এগুলো মূল ধারার দিক দিয়ে একই রকম। একথা প্রমাণ করার দরকার নেই যে, হযরত উমরের তথাকথিত এ সনদটি তাঁর সময়কার নয়। পরবর্তী যুগেই এটি বিধিবদ্ধ হয়। কারণ, এর মধ্যে যে সব বাধ্যবাধকতা আছে, তা সেনাপতিদের প্রতি হযরত উমর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনামার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। অনুদারতা ও নিপীড়নই এ ধারাগুলোর ভিত্তি। হযরত উমরের উদারতার নযির এর মধ্যে পাওয়া যায় না।

অবশ্য, সনদটির আইনগত গুরুত্ব সমধিক। কারণ, ইসলামের প্রথম যুগের আইনবিদগণ এর ওপর ভিত্তি করেই আইনের বিধান দিয়েছেন। সর্বসম্মতিক্রমে এটা জিম্মীদের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নির্ণয়ের নির্দিষ্ট বিধি-ব্যবস্থা বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এর আইনগত বৈধতার ফলে ঐতিহাসিক প্রামাণ্যের প্রশ্নটি আর কেউ তোলে না।

জিম্মীদের অধিকার ও দায়িত্ব

ইসলামের অভ্যুত্থানের সময় থেকে আজ অবধি জিম্মীদের যে সব অধিকার, দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি গড়ে উঠেছে, তা এবার সংক্ষিপ্তরূপে দেখান যেতে পারে। এগুলোই ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক নির্ণয় করে এসেছে।

মনে রাখা উচিত যে, এর কোন কোন নীতি কোরআনের বিধান থেকে নেয়া হয়েছে; আবার কোনটি খলিফা প্রথম উমরের সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী খলিফাদের দেয়া নির্দেশনামা থেকে এসেছে। ইসলামে দাখিলের অসম্মতির কতকগুলো নিদর্শন, যেমন গিয়ার, যুন্নার ও রঙীন কালানসুয়া পরিধান করা দ্বিতীয় উমরের সময় থেকে চালু হয়। আল-মুতাওয়াক্কীলের সময়ে এগুলোর ব্যবহার অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু সম্ভবতঃ গণদাবীর ফলে তিনি এগুলো আবার পুনঃপ্রবর্তন করার প্রয়োজন মনে করেন। অন্যান্য খলিফাদের আমলে বিশেষ করে ফাতেমী খলিফা আল-হাকিম-বি আমরুল্লাহ্'র সময়ে আরও কতগুলো নতুন বাধ্যবাধকতা প্রবর্তন করা হয়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, আইনের বিধি অনুসারে মুসলিম শাসককে জিম্মীদের জীবন, ধনসম্পদ, চার্চ, ক্রুশ রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার অধিকার দিতে হবে। অবশ্য তারা নতুন চার্চ নির্মাণ করতে পারবে না (তবে তারা পুরানো চার্চগুলো সংস্কার করতে পারবে বা নতুন করে নির্মাণ করতে পারবে) এবং তাদের ক্রুশ বাইরে আনতে পারবে না বা উচ্চস্বরে উপাসনা করতে বা গীর্জার ঘণ্টা বাজাতে পারবে না। কোন জিম্মীকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা চলবে না এবং পবিত্রভূমি (হারাম) ভিন্ন দারুল ইসলামে নির্বিবাদে পরিভ্রমণ করতে দিতে হবে।

আইনবিদ ও ধর্মবেত্তাগণ সংক্ষেপে বারোটি কার্যক্রম পেশ করেছেন। এগুলোকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ছটি অতি প্রয়োজনীয়। এগুলো লঙ্ঘন করলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়; পরের ছটি পালন করা প্রয়োজনীয়। এগুলো লঙ্ঘন করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়। নিম্নলিখিত ছটি নিয়ম-কানুন অবশ্য কর্তব্য, অন্যগুলো প্রয়োজনীয় ঃ

১। প্রত্যেক পুরুষ, বয়স্ক, স্বাধীন ও সুস্থ জিম্মী জিযিয়া দিতে বাধ্য থাকবে। তার পরিমাণ অবশ্য মুসলিম শাসক কর্তৃক নির্ধারিত হবে। মালিকী আইনবিদেরা বলেন যে, ওয়ালী বা শাসকগণ জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবেন। হানাফী মতপন্থীগণ একে তিনভাগে ভাগ করেছেন ঃ

(ক) স্বচ্ছল ব্যক্তিদের ৪৮ দিরহাম করে জিযিয়া দিতে হবে, (খ) গরীবগণ ১২ দিরহাম এবং (গ) যারা এর মাঝামাঝি, তারা ২৪ দিরহাম করে দেবে। শাফেয়ী আইনবেত্তাগণ বলেন যে, কমপক্ষে জিযিয়া মাথাপিছু এক দিনার হওয়া উচিত। যদি জিম্মী তার ধর্ম পরিত্যাগ করে, তবে তার ওপর থেকে জিযিয়া তুলে নেয়া হবে। যে সব জিম্মীর জমি আছে, তাদের খারাজ দান করতে হবে। মুসলমান হলে জিযিয়া দিতে হয় না। কিন্তু মুসলমান হলেও ভূমি-কর দিতে হবে। অবশ্য ইমাম জিম্মীকে এ কর থেকে রেহাই দিতে পারেন।

হানাফী মতে জিযিয়া না দিলেও চুক্তি ভঙ্গ হয় না। কারণ, এর মধ্যে সব চাইতে প্রয়োজনীয় বিষয় হল জিম্মী হওয়ার ব্যাপারটি—জিযিয়া প্রদান করা নয়। জিম্মী হওয়ার ফলেই জিযিয়া দিতে হয়। সেই কারণে আইনবিদগণ জিম্মীদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করার ব্যাপারে উদারতা অবলম্বন করতে বলেছেন। আবু ইউসুফ বলেন, 'জিযিয়া না দিলে তাদের প্রহার করা উচিত নয় অথবা রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত নয়। জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত তাদের কয়েদ করা উচিত।' জিম্মীদের জেহাদে শরীক হওয়ার যখন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, তখন জিযিয়াকে সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ও মুসলিম শাসনে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারের বিনিময়ে প্রদত্ত শুল্কও বলা যেতে পারে।

২। জিম্মীগণ ইসলাম ধর্মকে সমালোচনা করবে না, মুসলিম অনুষ্ঠানাদির অবমাননা করবে না।

৩। তারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বা আল-কোরআনের নিন্দাবাদ বা অসম্মান করবে না।

৪। তারা মুসলমানের জীবন বা ধনসম্পদ বিনষ্ট করবে না; কিংবা তার ধর্ম-বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধরাতে কিংবা তাকে ধর্ম ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ করবে না। কারণ, একে অবিশ্বাস প্রসারের অপচেষ্টা বলে গণ্য করা হবে।

৫। জিম্মী মুসলিম মহিলাদের বিবাহ করতে পারবে না কিংবা তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারবে না। (মুসলমানগণ অবশ্য ম্যাজিয়ান বা পৌত্তলিক ভিন্ন কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করতে পারে)।

৬। তারা শত্রুপক্ষকে সাহায্য করতে পারবে না; অথবা হারবীকে (বিদেশী) সাহায্য করতে পারবে না বা গুপ্তচর নিয়োগ করতে পারবে না। তারা ইসলামী রাষ্ট্রের গোপনীয় তথ্য শত্রুপক্ষের নিকট বলতে পারবে না কিংবা তাদের কোন সংবাদাদি সরবরাহ করতে পারবে না।

৭। মুসলমানদের সঙ্গে তারা ব্যবসায়ের সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার পেলেও তারা মদ বিক্রয় বা সুদের ব্যবসায় করতে পারবে না; কিংবা প্রকাশ্যে তারা মদ ও শূকরের গোশত খেতে পারবে না।

৮। তারা বিশেষ কতকগুলো পোশাক পরিধান করবে, যেমন গিয়ার পোশাকে একটা হলদে বন্ধনী; যুন্নার (girdle) এবং মাথার লম্বা ও রঙীন কালানসুয়া বা শিরস্ত্রাণ।

৯। তারা ঘোড়ায় চড়তে পারবে না বা অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে পারবে না। অবশ্য গাধা ও খচ্চরের পিঠে তারা চড়তে পারবে। তাদের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন হিসেবে জিনের ওপর তাদেরকে একটা কাষ্ঠ-গোলক বেঁধে দিতে হবে।

১০। তাদের বাড়ী-ঘর মুসলমানদের চাইতে উঁচু হবে না—নীচু হলেই ভাল।

১১। তারা তাদের গীর্জার ঘণ্টা জোরে বাজাবে না বা উচ্চস্বরে উপাসনা করবে না।

১২। মৃতদেহ নিয়ে তারা চীৎকার করে কাঁদবে না; মুসলিম জনপদ থেকে দূরে তাদের কবরস্থ করতে হবে।

এর ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়। এরা নিজের নিজের ধর্ম পালন করার অধিকার ভোগ করত নিজস্ব ধর্মীয় নেতার অধীনে এবং নিজেদেরকে পরিচালিত করত। ধর্মীয় নেতারা আবার মুসলিম শাসকদের নিকট দায়ী থাকতেন। কাজেই জিম্মীকে দুটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য দেখাতে হত। তার নিজের সমাজ ও যে বৃহত্তর সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তার সমাজের অস্তিত্ব ছিল। তার নিজের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত ছিল; কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তার ওপর কতকগুলো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হত, যেমন সাক্ষ্যদান, ফৌজদারী আইন ও বিবাহ। সে মুসলমানদের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করতে পারবে না। যদি তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করত, তবে হয় তাকেও নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে হত, নতুবা স্ত্রীকে তালাক দিতে হত। গানিমাতেও তার কোন অধিকার ছিল না। যুদ্ধে যোগদান করলে তাকে বেতন দেয়া হত।

কিতাবীদের মধ্যে বানু-তাগলীবের আরব খৃস্টানগণই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। তারা নিজেদের জিম্মী বলতে চাইতেন না এবং জিযিয়াও দিতেন না। খলিফা প্রথম উমর অমুসলিম থাকা অবস্থায় তাদের কাছ থেকে জিযিয়া দাবী করেন। কিন্তু তারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করেন। তারা বলেন যে, তারা আরব দেশীয় এবং এদিক থেকে নিজের দেশের আরবীয়দের কাছ থেকে ভিন্ন ব্যবহার তারা প্রত্যাশা করেন না।

কিন্তু হযরত উমর তাদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তারা দারুল ইসলাম থেকে হিজরত করার হুমকী দেখায়। এমতাবস্থায় তখন হযরত ওমর বানু-তাগলীব গোত্রের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উবায়দা ইবনে আন-নুমানের উপদেশক্রমে জিযিয়া আদায় না করার সিদ্ধান্ত করেন। অবশ্য, এই শর্ত আরোপ করেন যে, তাদের দ্বিগুণ সদকা দিতে হবে এবং তাদের ছেলে-মেয়েদের খৃস্টধর্মে দীক্ষাদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

গাসানের খৃস্টান আরব বাদশা জাবালা ইবনে আল-আইহামের বিষয়টি অন্যভাবে মীমাংসিত হয়। মুসলিম বিজয়ের পর জাবালা তাঁর স্বদেশে ফিরে আসেন; কিন্তু এর অল্পদিন পরই তাকে জিযিয়া দিতে বলা হয়। তিনি এই বলে জিযিয়া দিতে অস্বীকার করেন যে, তিনি একজন আরব; এবং পরে তিনি বাইজান্টীয় ভূখণ্ডে চলে যান। অন্য একটি সূত্রে জাবালার হিজরতের অন্য কারণ জানতে পারা যায়। বালাযুরী বলেন,

জাবালাকে জনৈক মুসলমান অপদস্থ করে। খলিফা উমরের কাছে যখন বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়, তখন খলিফার বিচার তাঁর মনপুত হয় নি। ফলে তিনি দারুল ইসলাম ছেড়ে চলে যান। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে একথা স্পষ্টভাবে জানতে পারা গেছে যে, খলিফা উমর (রাঃ) বানু-তাগলীবের মত জাবালাকে বিশেষ সুবিধা দান করতে চান নি।

উপসংহার

আইনবিদদের ব্যাখ্যা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের অবস্থা অনেকখানি ভিন্ন ছিল। যেহেতু আইন যথোচিত ও প্রয়োজনীয় অবস্থার মধ্যে কেবল পার্থক্য নির্দেশ করে, তাই উদারতার মাত্রা শাসক ও তাদের অধীনস্থদের মর্জির ওপরই নির্ভর করত। এমনও নযির আছে যে, উভয়পক্ষেই আইন এড়িয়ে গেছে এবং অমান্যও করেছে (জিম্মীদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, জিযিয়া প্রদান ও গীর্জা ও সিনাগগ নির্মাণের ব্যাপারে)। খলিফা আল-মনসুর সরকারী চাকুরী থেকে সব জিম্মীকে অপসারিত করেন। আর আল-মতাওয়াক্কীল তাদের প্রতি খুব খড়গহস্ত ছিলেন। তিনি মুসলমানদের দেশ জয়ের পরে নির্মিত সব গীর্জা ও সিনাগগস বিনষ্ট করার আদেশ দেন। জিম্মীরাও অধিকতর সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্যে ভিত্তিহীন দাবী-দাওয়া জানাতে থাকে। সিনাই পর্বতের খৃস্টানদের বিষয়টি এর একটি নযির। বর্ণিত আছে যে, একটি গীর্জা দখলে রাখার জন্য হযরতের সঙ্গে নাকি ওখানকার জিম্মীদের ২য় হিজরীতে একটি চুক্তি হয় এবং এজন্য জিম্মীগণ জাল দলিল পেশ করে। এর ফলে কোন কোন মুসলিম শাসনকর্তা এতদূর বলেছেন যে, প্রথম দিকে জিম্মীদের সঙ্গে যে সব চুক্তি হয়েছে, তা এখন অকেজো হয়ে গিয়েছে। তাই এগুলো নষ্ট করে দেয়া উচিত। আল-গাজ্জালী প্রমুখ অনেক আইনবিদ ও ধর্মবেত্তা অবিশ্বাসের স্থায়িত্বের দরুন জিম্মীদের প্রতি কিছুটা কঠোর ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন।

এসব ব্যবস্থা ও কার্যাবলী অনেক জিম্মীর পক্ষে কঠোর হলেও একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সত্যিকারের ঔদার্যমূলক এবং যে সব কিতাবী তাদের কিতাবের নীতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে চাইতেন, এ আইন তাদের রক্ষাকবচ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। অনুদারতার প্রভাব যদিও কখনো কখনো বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে থাকে, তবে তার গোড়ায় ছিল ক্রমবর্ধমান পীড়নমূলক শাসনের লক্ষণ, যে জন্য অমুসলিমের মতই মুসলমান জনসাধারণকেও কম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় নি।

কোন কোন খলিফা ও শাসনকর্তা যেমন কঠোর ও নিষ্ঠুর ছিলেন, তেমনি আবার অনেক খলিফা উদারতা ও অমায়িক ব্যবহারের প্রতীক ছিলেন। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় আল-মুকতাফীর (খৃস্টাব্দ ১১৩৬-১১৬০) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি নিস্টোরীয় পাদ্রীদের

যে সনদ দান করেন, তা এই উদারতার সুষ্ঠু প্রমাণ। এ. মিংগানা কর্তৃক সম্পাদিত "A Charter of Protection granted to the Nestorian Church in A.D. 1138 by Muktafi II" Man-Chester, 1925, P. P, 3-7.) নামক ঐতিহাসিক সনদের বিবরণে এরই নযির মেলে। বিভ্রান্ত শাসনাধীনে অনেক সময় জিম্মীগণ নিষ্পেষিত হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থাও খুব ভাল ছিল না। কোন একটি বিশেষ শাসনকালে বা যুগে জিম্মীদের প্রতি অত্যাচারের মাত্রার গতিপথ নির্দেশ করে।

মুসলিম শাসনাধীনে জিম্মীদের প্রতি ব্যবহারের বিষয়টি বিচার করতে গেলে খামখেয়ালী খলিফাদের ও মুসলিমদের হাতে জিম্মীদের দুঃখ-কষ্টের নযির নিলে চলবে না; এ বিচার করতে গেলে আইনের সাধারণ উদারতার নীতি, প্রত্যেক যুগের প্রচলিত অবস্থা ও পরিবেশ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার কথাও মনে রাখতে হবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়
সন্ধি

সন্ধি-চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা

ইসলাম ও অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোর সাধারণ সম্পর্ক বিরোধগত। তবু প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ করে কোন ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের পরাজয়ের ফলে শত্রু-পক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বিরোধী নয়। আল্লাহ'র বিধানে অমুসলিমদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া অনুমোদন করা হয়েছে ঃ

"পবিত্র মসজিদে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, তারা ভিন্ন কি করে তোমরা মুশরিক এবং আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করতে পার? যে পর্যন্ত তারা সততার সঙ্গে কাজ করে, তোমরাও সততার সাথে চল। যারা খোদা-ভীরু, কেবল তাদেরই আল্লাহ ভালোবাসেন" (৯ ঃ ৬)।

প্রচলিত ব্যবহার-বিধি আল-কোরআনের এই নির্দেশেরই সমর্থন জানিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মক্কাবাসীদের সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করে এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এ চুক্তিটির শর্তাদি ও কার্যকালের মাধ্যমে মুসলিম আইনবিদগণ পরবর্তী যুক্তিগুলোর দিক-নির্দেশ করেছেন। একটি হাদিসে রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ "বাইজান্টীয়গণ তোমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে।" কাজেই আল-কোরআন ও হাদিস অনুসারে আইনবিদগণ এ সর্বসম্মত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলিম-স্বার্থ রক্ষিত হলে শত্রু পক্ষের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করা বিধিসম্মত এবং এ চুক্তির ধারাগুলো পালন করতেও মুসলমানরা বাধ্য থাকবেন। প্রাথমিক খলিফাদের কার্যধারা ও আইনবিদদের সর্বসম্মত অভিমত বা ইজমার ফলে চুক্তি সম্পাদন শরিয়তের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়েছে।

রাসূলে আকরমের (সঃ) হাতেই চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা ছিল এবং পরবর্তীকালে এ ক্ষমতা তাঁর খলিফাদের হাতে গিয়ে বর্তায়। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এ ক্ষমতা প্রায়ই যুদ্ধরত সেনাপতিদের দেয়া হত। শত্রুপক্ষ যদি ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইত, তবে যুদ্ধরত সেনাপতিকে শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দেয়া হত। রাসূল (সঃ) ও তাঁর খলিফাগণ ক্ষতিকর চুক্তি বা ব্যবস্থা নাকচ করে দেবার ক্ষমতা নিজেদের হাতেই রাখতেন। তাঁদের অনুমতি না নিয়ে এসব চুক্তি মুসলিম সমাজে কার্যকরী করা যেত না।

সন্ধির আইনগত প্রকৃতি

সন্ধি ('মুহাদানা' বা 'মুওয়াদা') হল এক রকমের "আকদ" বা বন্ধন; চুক্তিতে কোন একটি বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করার ফলে তার আইনগত ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যায়। মুসলিম আইনের 'আকদ' (চুক্তি) পশ্চিমী আইনের চুক্তির (contract) চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'আকদে'র বাহ্যিক আকার ও পদ্ধতি যাই হোক না কেন, ঐক্যমত বা মনের মিলকেই মৌলিক জিনিস বলে মনে করা হয়। এক দল প্রস্তাব ('ইজাব') করেন আর অপর দল তা গ্রহণ ('কবুল') করেন, ফলে 'মনের সমন্বয়' সম্ভব হয়। চুলচেরা বিচারে এতে পারস্পরিক সুবিধা থাকুক আর নাই থাকুক, আইনের চোখে চুক্তিটি বৈধ ও কার্যকরী বলে সাব্যস্ত হবে।

আইনগ্রন্থ "মাজাল্লা"তে চুক্তির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ "কোন বিষয়ে দুটি দল যখন করণীয় পন্থা স্থির করে তা' পালনের জন্য বাধ্যবাধকতার আওতায় পরস্পরকে আবদ্ধ করে, তার নামই চুক্তি। প্রস্তাব ও সম্মতির সমন্বয়েই এর সৃষ্টি।"

তাই ইসলামে চুক্তি আসলে মতৈক্য ও স্বীকৃতি থেকেই জন্ম নেয়; বিশেষ একটি বাহ্যিক রূপ বা পদ্ধতি পালন করার প্রয়োজন এখানে নেই। চুক্তির ধারাগুলো নির্ধারিত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চুক্তি উভয়পক্ষের ওপর প্রযোজ্য হয়। চুক্তি লেখা, দস্তখত করা ও তারিখ দেয়া (কোন কোন ক্ষেত্রে সাক্ষ্য রাখা) আইনের দিক থেকে অপরিহার্য নয়। শুধু সমঝোতা নির্দেশ করার জন্য এবং চুক্তির শর্ত ও মেয়াদ সম্পর্কীয় দলিল-পত্র রাখবার জন্যই চুক্তিটি লিখিতভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজন হয়।

চুক্তি-সম্পাদন করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে করে এর শর্ত ও ধারাগুলো বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিপালিত হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। আল-কোরআনে মুসলিমকে 'ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা রাখবার জন্য' আহ্বান করা হয়েছে (১৬ ঃ ৯৩)। আরও বলা হয়েছে "মেয়াদের শেষ দিন অবধি চুক্তিটি পালন কর (৯ ঃ ৪)।" তাই চুক্তির অবশ্য পালনীয় মৌলিক প্রকৃতি "আকদের" অন্তর্নিহিত অবস্থা প্রকাশ করে। সব মুসলিম আইনবিদ ও ধর্মবেত্তাই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন। ইসলাম ইমামকে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে চুক্তির ব্যাপারে সব দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছে। শত্রুপক্ষের আক্রমণ আসন্ন হয়ে পড়লে বা তারা চুক্তি অমান্য করলে বা চুক্তিটি নাকচ করে দিলে অবশ্য চুক্তির ধারাগুলো পালন না করলেও চলবে। অবশ্য এ অবস্থায় চুক্তির পরিসমাপ্তির কথা তাদের জানিয়ে দিতে হবে।

মুসলিম চুক্তির বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পূর্বে বিশেষভাবে নির্বাচিত বা প্রতিনিধিত্বমূলক সন্ধি-চুক্তির বিবরণ বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিপত্রগুলো ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। প্রত্যেকটি

সন্ধির বিস্তারিত ইতিহাস বয়ান করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক সন্ধিপত্রের মূল দলিল ও তার সাধারণ পটভূমি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম সন্ধি-চুক্তি

আল-কোরআন থেকে যেমন চুক্তি পালনের নীতি এসেছে, তেমনি হযরতের কার্যধারাও কতকগুলো দিক-নির্দেশক বিধি-ব্যবস্থার পত্তন করেছে। এগুলোর ভিত্তিতেই মুসলিম ও অমুসলিম কর্তৃপক্ষের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাজনৈতিক লক্ষ্য ও পরিবেশন পরিপ্রেক্ষিতে হযরত (সঃ) বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদন করেন। তাঁর খলিফাগণ এগুলো আদর্শ চুক্তি হিসেবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শান্তিচুক্তি (যা পরে মদিনার ইহুদীরা মেনে নেন এবং এটা মদিনার অধিবাসীদের পক্ষে সনদের কাজ করে) থেকে শুরু করে হুদায়বিয়ার সন্ধি (যা মদিনার মুসলিম ও মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে অস্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপন করে) পর্যন্ত তিনি নানা ধরনের চুক্তি সম্পাদন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইহুদী ও খৃস্টানদেরও সনদ প্রদান করেন। ফলে তারা মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করেন।

হিজরতের পর মদিনার গোত্রগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করাই ছিল হযরতের প্রথম সন্ধির উদ্দেশ্য। ইবনে হিশামের "সিরাতে" এর মূল দলিলটি পাওয়া যায়; ওয়াকিদী'র "মাগাযী"তেও আংশিকভাবে এ সন্ধিচুক্তিটির বিবরণ পাওয়া গেছে। সন্ধিচুক্তিটির দলিলের প্রথম অংশে মদিনার বিভিন্ন গোত্রের-পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর চুক্তিটির পরবর্তী অংশে রয়েছে ইহুদীদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির বিবরণ। চুক্তির তারিখ সম্বন্ধে ইবনে হিশাম কোন কিছুই বলেননি; কিন্তু এটা যে হিজরী ১লা সন থেকে দ্বিতীয় সনের মাঝামাঝি কোন সময়ে সম্পাদিত হয় (খৃস্টাব্দ ৬২৩-৬২৪) তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, দ্বিতীয় হিজরীতেই (৬২৪ খৃস্টাব্দে) আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকগণ যুদ্ধক্ষেত্রে মক্কাবাসীদের মোকাবেলা করে।

সন্ধি-চুক্তির সনদের দলিল

আল্লাহর রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক) মোহাজের ও আনসারদের নিয়ে ইহুদীদের সাথে সন্ধির উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত সনদটি লিপিবদ্ধ করেন। এই সনদের শর্তের ভিত্তিতে ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে ইহুদীগণকে তাদের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের অবাধ অধিকার দেয়া হয়; আর তাদের নিজেদের সম্পত্তির ভোগ-দখলের অধিকার এবং এর রক্ষা-কবচেরও নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে এতে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের ওপর কতকগুলো বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা হয়। নীচে চুক্তির সনদের বিবরণ দেয়া হল ঃ

মুসলিম ও ইহুদীগণ চুক্তিবদ্ধ একটি রাজনৈতিক জাতি

"পরম করুণাময় ও কৃপানিধান মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। একদিকে কোরেশ বংশীয় ও ইয়াছরিবের (মদিনার) মুমিন মুসলমানগণ এবং আর যারা তাদের অনুসরণকারী ও তাদের সহ-সংগ্রামী, আর অন্যদিকে মদিনার ইহুদী সম্প্রদায় এবং আর যারা তাদের অনুসরণকারী ও তাদের সহিত একত্রে যুদ্ধ করে—তাদের সকলের প্রতি এটা হচ্ছে, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের (সঃ) পক্ষ হতে প্রদত্ত সনদ। নিশ্চয়ই তারা অন্যান্য সবকিছু হতে স্বতন্ত্রভাবে একটি সমাজ (রাজনৈতিক দিক হতে) গঠন করবে।

"কোরেশ বংশীয় মদিনার বিশ্বাসী মুসলমানগণ এবং অন্য যারা তাদের অনুসরণ করে, তাদের সাথে যোগ দেয় ও তাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে সংগ্রাম করে; এটা হচ্ছে, তাদের সবার প্রতি তাদের নবী আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের (সঃ) সনদ। নিশ্চয়ই তারা অন্যান্য সম্প্রদায় হতে পৃথকভাবে একটি উম্মা (সমাজ) গঠন করবে।

"কোরেশ বংশীয় মোহাজেরগণ একই সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বসবাস করবে এবং বর্তমানে তারা যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই থাকবে। আর তারা ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তি-মূল্য (বা ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে।

ইহুদীদের অধিকার

"আউফ বংশীয়গণ পূর্বের মতই একই সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বসবাস করবে এবং যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায়ই থাকবে। আর তাদের প্রত্যেক গোত্রই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিমূল্য (বা ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে।

"সায়দাহ বংশীয়গণও বর্তমানের মত একই অবস্থায় থাকবে। আর তাদের প্রত্যেক গোত্রই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিমূল্য (বা ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে।

"আল-হারিস বংশীয়গণ বর্তমানের মত একই অবস্থায় থাকবে। আর তাদের প্রত্যেক গোত্রই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিমূল্য (বা ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে।

"জুসম বংশীয়গণও বর্তমানের মত একই অবস্থায় থাকবে। আর তাদের প্রত্যেক গোত্রই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিমূল্য (বা ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে।

"আল-নজর বংশীয়গণও বর্তমানের মত একই অবস্থায় থাকবে। আর তাদের প্রত্যেক গোত্রই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিমূল্য (বা ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে।

"আমর-বিন-আউফ বংশীয়গণও বর্তমানের মত একই অবস্থায় থাকবে। আর তাদের প্রত্যেক গোত্রই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিমূল্য (বা ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে।

"আল-নাবিত বংশীয়গণও বর্তমানের মত একই অবস্থায় থাকবে। আর তাদের প্রত্যেক গোত্রই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিমূল্য (বা ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে।

"আল-আ'স বংশীয়গণও বর্তমানের মত একই অবস্থায় থাকবে। আর তাদের প্রত্যেক গোত্রই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার তাগিদে তাদের স্বগোত্রীয় বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য মুক্তিমূল্য (বা ক্ষতিপূরণ) প্রদান করবে।

"বিশ্বাসীগণ তাদের মধ্যে কাউকে চরম ঋণ ভারগ্রস্ত অবস্থায় অথবা পরিবারের দুর্বিষহ চাপে জর্জরিত অবস্থায় একা ফেলে রাখবেন না এবং তারা তাদের আত্মীয়-বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থার জন্য উদারভাবে ক্ষতিপূরণ বা মুক্তিমূল্য দানের সম্ভাব্য যে কোন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ হতে কখনো বিরত থাকবেন না;

"কোন বিশ্বাসী অপর কোন বিশ্বাসীর আশ্রিত ব্যক্তির (মওলা) সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না; কোন ব্যক্তি যদি ন্যায়নীতি বিগর্হিতভাবে অপরাধ অনুষ্ঠান করে থাকে অথবা অন্যায়ভাবে উৎপীড়ন করে থাকে কিংবা সীমা লঙ্ঘনের অভিপ্রায়ে বা বিশ্বাসীদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে শক্তির অভিলাষী হয়ে থাকে, তবে মুমিন বিশ্বাসীগণ অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবেন, এমন কি সে ব্যক্তি যদি তাদের (বিশ্বাসীদের) পুত্রও হয়ে থাকে;

"কোন বিশ্বাসী একজন অবিশ্বাসীর জন্য অপর কোন অবিশ্বাসীকে হত্যা করতে পারবে না; কিংবা তিনি একজন বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে কোন অবিশ্বাসীকে সাহায্য বা সমর্থন করবেন না;

"দীনতম ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকল বিশ্বাসীর জন্যই (সমভাবে) রয়েছে আল্লাহর (আইনের) নিরাপত্তা। বিশ্বাসীগণ পরস্পরকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করবেন। একজন বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে একজন দীনতম বিশ্বাসীকেও রক্ষা করবেন; অন্যান্য জাতি ভিন্ন শুধু বিশ্বাসীগণ তাদের নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাহায্যকারী;

"ইহুদীদের মধ্যে যারা আমাদের অনুসরণ করে, তারা সমভাবে আমাদের সমর্থন এবং সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করবে; তাদের প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন কিংবা অন্যায় ব্যবহার করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা

ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন অভিপ্রায় পোষণ করবো না অথবা তাদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য করব না। সবার জন্যই সমভাবে রয়েছে বিশ্বাসীদের শান্তির নিশ্চয়তা;

"বিশ্বাসীগণ সম্মিলিতভাবে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবেন। আল্লাহর পথে যুদ্ধানুষ্ঠানের পরে কোন বিশ্বাসী অপর বিশ্বাসীদের বাদ দিয়ে এবং তাদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে মতৈক্য ছাড়া শান্তিচুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন না;

"যে সব যোদ্ধা আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করবে এবং ক্ষীপ্রগতিতে আক্রমণ চালাবেন, তারা একের পর এক অগ্রসর হবেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন আর পরস্পরকে অনুসরণ করবেন;

"আল্লাহর পথে জেহাদ পরিচালনাকালে বিশ্বাসীগণ তাদের রক্তপাতের (কিংবা তাদের প্রতি হামলার) প্রতিশোধ গ্রহণের কাজে তাদের পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা করবেন। একজন ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী নিশ্চয়ই সর্বোৎকৃষ্ট ও সঠিক পথের নির্দেশ অনুসরণ করবেন;

"কোন মুশরিক মুসলমানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোরেশদের ধন-মাল কিংবা জনবল দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না কিংবা তাদের (কোরেশদের) কোন বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না; অথবা কোন বিশ্বাসীকে (কোরেশদের প্রতি আক্রমণে) বাধা দেবে না;

"যে কেউ একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে, তাকে অবশ্যই (হত্যার কার্য-কারণ সম্পর্কে) বিশ্বাসীর ওয়ালীর (অভিভাবক) সন্তুষ্টি বিধান করতে হবে; এবং অন্যায়ভাবে বিশ্বাসীকে হত্যা করা হলে তার বদলে হত্যাকারীর মৃত্যুর বিধান করতে হবে; নিহত বিশ্বাসীর ওয়ালী সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বাসীকে অবশ্যই হত্যাকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। এবং তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই তাদের জন্য বৈধ হবে না;

"এই চুক্তির দলিলে যা' কিছু লিখিত রয়েছে—যে বিশ্বাসী তা স্বীকার করেছেন এবং যিনি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে (কেয়ামত) বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তার পক্ষে কোন অপরাধীকে সাহায্য দান করা কিংবা তাকে আশ্রয় দেয়া বৈধ হবে না। এবং যারা তাকে আশ্রয় ও সাহায্য দান করবে, শেষ বিচারের দিন নিশ্চয়ই তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ (গজব) ও ক্রোধ আপতিত হবে। আর তাঁর (আল্লাহর) অভিসম্পাৎ গ্রহণ করা নিশ্চয়ই উচিত হবে না; কোন বিষয়ে তোমরা ভিন্ন মত পোষণ করলে, তার মীমাংসার জন্য অবশ্যই তোমরা সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুসরণ করবে;

মুসলিম ও ইহুদী একই রাজনৈতিক জাতি

(ক) "যে পর্যন্ত ইহুদীগণ মুসলমানদের সাথে থেকে যুদ্ধ করবে, সে পর্যন্ত তাদের যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনে শরীক হতে হবে এবং যে পর্যন্ত মুসলমানগণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকবেন, সে পর্যন্ত ইহুদীগণও তাদের সাথে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করে যাবেন; "আউফ গোত্রের ইহুদীগণ মুসলমানদের সাথে একই (রাজনৈতিক দিক থেকে) জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ইহুদীদের জন্য রয়েছে তাদের নিজস্ব ধর্মমত; আর বিশ্বাসীদের জন্যও রয়েছে তাদের নিজস্ব ধর্মমত; তাদের মাওয়ালীদের (আশ্রিত বা দাসদের) এবং পরিবারের অন্যান্য লোকজনেরও এই একই অধিকার থাকবে; তবে অপরাধী, জালিম ও পাপাচারী ব্যক্তিগণ এই অধিকার লাভ করবে না; নিশ্চয়ই তারা (জালিম ও পাপীগণ) তাদের এবং তাদের পরিজনদের ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন ছাড়া অন্য কারো ক্ষতি করতে পারে না;

(খ) আউফ গোত্রের ইহুদীরা যে সব অধিকার লাভ করেছে, আল-নাজ্জার গোত্রের ইহুদীরাও সে সব অধিকার লাভ করবে;

(গ) আউফ গোত্রের ইহুদীরা যে সব অধিকার লাভ করেছে, আল-হারিস গোত্রের ইহুদীরাও সে সব অধিকার লাভ করবে;

(ঘ) আউফ গোত্রের ইহুদীরা যে সব অধিকার লাভ করেছে, সায়দাহ গোত্রের ইহুদীরাও সে সব অধিকার লাভ করবে;

(ঙ) আউফ গোত্রের ইহুদীরা যে সব অধিকার লাভ করেছে, জুসম গোত্রের ইহুদীরাও সে সব অধিকার লাভ করবে;

(চ) আউফ গোত্রের ইহুদীরা যে সব অধিকার লাভ করেছে, আউস গোত্রের ইহুদীরাও সে সব অধিকার লাভ করবে;

(ছ) আউফ গোত্রের ইহুদীরা যে সব অধিকার লাভ করেছে, সালাবাহ গোত্রের ইহুদীরাও সে সব অধিকার লাভ করবে; তবে অপরাধী, জালিম ও পাপাচারী ব্যক্তিগণ এ অধিকার লাভ করবে না; নিশ্চয়ই তারা তাদের ও তাদের পরিজনদের ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন ছাড়া অন্য কারো ক্ষতি করতে পারবে না; সালাবাহ গোত্র যে সব অধিকার লাভ করেছে, তাদের বংশসম্ভূত জাফনাহ গোত্রও সে সব অধিকার লাভ করবে;

(জ) আউফ গোত্রের ইহুদীরা যে সব অধিকার লাভ করেছে, আল-শুতেবাহ গোত্রের ইহুদীরাও সে সব অধিকার লাভ করবে; তবে নিশ্চয়ই ন্যায়নিষ্ঠা ও সদাচরণ থেকে অপরাধের পার্থক্য রয়েছে;

১। সালাহবাহদের যে সব অধিকার দেয়া হয়েছে, তাদের আশ্রিতদেরও (মাওয়ালী) সেই সব অধিকার দেয়া হবে; আর তাদের সালাহবাহ গোত্রের অনুরূপই গণ্য করা হবে; এবং

২। ইহুদীদের যে সব অধিকার দেয়া হয়েছে, তাদের অনুগামীদেরও (বিতানা) সে সব অধিকার দেয়া হবে; আর তাদের ইহুদীদের অনুরূপই গণ্য করা হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যবাধকতা

"হযরত মুহাম্মদের (সঃ) অনুমোদন ব্যতীত কোন ইহুদীই (মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে) যোগদান করতে পারবে না;

"কাউকে বৈধভাবে আঘাতের (বা রক্তপাতের) প্রতিশোধ গ্রহণে বাধা দেয়া হবে না; যে কেউ অন্য কাউকে বিশ্বাসভঙ্গ করে হত্যা করে, সে তার এবং তার পরিজনদের জীবনের বিনিময়েই এইরূপ করে থাকে। আর যার প্রতি এইরূপ অন্যায় করা হয়েছে, একমাত্র সে (হত্যাকারী) এবং তার পরিবারই তার নিকট দায়ী থাকবে। এবং এইরূপ ঘটনায় যে ব্যক্তি অধিকতর ভাল ব্যবহার করে থাকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার পক্ষেই আছেন;

"ইহুদীরা তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বহন করবে এবং মুসলমানরাও তাদের ব্যয়ভার বহন করবে; এবং এই চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর যারা হামলা করে থাকে, তারা (চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়) তাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই নিজেদের পরস্পরকে সাহায্য করবে; এবং তাদের মধ্যে থাকবে পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও কল্যাণবোধ; এবং তারা কখনো কোন অপরাধ কিংবা পাপাচার করবে না; নিশ্চয়ই নির্দোষিতা অপরাধ হতে পৃথক (অর্থাৎ অপরাধীদের সাথে ভিন্ন রকম ব্যবহার করা হবে); আর তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে তারা তাদের দুশমনদের (যারা চুক্তিবদ্ধ মিত্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে) ওপর নিশ্চয়ই জয়লাভ করবে; কেউই তার মিত্রের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর কিছু করতে পারবে না; কারণ, নিশ্চয়ই মজলুমের পক্ষেই বিজয় আসবে; এবং যে ব্যক্তি তার মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করেনি, সে সাহায্য পাবে;

"যে পর্যন্ত বিশ্বাসীগণ হামলাকারী দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে, সে পর্যন্ত ইহুদীগণ তাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করবে এবং বিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনে শরীক হবে;

"মদিনা নগরীর অভ্যন্তর ভাগ (দওফ) এই সনদের অধিকারীদের (চুক্তিবদ্ধ লোকদের) নিকট পবিত্র থাকবে;

"প্রতিবেশীকে আমাদের নিজেদের মতই (স্বয়ং আশ্রয়দাতা প্রতিবেশীর মতই) গণ্য করতে হবে এবং তার প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন করা হবে না কিংবা তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখা যাবে না—যদি না তার পক্ষ থেকে কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে অথবা সে কোন অপরাধ করে থাকে। স্ত্রীলোককে তার আত্মীয়-বর্গের সম্মতি ব্যতীত আশ্রয় দেয়া যাবে না;

ইসলামের মৌলিক নীতির সার্বভৌমত্ব

"এই চুক্তির পক্ষগুলোর মধ্যে যদি কোন বিষয়ে কোন বিরোধ বা বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে কোন অশুভ পরিণতির আশঙ্কা দেখা দেয় তবে তার মীমাংসার জন্য অবশ্যই সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ আর তাঁর রাসূল মুহাম্মদের (সঃ) নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। যে এই চুক্তিপত্রের বিধানগুলো পালনের জন্যে সব চেয়ে বেশী আগ্রহশীল থাকবে এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে এগুলো পালন করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে থাকবেন। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই এই সনদ কার্যকরীকরণে সাহায্য করবেন। (শত্রুভাবাপন্ন) কোরেশগণ এবং তাদের সাহায্যকারী ও সমর্থকদের সাহায্য দান করা চলবে না;

"যারা মদিনা দখলের হুমকি দান করবে, তাদের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ দলগুলো একে অপরকে সাহায্য দান করবে এবং যারা আক্রমণ করবে, (মুসলমান ও ইহুদীগণ) তাদের ওপর অবশ্যই জয়লাভ করবে;

"কোন শান্তিচুক্তি সম্পাদনে ইহুদীদের অংশ গ্রহণের জন্য মুসলমানগণ যদি তাদের প্রতি আহ্বান জানায়, তবে অবশ্যই তাদের তা গ্রহণ করতে হবে; এবং যখন ইহুদীদের পক্ষ থেকে মুসলমানগণকে অনুরূপ আহ্বান জানানো হবে, তখন তাদের জন্যও অনুরূপ কর্তব্য হবে; তবে কেবল ওই সব ব্যক্তি ছাড়া যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জেহাদ (ধর্মের জন্য যুদ্ধ) করে (অর্থাৎ তারা এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে);

"প্রত্যেক দল পূর্বের মতই তাদের পক্ষ হতে তাদের নিজ নিজ অংশ পাবে;

"নিশ্চয়ই আল-আউস গোত্রের ইহুদীগণ, আর তাদের আশ্রিতগণ এবং তারা নিজেরা সদ্ব্যবহার অক্ষুণ্ন রাখলে এই চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলোর মতই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ সর্বপ্রকার অধিকার ও মর্যাদা লাভ করবে;

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সঙ্গেই আছে যে এই চুক্তিপত্রে যা কিছু রয়েছে, তার প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল, অনুগত এবং ন্যায়পরায়ণ; জালিম ও পাপাচারী ব্যতীত কেউই এই চুক্তির বিরুদ্ধাচারণ করতে পারবে না; এবং এই চুক্তিপত্র জালিম ও পাপাচারীদের জন্য নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা করবে না;

"যারা মদিনা নগরে বসবাস করবে, তাদের যে কেউ যুদ্ধে থাক বা ঘরে অবস্থান করুক, তারা নিরাপদে থাকবে, কেবলমাত্র অত্যাচারী ও পাপাচারীগণ ব্যতীত; তাদের জন্য নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই;

"যারা ধর্মশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে জীবনযাপন করবে এবং এই চুক্তির বিধানসমূহ কার্যকরী করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের আশ্রয় দেবেন ও নিরাপদ রাখবেন। আর নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল (তাঁর ওপর আল্লাহর করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক)।"

এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, এ চুক্তিটি একটি ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি। মক্কার বাস্তুচ্যুত মোহাজের, মদিনার আনসার (মোহাজেরদের সাহায্যকারী ও অনুগামীগণ) এবং ইহুদীগণ—এই তিন পক্ষের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে চুক্তিপত্রের দলিলটি পরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে, এটা কেবলমাত্র একটা সাধারণ মৈত্রীচুক্তি নয়; বস্তুত এর লক্ষ্য ও গুরুত্ব আরো অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর ক্ষেত্র আরো ব্যাপক। চুক্তির প্রথম অংশ হতেই সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন গোত্র বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌছার প্রয়াসই কেবল এর লক্ষ্য নয়; প্রকৃতপক্ষে, সংকীর্ণ গোষ্ঠিগত বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে একটি সাধারণ রাষ্ট্রীয় মৈত্রী সংস্থার আওতায় মদিনার সকল প্রতিদ্বন্দ্বী আরব গোত্রকে সম্মিলিত করে অবশিষ্ট জন-সমষ্টি হতে স্বতন্ত্র একটি জাতি গঠনই এই চুক্তির মূল লক্ষ্য। অন্য কথায় একে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রারম্ভিক গঠনতন্ত্রও বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ এরই ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আরবদের জীবন-প্রবাহের গোটা স্নায়ুকেন্দ্রকে তথা তাদের দৃষ্টিসীমাকে সামগ্রিকভাবে একটি নয়া ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে পরিবর্তিত করে একটি সম্মিলিত সমাজসংস্থার সমস্ত বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের সংকীর্ণ গোষ্ঠিকেন্দ্রিক আনুগত্যের বিলোপ সাধনে ব্রতী হন।

চুক্তির দ্বিতীয় অংশ হতে বোঝা যায় যে, আরব গোত্রগুলোকে নিয়ে একটি পক্ষ ও ইহুদী গোত্রগুলোকে নিয়ে অপর একটি পক্ষ গঠিত হয় এবং অতঃপর উভয়পক্ষ সম্মিলিতভাবে মৈত্রীতে আবদ্ধ হয়। বিশ্বাসীদের নিয়ে প্রত্যেক ইহুদী গোত্রের সমন্বয়ে একটি জাতি গঠিত হয়; কিন্তু এককভাবে সমস্ত ইহুদী গোত্রের সমবায়ে কোন স্বতন্ত্র জাতি গঠন করা হয়নি। তবে স্বতন্ত্রভাবে আশ্রিত ও অনুগামীগণসহ প্রত্যেক ইহুদী গোত্রের স্বকীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের অধিকার সংরক্ষিত হয়।

চুক্তির এই অংশের প্রকৃতি হতে বোঝা যায় যে, মদিনাকে কেন্দ্র করে আরব ও ইহুদী গোত্রসমূহের সমবায়ে একটা কনফেডারেশন গঠিত হয়েছে। এই কনফেডারেশনের অংশ হিসেবে মদিনা অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ব্যাপক প্রাধান্য বিস্তার করে। এই চুক্তির ফলেই কনফেডারেশনের সমস্ত দল বা গোত্রের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে একটা ঐক্যগত সমঝোতা বা পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়। যদি কোন সময় কোন একটি ইহুদী গোত্র মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ত, তখন এই সম্পর্ক বিশেষ সহায়ক হত।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

বদরের যুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে মক্কাবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন (খৃস্টাব্দ ৬২৪-৩০) পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মদিনায় হযরত মুহাম্মদের (সঃ) নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক মর্যাদা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে তিনি মদিনার আশেপাশের গোত্রগুলোকে ইসলামের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস পান। ইবনে হিশামের ভাষায়, বদরের সামরিক সাফল্যের পর হযরত প্রকৃতপক্ষে হেজাযের একচ্ছত্র শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। ওহুদের যুদ্ধের (খৃস্টাব্দ ৬২৫) নগণ্য পরাজয় তাঁর ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ, কিছুকাল পরেই খন্দকের যুদ্ধে (খৃস্টাব্দ ৬২৭) তিনি আবার এক সুদূরপ্রসারী সাফল্য লাভ করেন।

ঠিক এই সময়েই ইহুদীদের নাযীর গোত্রের ষড়যন্ত্রের ফলে তাদের সাথে সম্পাদিত মৈত্রীচুক্তি বাতিল হয়ে যায়। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ইহুদীগণ (নাযীর গোত্র) কর্তৃক হযরতের জীবননাশের ষড়যন্ত্রই এই চুক্তি বাতিল হওয়ার প্রধান কারণ। অবশ্য চক্রান্তকারী বানু নাযীর ছাড়া চুক্তির অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ইহুদী গোত্রের সঙ্গে হযরত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখেন। চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ার জন্যে হযরত বানু নাযীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাদের পরাজিত করেন। কিন্তু এর পরও কিছুকাল ইহুদীদের সঙ্গে বিরোধের অবসান ঘটেনি; কারণ, অবশিষ্ট ইহুদীগণ বিশেষ করে স্ব-ধর্মাবলম্বী বানু নাযীরের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল কোরায়জা গোত্রও এই সময় হযরতের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মদিনার মুসলমানদের সঙ্গে (ইহুদীদের) মৈত্রীচুক্তির ফলে ইহুদীদের এই শত্রুতার অবসান ঘটে।

হযরত প্রথমতঃ তাঁর পরম শত্রু কোরেশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে মক্কা বিজয়ের দ্বারা তাঁর জীবনের সাফল্যকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মক্কায় হজে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই হযরত কোরেশদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌছেন। হজব্রত পালন এই সমঝোতায় পৌছানোর আশু কারণ হলেও প্রকৃতপক্ষে তখন উভয়পক্ষের অবস্থা থেকে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, অন্ততঃ সাময়িকভাবে হলেও তাঁদের মধ্যে ক্ষমতার একটা ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। কোরেশদের অবস্থা তখনো এমন পর্যায়ে ছিল যে, মদিনার শাসন-কর্তৃপক্ষের পক্ষে তাদের পরাভূত করা সহজ-সাধ্য ছিল না বিশেষ করে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার ফলে। অন্যদিকে মক্কাবাসীগণ বদর ও খন্দকের যুদ্ধে উপর্যুপরি দু'বার মুসলমানদের হাতে চরমভাবে পরাজিত হয় এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সিরিয়ার সাথে তাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। এর ফলে কোরেশদের বাণিজ্য-কাফেলা প্রভৃত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় অন্ততঃ স্বল্পকালের জন্যে হলেও উভয়পক্ষ একটা

শান্তিচুক্তির জন্য বিশেষভাবে আগ্রহশীল হয়ে ওঠে। যে ঘটনাবলী শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তা হচ্ছে সংক্ষেপে এই ঃ

রাসূল তাঁর মুষ্টিমেয় সংখ্যক অনুগামী নিয়ে হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কোরেশগণ হযরতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আশঙ্কা ও সন্দেহ পোষণ করে পথিমধ্যেই তাঁকে বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় হযরত কোরেশদের নিকট শান্তির প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত করেন। এতদানুযায়ী তিনি তাঁর জামাতা ও ভাবী তৃতীয় খলিফা উসমান ইবনে আফফানকে তাঁর শান্তি প্রস্তাবসহ কোরেশদের নিকট প্রেরণ করেন। মক্কাবাসীগণ এ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং হযরতের সঙ্গে শান্তিচুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্যে সুহাইল ইবনে-আমরকে প্রেরণ করে। এই আলাপ-আলোচনার ফলেই 'হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি' নামে অভিহিত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। হযরত রাসূলের চাচাতো ভাই ও ভাবী চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে-আবু তালেব চুক্তির দলিল লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে সম্পাদকের কাজ করেন। নীচে চুক্তিটির বিবরণ দেয়া হল ঃ

> "হে আল্লাহ্ ! তোমার নামে শুরু করছি। এ চুক্তিটি মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ শান্তি পূর্ণভাবে সুহাইল ইবনে আমরের সঙ্গে একমত হয়ে সম্পাদন করেছেন;
>
> "তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে একমত হয়ে দশ বছর কালের জন্য যুদ্ধবিরতির শর্ত মেনে নিয়েছেন; পরস্পরের আক্রমণ থেকে (উভয়পক্ষের) জনসাধারণ নিরাপদ থাকবে;
>
> "কোরেশদের কোন লোক তার ওয়ালীর (অভিভাবক) অনুমতি ছাড়া মুহাম্মদের (সঃ) দলে যোগদান করতে চাইলে, তাকে তাদের (কোরেশদের) কাছে প্রত্যার্পণ করতে হবে; কিন্তু মুহাম্মদের (সঃ) কোন অনুগামী কোরেশদের দলে যোগদান করতে চাইলে, তাকে কোনরূপ বাধা দেয়া হবে না;
>
> "আমাদের উভয় দলের পক্ষেই অসদাচরণ ও অবৈধ কার্যকলাপ নিষিদ্ধ; এবং আমাদের মধ্যে স্বপক্ষ ত্যাগ ও বিশ্বাসঘাতকতার কোনরূপ অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে পারবে না;
>
> "যারা (যেসব লোক) মুহাম্মদের (সঃ) সঙ্গে যোগদান করতে এবং তাঁর চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তারা অবাধে তা' করতে পারবে; এবং যারা কোরেশদের সঙ্গে যোগদান করতে এবং তাদের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তারাও অবাধে তা' করতে পারবে।"

এই চুক্তির ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সদিচ্ছা সম্পর্কে মক্কাবাসীদের মনে আস্থা সৃষ্টির জন্য কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত করেন। এঁরা চুক্তির শর্তসমূহ পালন ও অক্ষুণ্ন রাখার শপথ গ্রহণ করেন। এই সাক্ষীদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বকর, উমর ইবনে আল-খাত্তাব ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ। এই চুক্তির ফলে ইসলামের

আরেকটি বিরাট বিজয় সূচীত হয়। কারণ, এই চুক্তির মাধ্যমেই অবশেষে অভিজাত কোরেশ গোত্রের নেতৃবৃন্দ মদিনায় হযরত মুহাম্মদের (সঃ) শাসন-কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং গৌণভাবে হলেও ইসলামকে মদিনার রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। এতে মক্কায় হযরতের মর্যাদা সমুন্নত হয় এবং সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করে। অথচ মদিনায় হিজরতের পূর্বে এক সময়ে এই মক্কাতেই তাঁকে অকথ্য লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল।

হুদায়বিয়ার চুক্তির ফলে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম এই রীতির অনুবর্তন হয় যে, মুসলিম কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী মেয়াদের ভিত্তিতে মুশরিকদের (অংশীবাদী) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারেন। এ ধরনের চুক্তির মেয়াদ সম্পর্কে আইনবিদদের মধ্যে অবশ্য মত-বিরোধ রয়েছে। কোন কোন আইনবিদ হুদায়বিয়ার চুক্তির অনুরূপ দশ বছরের মেয়াদ অনুমোদন করেছেন। আবার কেউ বা দু-তিন বছরের মেয়াদের কথা বলেছেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এসব চুক্তি দু-তিন বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়নি। অবশ্য আইনবিদগণ এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, শত্রুদের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া ইসলামের মূল স্বার্থের পরিপন্থী নয়।

হুদায়বিয়ার শান্তিচুক্তিও কার্যতঃ দু' বছরের মধ্যেই লঙ্ঘন করা হয়। ইতিহাসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের ওপর কোরেশদের অবৈধ আক্রমণের ফলেই চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়। চুক্তির বিধানে "যারা মুহাম্মদের (সঃ) দলে এবং তাঁর মৈত্রীতে যোগদান করতে চাইবে, তারা অবাধে তা' করতে পারবে" বলে যে স্বীকৃত শর্তটি রয়েছে, এ হামলার দ্বারা কোরেশগণ সরাসরি তা লঙ্ঘন করে। এরপরও অবিশ্যি কোরেশদের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আলাপ-আলোচনা চালান হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই সময় কোরেশদের তুলনায় মুসলমানগণ অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে; ঠিক এই অবস্থায় মুসলমানদের ওপর একটা অন্যায় হামলা দ্বারা তারা একটা বৃহত্তর শক্তি পরীক্ষাকে আসন্ন করে তোলে। নিজের অনুগামীদের ওপর কোরেশদের এই অহেতুক আক্রমণে হযরত (সঃ) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু তবুও তিনি তাদের সঙ্গে একটা আপোষ রফার চেষ্টা করেন। কিন্তু এতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে মুসলমানগণ মক্কা অভিমুখে সামরিক অভিযান পরিচালনার সংকল্প করেন। হিজরী ৮ সালে (খৃস্টাব্দ ৬৩০) তাঁরা মক্কা দখল করেন। এই সময় কোরেশগণ অত্যন্ত হীনবল ও শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে তারা নব বলে উদ্দীপ্ত মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করতে কিংবা তাদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সাহস পেল না। হযরত (সঃ) তাঁর বিজয়পতাকা হস্তে মুক্ত তোরণ দ্বার দিয়ে অবাধে পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করলেন।

মক্কা বিজয়ের ফলে দুই নগর-রাষ্ট্রের বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাপ্তি ঘটে। আর এর ফলে সমগ্র হেজাযে ইসলামের সুদৃঢ় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। এরপর হযরতের (সঃ) মিশন এক বিস্তৃততর লক্ষ্যপানে সম্প্রসারিত হয়।

রাষ্ট্রীয় সনদ হিসেবে জিম্মী-চুক্তির স্থান

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আরো এক ধরনের কতকগুলো চুক্তি সম্পাদন করেন। এগুলো পূর্বোক্ত চুক্তিগুলো হতে একটু আলাদা ধরনের। আরবের কেতাবী সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে সম্পন্ন চুক্তিও এর মধ্যে রয়েছে। এসব চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ কেতাবীদের জীবন ও ধনসম্পদের নিরাপত্তা বিধান এবং অবাধভাবে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি পালনের স্থায়ী প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়। অবিশ্যি, তারা যতদিন চুক্তির শর্তগুলো মেনে চলবেন, ততদিনই এই নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এই চুক্তিগুলোর আইনগত প্রকৃতি সম্পর্কে এ বইয়ের অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে (সপ্তদশ পরিচ্ছেদ)। এই পরিচ্ছেদে এ চুক্তিগুলোর কাঠামো ও পদ্ধতি এবং অন্যান্য চুক্তির সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হবে। জেরুজালেমের প্রধান খৃস্টান বিশপ দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর-বিন-আল-খাত্তাবের সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদন করেন, এ শ্রেণীর চুক্তির ক্ষেত্রে তার চাইতে উৎকৃষ্টতর নজির আর পাওয়া যায় না। এ চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে প্রধান বিশপ দাবী করেন যে, এই চুক্তির দলিলে স্বয়ং খলিফাকেই স্বাক্ষর দান করতে হবে, তাঁর কোন প্রতিনিধির স্বাক্ষর হলে চলবে না। হিরা ও দামেস্কের শান্তিচুক্তির দলিলে কিন্তু খলিফার প্রতিনিধিগণই স্বাক্ষর দান করেন। হযরত উমর প্রধান বিশপের দাবীতে সম্মত হন এবং চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দানের জন্যে জেরুজালেম গমন করেন। হিজরী ১৭ সালে (খৃস্টাব্দ ৬৩৮) এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। নীচে চুক্তির শর্তগুলোর বিবরণ দেয়া হল ঃ

"পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

"আমীরুল মুমেনীন (বিশ্বাসীদের নেতা) আবদুল্লাহ উমর ইলিয়ার (জেরুজালেম) অধিবাসীগণকে এগুলো (এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বিধি-ব্যবস্থা ও অধিকারসমূহ) মঞ্জুর করেছেন;

"তিনি তাদের জীবন, ধনসম্পদ, গীর্জা ও ক্রস (যাবতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান) রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন:

"তাদের গীর্জায় কেউ (কোন বিদেশী) বাস করতে পারবে না, কিংবা এর (গীর্জার) কোনরূপ ক্ষতি বা ধ্বংস সাধন করা যাবে না; আর তাদের ক্রস কিংবা তাদের ধনসম্পদেরও কোন ক্ষতি বা ক্ষয় সাধন করা যাবে না

"তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের (ধর্মীয় বিধি-ব্যবস্থা বা আচার-অনুষ্ঠান) জন্য তাদের ওপর কোনরূপ জোর জবরদস্তি করা চলবে না, কিংবা তাদের ওপর কোন প্রকার জুলুম বা উৎপীড়ন চলবে না;

"ইলিয়া নগরে (জেরুজালেমে) তাদের সঙ্গে ইহুদীদের বসবাসের অনুমতি দেয়া যাবে না;

"মাদাইনের (সাবেক পারস্যের রাজধানী) অধিবাসীদের মত সমানুপাতে ইলিয়ার অধিবাসীদেরও জিযিয়া প্রদান করতে হবে;

"ইলিয়ার অধিবাসীগণকে রুম (রোমান বা বাইজান্টীয়) ও তস্করদের নগর ছেড়ে যেতে দিতে হবে। যদি তারা (রোমানগণ) নগর ছেড়ে যায়, তবে তাদের স্বদেশে পৌছানো পর্যন্ত তাদের জীবন ও ধনসম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য যে সব বাইজান্টীয় নগরে বসবাস করতে চায়, তাদের অবশ্যই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে; তবে জিযিয়ার ব্যাপারে ইলিয়াবাসীদের অনুরূপ শর্তে তাদেরও স্বীকৃত হতে হবে;

"ইলিয়ার অধিবাসীদের মধ্য হতে যে সব লোক বাইজান্টীয়দের সঙ্গে নগর ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছুক, তারা তাদের গীর্জা ও ক্রস পরিত্যাগ করে গেলে তাদের জীবন এবং ধনসম্পদের নিরপত্তা-বিধান করা হবে;

"কৃষিভূমির যে সব লোক (কৃষক) পূর্ব থেকেই এই নগরে (ইলিয়ায়) বসবাস করে আসছিল, তারা এখানে অবস্থান করতে চাইলে তাদের সে অধিকার দেয়া হবে, তবে নগরে অন্যান্য অধিবাসীদের মত তাদেরও জিযিয়া প্রদান করতে হবে। তবে যারা বাইজান্টীয়দের সঙ্গে নগর ছেড়ে যেতে চায়, তারা (অবাধে) তা' পারবে; আর যারা সাময়িকভাবে জনপদে (তাদের ভূমিতে) তাদের লোকদের কাছে যেতে চায়, ফসল তোলার মওসুম পর্যন্ত তারা তথায় যেতে বা অবস্থান করতে পারবে;

"নগরের বাসিন্দাদের জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে যথাযথ দায়িত্ব পালন সাপেক্ষে এই চুক্তির দলিলে (এই দলিলে প্রদত্ত শর্তসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে) আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল, খলিফাগণ ও বিশ্বাসীদের (পক্ষ হতে) প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হল।

"সাক্ষীগণ ঃ খালিদ ইবনে আল-ওয়ালীদ, আমর ইবনে আল-আস, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান।

"হিজরী ১৫ সালে এই চুক্তির দলিলটি স্বাক্ষরিত হয়।"

প্রতিষ্ঠিত রীতি অনুযায়ী সাধারণ মাথা-গণতি কর হিসেবে কেতাবীদের যেমন নিয়মিতভাবে জিযিয়া প্রদান করতে হত, তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের [illegible] নাগরিক জিম্মী হিসেবে তাদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণকর বিধিব্যবস্থা ও নাগরিক অধিকারের রক্ষাকবচ

সমন্বিত অধিকারের আইনানুগ রাষ্ট্রীয় সনদও ছিল। অন্যান্য চুক্তির মত জিম্মী অধিকার সংরক্ষণের এই সনদটিও যথারীতি আলাপ-আলোচনার পর স্বাক্ষরিত হয়। তবে বিশেষভাবে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্যান্য চুক্তির সঙ্গে এ চুক্তিটির পার্থক্য রয়েছে। প্রথমঃ, এ চুক্তিটি স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত; কারণ. চুক্তির কোন পক্ষের কোন লোক কর্তৃক এর শর্তাদি লঙ্ঘিত হলেও অপরপক্ষের ওপর শর্তের বাধ্যবাধকতা অক্ষুণ্ন থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, চুক্তিটি প্রযুক্ত বা বলবৎ হওয়ার সময় থেকেই কেতাবীগণ খেলাফতের (দারুল ইসলামের) নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন এবং তাদের অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। গোড়ার দিকে এই শ্রেণীর চুক্তিগুলো দুই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলেও শেষ পর্যন্ত কেতাবী সম্প্রদায়গুলো (জিম্মীগণ) ইসলামী জাতীয়তার আওতায় শামিল হলে চুক্তির প্রকৃতি অনেকটা পরিবর্তিত হয়। অবিশ্যি, ইসলামী জাতীয়তার অঙ্গীভূত হলেও অনেকাংশই এই সম্প্রদায়সমূহের স্বায়ত্বশাসনাধিকার অক্ষুণ্ন রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আইনবিদগণ ইসলামের সঙ্গে জিম্মীদের সম্পর্কের বিষয় সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থাকে শরিয়তের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। ফলে এই শ্রেণীর চুক্তিগুলো (জিম্মী সম্বন্ধীয় চুক্তি) রাষ্ট্রীয় শাসন-সংবিধানের মর্যাদা লাভ করে। জিম্মীদের সম্পাদিত চুক্তিগুলো পরবর্তীকালে 'উমরের সনদ' বলে অভিহিত হয়।

খলিফাদের আমলে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহ

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিসমূহকে পরবর্তীকালে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হত এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ (খলিফাগণ) অবিচলিত নিষ্ঠার সাথে এ আদর্শ অনুসরণ করে গেছেন। আইনগত প্রকৃতির দিক থেকে এমন কি কাঠামোর দিক থেকে বিচার করলেও ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর সাথে খলিফাগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।

পরবর্তীকালে স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্য এবং পরিবেশের পরিবর্তন হওয়ায় রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক উদ্দেশ্যের তাগিদে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মীয় উদ্দেশ্য-প্রধান চুক্তিগুলো হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর নয়া চুক্তির সৃষ্টি হল।

উমাইয়া শাসন আমলে খলিফা ১ম মুয়াবিয়া ও আবদুল মালিক বাইজান্টীয়দের (রোমান) সাথে কতিপয় চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সেই সময় মুসলমানগণ গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় বাইজান্টীয় আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। এমতাবস্থায় তাদের আক্রমণ পরিহারের উদ্দেশ্যে তাঁরা শুল্ক দানের শর্তে তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। মুয়াবিয়া তখনো

খলিফা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেননি। খেলাফত নিয়ে তিনি তখনো হযরত আলীর সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলো শর্তে তিনি বাইজান্টীয় সম্রাট দ্বিতীয় কন্সট্যান্স-এর সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। ৬৫৮ খৃস্টাব্দে তাঁর নিজের কর্তৃত্ববলে মুয়াবিয়া এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি সম্রাটকে শুল্ক দিতে স্বীকৃত হন। ইরাকের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাকালে অন্যতম উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকও (হিজরী ৬৫-৮৬; খৃস্টাব্দ ৬৮৫-৭০৫) বাইজান্টীয়দের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন। আইনবিদগণ অমুসলিম কর্তৃপক্ষকে শুল্ক দানের ব্যাপারে ইমামের কার্যের বৈধতা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। আল-আউযায়ী (মৃত্যু ঃ হিজরী ১৫৭; খৃস্টাব্দ ৭৭৩) ও সুফিয়ান আস-সাউরী (মৃত্যু হিজরী ১৬১; খৃস্টাব্দ ৭৭৭) এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রয়োজনের তাগিদে অনুরূপ শুল্ক প্রদান দোষাবহ নয়। এঁরা উভয়েই উমাইয়া আমলের লোক ছিলেন। তবে মুসলিম শক্তির গৌরবময় যুগের আইনবিদ ইমাম শাফেয়ী এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। হানাফী আইনবিদগণও অনিবার্য কারণ ব্যতীত (অর্থাৎ অতীব প্রয়োজনের ক্ষেত্র ছাড়া) অমুসলিম কর্তৃপক্ষকে শুল্ক দানের বিরোধিতা করেছেন। তবে অধিকাংশ আইনবিদই বার্ষিক শুল্ক দানের বিপক্ষে রায় দিয়েছেন; অবশ্য বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প কালের জন্য অনুরূপ শুল্ক প্রদান করা যেতে পারে বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেবলমাত্র চরমপন্থী আইনবিদ আল-লুলু যে কোন পরিস্থিতেই হোক না কেন, শত্রুপক্ষকে শুল্ক দানের বিরোধিতা করেছেন। এমন কি শক্তির দিক থেকে মুসলমানদের অবস্থা দুর্বল বলে মনে করলেও শত্রুপক্ষকে শুল্ক দানের পরিবর্তে ইমামের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উচিত বলে তিনি রায় দেন।

আব্বাসীয় আমলে খলিফাগণ নানাবিধ কারণে বাইজান্টীয়দের সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। প্রথমতঃ, উপর্যুপরি সীমান্ত লঙ্ঘন বন্ধের জন্যে উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয়। কারণ, আব্বাসীয়-বাইজান্টীয় সীমান্তে প্রাকৃতিক আড়ালের স্বল্পতা হেতু উভয়পক্ষ প্রায়ই জবরদস্তিমূলক পরস্পরের সীমানা লঙ্ঘন করত। আব্বাসীয় বংশের শাসন আমলের প্রথম দিকে এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী বাইজান্টীয় সম্রাটগণ বাগদাদ কর্তৃপক্ষকে বার্ষিক শুল্ক দিতে বাধ্য হন। এ ভাবেই বাইজান্টীয় সম্রাজ্ঞী ইরিন (মৃত্যু খৃস্টাব্দ ৮০২) খলিফা হারুনুর রশীদকে শুল্ক দিয়ে তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তকে বার বার হামলার হাত থেকে রক্ষা করেন। সম্রাট নিসিফোরসের রাজ্যভিষেক পর্যন্ত এই চুক্তি অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু নিসিফোরস সাম্রাজ্যিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বাইজান্টীয় সাম্রাজ্য কর্তৃক বাগদাদ কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত সমস্ত শুল্ক ফেরত চেয়ে বাগদাদে একটি অবমাননাকর পত্র প্রেরণ করেন। খলিফা হারুন এতে খুব

ক্রুদ্ধ হন এবং নিসিফোরসকে সমুচিত জওয়াব দানের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে, নিসিফোরস বাগদাদ কর্তৃপক্ষকে পুনরায় নতুনভাবে শুল্ক প্রদান করতে বাধ্য হন। কিন্তু পরে বাগদাদের খলিফাদের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ক্ষীয়মাণ হয়ে আসলে কন্সট্যানটিনোপলের (বাইজান্টীয়) সম্রাটগণ তাঁদের শুল্ক দান বন্ধ করে দেন; এমন কি তাঁরা তখন আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সীমান্তের ওপরও হানা দিতে শুরু করেন। মুসলিম কর্তৃপক্ষ ও ক্রুডেস যুদ্ধের নায়ক রাজন্যবর্গের সঙ্গেও অনুরূপ চুক্তি সম্পাদিত হয়। আঞ্চলিক খণ্ড সংঘর্ষের অবসান, অবাধভাবে সাধারণ লোকদের বিভিন্ন এলাকায় চলাচল বা পরিভ্রমণ, ধর্মস্থানসমূহ পরিদর্শন, হজব্রত পালন প্রভৃতি উদ্দেশ্যেই এই শ্রেণীর চুক্তি হয়। হজব্রত পালন কিংবা পবিত্র ধর্মস্থানসমূহ পরিদর্শনের সুযোগ-সুবিধার বিশেষ উদ্দেশ্যে ১১৯২ খৃস্টাব্দে সুলতান সালাহউদ্দীন ও ক্রুসেড নায়ক রিচার্ড কু'র-ডি-লায়নের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আব্বাসীয় খেলাফতের আমলে আর এক শ্রেণীর চুক্তিও সম্পাদিত হয়। এগুলো 'ফিদা-চুক্তি' (ক্ষতিপূরণ বা মুক্তিমূল্য চুক্তি) নামে অভিহিত। বন্দী বিনিময়ের ভিত্তিতে কিংবা স্বীকৃত অর্থ প্রদান করে যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করাই ছিল এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে বিজয়ী তাঁর রাষ্ট্রীয় তহবিলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করতে পারতেন। অপরপক্ষে, এর ফলে হাজার হাজার হতভাগ্য যুদ্ধবন্দীর জীবন রক্ষা পেত। এ চুক্তির ব্যবস্থা না থাকলে হয় এরা নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করত কিংবা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

উমাইয়া আমলে ফিদা-চুক্তির কোন উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে বন্দী বিনিময় করার রেওয়াজ তখনো ছিল। আরব ইতিহাসকারদের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, চুক্তির মাধ্যমে সুসংহত ব্যবস্থা হিসেবে ফিদা-চুক্তি খলিফা হারুনুর রশীদের আমলেই প্রথম প্রবর্তিত হয়। হিজরী ১৮১ সালে হারুন চুক্তিটি সম্পাদন করেন। এর ফলে প্রায় ৩ হাজার ৭শ' মুসলিম বন্দী মুক্তিলাভ করে। ইতিহাসবেত্তা আল-মাসুদী বলেন যে, খলিফা হারুনের আমল থেকে তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত অনুরূপ মোট ১২টি ফিদা-চুক্তি সম্পাদিত হয়। বিশেষ অনুষ্ঠানাদির পর বন্দীদের মুক্তিদান কার্য সম্পন্ন হত। উভয়পক্ষই এই উপলক্ষে নানাবিধ আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করতেন।

চুক্তির শর্তাদি কার্যকরী করার নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে প্রতিভূ (রাহাইন) বিনিময়েরও ব্যবস্থা সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়। প্রাচীন চীন ও রোমে এ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। প্রাচীন রীতিতে এইরূপ বিধান ছিল

যে, চুক্তির বাধ্যবাধকতা ও শর্তাদি যথাযথভাবে কার্যকরী করা হলে প্রতিভূদের নিরূপদ্রবে তাদের স্বদেশে ফিরে যেতে দেয়া হত। আর যদি কোন কারণে চুক্তি লঙ্ঘন করা হত, প্রতিভূদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে গণ্য করা হত এবং অনেক সময় তাদের উৎপীড়ন ও দুর্দশাও ভোগ করতে হত। কিন্তু মুসলমানগণ প্রতিভূদের নিজেদের আমানত হিসেবে মনে করতেন এবং তাদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তা দান করতেন। প্রতিভূদের সঙ্গে তাঁরা ন্যায়বিচার ও সহৃদয় ব্যবহার করতেন। চুক্তিভঙ্গ হলে এবং যুদ্ধ ঘোষিত হলে মুসলমানগণ প্রতিভূদের তাদের নিজ দেশে পাঠিয়ে দিতেন; কিন্তু যুদ্ধ না বাধলে প্রতিভূদের হয় আগের মতই নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখা হত কিংবা তাদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়া হত।

চুক্তিগুলোর সাধারণ প্রকৃতি

মুসলমানদের সম্পাদিত চুক্তিগুলো সম্পর্কে প্রচলিত আলোচনার ভিত্তিতে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত পর্যায়ে এ সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ ধারণায় পৌছা যেতে পারে ঃ

প্রথমতঃ, মুসলিম-চুক্তিগুলো মোটের ওপর সংক্ষিপ্ত ও সাধারণভাবে একই প্রকৃতির। তাছাড়া, চুক্তির শর্তাদির প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্পর্কেও কোন বিশদ বিবরণ দেয়া হয়নি। অনেক সময় অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ততার দরুন বিষয়বস্তু ও শব্দবিন্যাস অস্পষ্ট থেকে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক চুক্তির ভূমিকায় সাধারণভাবে বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে শুরু করছি) কথাটি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর প্রতিনিধিদের নামের তালিকা ও পদবীর উল্লেখ থাকে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজে যে চুক্তিগুলো সম্পাদন করে গেছেন, তাতেও অনুরূপভাবে 'আল্লাহ'র রাসূল' কথাটির সাধারণ উল্লেখ দেখা যায়। একমাত্র হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিটিতে (কোরেশদের অনিচ্ছার জন্য) এর উল্লেখ ছিল না। হযরতের উত্তরাধিকারী খলিফাগণ যে সব চুক্তি সম্পাদন করেছেন, তাতে তাঁদের উপাধি 'খলিফা' বা 'আমিরুল মুমেনীন' কথাটি সাধারণভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

সাধারণতঃ, সাক্ষীদের নামোল্লেখ করে চুক্তির সম্পাদন-কার্য সমাপ্ত করা হয়। চুক্তির বিষয়বস্তুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সময় এই সব সাক্ষী উপস্থিত থাকতেন।

তৃতীয়তঃ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধির মূল বিষয়বস্তুর পরিবর্তন বা বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, প্রাথমিক যুগের সন্ধি চুক্তিগুলো ছিল প্রধানতঃ ধর্মীয় উদ্দেশ্যভিত্তিক; আর পরবর্তী খলিফাগণ কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তিগুলো ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যভিত্তিক। মুসলিম আইনবিদগণ অবশ্য স্থায়ী

ও অস্থায়ী চুক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। এ ব্যাপারে চুক্তির বিষয়বস্তুর পক্ষগুলোর সাথে মুসলিম কর্তৃপক্ষের কিরূপ সম্পর্ক রয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করেই তারা এ সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। জিম্মীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিগুলোকে স্থায়ী বলে গণ্য করা হয়েছেঃ আর দারুল হারবের সাথে সম্পাদিত চুক্তিগুলোকে অস্থায়ী বলে গণ্য করা হয়েছে। সাময়িকভাবে জেহাদ স্থগিত রাখার ভিত্তিতেই হারবীদের সাথে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদন করা হত।

চতুর্থতঃ, মুসলিম আইনবিদগণ অমুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ নির্ধারিত করে দেন। হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের আইনবিদগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, শত্রুর সাথে সম্পাদিত কোন শান্তিচুক্তির মেয়াদ দশ বছরের সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির মেয়াদের নজিরকেই তাঁরা এ যুক্তির ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির শর্তে চুক্তির কার্যকালের মেয়াদ দশ বছর নির্ধারিত হয়। কোন কোন আইনবিদ বলেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্ত (অর্থাৎ দশ বছর পর্যন্ত) স্থায়ী হয়নি—তার চেয়েও অনেক কম সময় (তিন-চার বছর) স্থায়ী হয়। সুতরাং, অনুরূপ ভিত্তিতে তাঁরা এই শ্রেণীর চুক্তির মেয়াদ তিন-চার বছরের বেশী বাড়ানোর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। ক্রুসেড যুদ্ধের সময়ে সম্পাদিত কতিপয় চুক্তির মেয়াদ দশ বছর দশ মাস কিংবা দশ বছর এগারো মাস কাল (বারো মাস পর্যন্ত নয়) পর্যন্ত নির্ধারিত হয়।

জিম্মীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিগুলোকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। এই চুক্তিগুলোকে কেবল স্থায়ীভিত্তিক বলেই গণ্য করা হত না, বস্তুত, দুই পক্ষের মধ্যে এ গুলোকে সংযোগের একটা মাধ্যম হিসেবে মনে করা হত। প্রকৃতপক্ষে, জিম্মী চুক্তি রাজনৈতিক নিরাপত্তার একটা আইনানুগ সনদ হিসেবে কার্যকরী ছিল। এ চুক্তি কার্যকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিম্মীগণ মুসলিম রাষ্ট্রের একটা অবিভাজ্য অংশ হিসেবে তাদের যাবতীয় সামাজিক ও আইনগত অধিকার ভোগ করত।

শেষতঃ, মুসলিম শাসকগণ তাঁদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বা চুক্তিগত সমঝোতার বাধ্যবাধকতাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে গণ্য করতেন এবং সতর্কতার সাথে এগুলো পালন করতেন। অবশ্য, মুসলিম আইনবিদগণ অমুসলিমদের সাথে চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে মুসলমানদের খুব বেশী উৎসাহিত করতেন না; তবে একবার চুক্তি সম্পন্ন হলে যাতে এর মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে চুক্তির বিধান ও শর্তাদি পালিত হয়, তার প্রতি তাঁরা সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সন্ধিচুক্তির পরিসমাপ্তি

মুসলিম আইনের দৃষ্টিতে সন্ধি কথাটির বিশেষ প্রকৃতি হতেই বোঝা যায় যে, এর ভিত্তি অস্থায়ী। মুসলিম আইনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রের স্বাভাবিক সম্পর্ক সামরিক—শান্তিভিত্তিক নয়। আইনের বিধান অনুযায়ী জেহাদ দশ বছরের অধিক কাল স্থগিত রাখা চলে না; সুতরাং, এই সময় উত্তীর্ণ হলেই সন্ধি চুক্তিসমূহের কার্যকালেরও পরিসমাপ্তি ঘটে। অন্য কথায়, চুক্তির মেয়াদ দশ বছরের বেশী হতে পারে না। এমন কি চুক্তিতে মেয়াদের কথা না থাকলেও দশ বছর উত্তীর্ণ হলেই স্বাভাবিকভাবেই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। অবশ্য, আইনবিদগণ ইমামকে চুক্তির অস্থায়ী রূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার জন্য চুক্তির দলিলে এর কার্যকালের মেয়াদের উল্লেখ করতে বলেছেন।

ইসলামের স্বার্থবিরোধী কোন চুক্তি যাতে সম্পাদন করা না হয়, সে সম্পর্কেও ইমামকে সতর্ক থাকার জন্য বলা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, তিনি যদি এমন চুক্তি সম্পাদন করেন, যাতে তিনি শত্রুপক্ষের নিকট অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করতে সম্মত হয়েছেন, তবে সে চুক্তি 'ফাসিদ' (অনিয়মিত বা বিধিবহির্ভূত) বলে গণ্য হবে। বিধিসম্মত করার জন্য এ চুক্তিকে হয় সংশোধন করতে হবে, অথবা এর সমাপ্তি ঘটেছে বলে ঘোষণা করতে হবে।

ইমাম যদি এমন শর্তসমন্বিত চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যা পালন করা তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত কিংবা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে সে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। এমন কি, চুক্তিটি বিধিসম্মত হলেও ইমাম যদি এর শর্তাদিকে ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বুঝতে পারেন, তবে তিনি এর পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে পারেন। অবশ্য, মুসলমানরা যে চুক্তিটির পরিসমাপ্তি চান, একথা পূর্বাহ্নেই উল্লেখযোগ্য সময়ের মধ্যে অপরপক্ষকে জানিয়ে দিতে হবে।

পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা যেতে পারে। তবে চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে ইমাম এমন কোন শর্তে সম্মত হতে পারবেন না, যাতে চুক্তির দুই পক্ষের মধ্যে যে কোন এক পক্ষকে চুক্তি বাতিলের ক্ষমতা দেয়া হয়; এমন কি, ইমামকে এই ক্ষমতা দেয়া হলেও তিনি এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবেন না। কেননা, চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে পারস্পরিক সম্মতি যেমন মূলভিত্তির কাজ করে, তেমনি চুক্তি পরিসমাপ্তির ব্যাপারেও তাকে অবশ্যই মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

জিম্মীর সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ মূল কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্থায়ী প্রকৃতির; সুতরাং এগুলো কখনো বাতিল বা পরিসমাপ্ত হতে পারে না। এমন কি, কিছু

সংখ্যক জিম্মী তাদের চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করলেও অন্য সকল জিম্মীর ওপর চুক্তিটি সম্পূর্ণভাবে বলবৎ থাকবে। কেননা যে সব কিতাবী সম্প্রদায় মুসলিম শাসনাধীনে বসবাস করতে সম্মত হয়, এ চুক্তিগুলো (জিম্মী চুক্তিগুলো) তাদের প্রতি প্রদত্ত মুসলিম শাসন-কর্তৃপক্ষের শুধু নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিই নয়—বস্তুতঃ, জিম্মীগণ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো রাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক সনদের রূপও পরিগ্রহ করে। এ অবস্থায় কোন জিম্মী তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে তাকে সাধারণভাবে শাস্তি ভোগ করতে হয়। তবে আইন অনুসারে তার ওপর প্রযোজ্য বা বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করার অধিকার তার রয়েছে এবং সে ইচ্ছা করলে অবাধে দারুল হারবে হিজরত করতে পারে।

ঊনবিংশ অধ্যায়
বাণিজ্যিক সম্পর্ক

ইসলাম বা ব্যবসা-বাণিজ্য

ইসলাম এমন একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা, যার মধ্যে জাগতিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মূল্যবোধেরই সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশ্বাসী মুসলমানকে দুনিয়াতে এমনভাবে জীবনযাপন করতে বলা হয়েছে যেন তিনি চিরকালই জীবিত থাকবেন; আবার সঙ্গে তাকে এমনভাবে নাজাত বা পারলৌকিক মুক্তির জন্য কাজ করে যেতে হবে যেন আগামীকাল তার মৃত্যুর দিন। আইনে অবশ্য পারত্রিক মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। পারত্রিক জীবনকে অস্বীকার করে ইহকালের জন্য কাজ করা ইসলামে অনুমোদিত হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য (তিজারা বা তিজারাত) এমন একটি বৃত্তি, যা আইনের সীমার মধ্যে পরিচালিত হলে, ধর্মীয় কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুনিয়াতে তা অনেক কল্যাণ সাধন করতে পারবে।

যে পরিবেশে ইসলামের উন্মেষ সাধিত হয়, তা' বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ ছিল এবং ব্যবসায়ী হিসেবে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) প্রাথমিক জীবনের অভিজ্ঞতা খোদার বাণীর মধ্যেও প্রতিভাত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য আল-কোরআনে যে কেবল নিয়ামত অন্বেষণকারীদের জন্যে সমর্থিত হয়েছে তা' নয়, বস্তুতঃ ধর্মীয় ভাবধারা প্রকাশের ক্ষেত্রেও বাণিজ্যিক সংজ্ঞা ও শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামী ইতিহাসে আগাগোড়া বাণিজ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির স্বর্ণযুগে ব্যবসায়ীগণই সমাজের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রসার এবং সমৃদ্ধি সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। যদিও ব্যবসায়ীগণ সাধারণভাবে রাষ্ট্র-নীতিকে বড় একটা প্রভাবিত করতে পারেননি, তবু আইনবেত্তা ইমাম আবু হানিফার মত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণের প্রভাব অনেক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের চাইতে বেশী ছিল। আরব দেশে প্রাক-ইসলামী যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পণ্যের আদান-প্রদানের রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম সমাজে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে।

দারুল ইসলামের বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সব আইনবিদই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থাৎ দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মধ্যে পণ্য-বিনিময়ের ব্যবস্থা অনুমোদন করেননি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মালিকী আইনবিদগণ স্থল কিংবা সমুদ্রপথে দারুল হারবের সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্য করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালিক অমুসলিমদের দারুল ইসলামে এসে মুসলমানদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু মুসলমানরা দারুল হারবে গিয়ে ব্যবসা করুক, এটা তিনি অনুমোদন করেননি। এর কারণ এই যে, ইমাম মালিক মুসলিমের পক্ষে এমন দেশে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি, যেখানকার লোকেরা পূর্ব পুরুষদের সম্মান করে না, মূর্তি পূজা করে এবং তাদের দেবদেবীকে বিশ্বপালক রাহমানুররাহীম আল্লাহর শরীক করে। অবশ্য অন্যান্য মযহাবের আইনবিদগণ দারুল ইসলামের অভ্যন্তরে বা বাইরে অমুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তবে তাঁরা ব্যবসায়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট লোকজন ও পণ্য-দ্রব্যের চলাচলের ওপরে কতকগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করেন।

দারুল ইসলামের সঙ্গে অমুসলিমদের ব্যবসা-বাণিজ্য

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের নিকট দারুল ইসলামের দ্বার উন্মোচন করে মুসলিম শাসকগণ সত্যিই অভূতপূর্ব ঔদার্য প্রদর্শন করেছেন। সাধারণতঃ, নীতিগতভাবে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম ব্যবসায়ীগণকে চার মাসের জন্য আমান (নিরাপত্তা) প্রদান করা হত। পণ্য দ্রব্যাদির আদান-প্রদান যদি এই সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব না হত, তবে সময় বর্ধিত করে নতুন আমান প্রদান করা হত। যদি কোন ব্যবসায়ী কমপক্ষে এক বছর দারুল ইসলামে অবস্থান করত ও জিম্মী হিসেবে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হত, তবে সাধারণতঃ তাকে কতিপয় সুবিধা দেয়া হত। মুস্তামিন হিসেবে সে দারুল ইসলামে অবাধে চলাফেরা করতে পারত; কেবলমাত্র বায়তুল হারাম বা হেজাযের পবিত্র স্থানসমূহে যাতায়াত তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

পণ্যদ্রব্যাদির অবাধ আদান-প্রদানের ব্যাপারে আইনবিদগণ বিদেশী ব্যবসায়ীদের ওপর কতকগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য ইমামকে উপদেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সাধারণ নীতি হল এই যে, দারুল ইসলামের সঙ্গে দারুল হারবের যুদ্ধগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারবে যুদ্ধের সরঞ্জামাদি রফতানী করা চলে না; কারণ, এতে দারুল হারব দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। সব আইনবিদই এ সম্বন্ধে একমত যে, অস্ত্রশস্ত্র ও সমর-সম্ভার যুদ্ধকালীন

নিষিদ্ধ পণ্যদ্রব্য বলে বিবেচিত হবে। তাই, এগুলোর বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে বেআইনী ঘোষিত হয়। তবে অনেকে এই মতও পোষণ করেন যে ঘোড়া, খচ্চর ও দাসদাসী যুদ্ধে এত অধিক প্রয়োজনীয় যে, এগুলোর বিক্রয়ও নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত। এ ব্যাপারে ইমাম মালিক আরও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি কতিপয় খাদ্যজাত পণ্য এবং পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরআনের বিক্রয়ের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিদেশী ব্যবসায়ী দারুল ইসলামে অবস্থানকালে যদি অনুরূপ কিছু নিষিদ্ধ দ্রব্য ক্রয় করতে চান, তবে তার নিকট সেগুলোর বিক্রয় অবৈধ বলে গণ্য হয় না; কিন্তু দারুল ইসলাম পরিত্যাগ করার পূর্বে তাকে সেগুলো পুনরায় বিক্রয় করে যেতে হবে। বিদেশী ব্যবসায়ীদের তল্লাশী ও নিষিদ্ধ দ্রব্যের রফতানী বন্ধ করার জন্য আইনবেত্তা আবু ইউসুফ দারুল ইসলামের সীমান্তে তল্লাশী ঘাঁটি ও প্রহরা-কেন্দ্রসমূহ (মাসালিহ্) স্থাপনের সুপারিশ করেছেন। অবশ্য, বিদেশী সওদাগরকে শূকরের গোশত, মদ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয় করার অনুমতি দেয়া হয় না। কিন্তু শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এ সব নিয়ম খুব কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করা যায়নি; ফলে অনেক সময় দারুল ইসলাম থেকে জিনিসপত্রের রফতানী ও দারুল হারব থেকে জিনিসপত্রের আমদানী অবাধে চলতে থাকে।

দারুল ইসলামে দু'শ দিরহামের অধিক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করলে বিদেশী ব্যবসায়ীকে সব পণ্যদ্রব্যের ওপর শতকরা দশভাগ পণ্যশুল্ক (উশর) দিতে হত। ইমাম অবশ্য বহির্বাণিজ্যের প্রসারের জন্য শুল্কের হার কমিয়ে দিতে পারেন কিংবা সরকারী আয় বাড়াবার জন্য তিনি শুল্কের হার বাড়িয়েও দিতে পারেন; কিন্তু বছরে একবারের বেশী এ শুল্ক আদায় হত না। যদি কোন বিদেশী সওদাগরের নিজ দেশে মুসলিম ব্যবসায়ীগণ বিনা শুল্কে ব্যবসায়ের সুযোগ পেতেন, তবে ইমামও অনুরূপভাবে অবাধ ব্যবসায়ের নীতি অনুসরণ করতেন। ব্যবসায়ের জন্য ইমামের অধীনস্থ জিম্মীদের কোন বাণিজ্য-শুল্ক দিতে হত না; তবে কেবলমাত্র হেজাযে ব্যবসায়ের জন্য জিম্মীদের অনুরূপ শুল্ক দিতে হত।

দারুল হারবের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য

মুসলিম ব্যবসায়ীদের দারুল হারবে ব্যবসায়ের ব্যাপারে মুসলিম আইনবিদগণ অপেক্ষাকৃত কম উদারতা দেখিয়েছেন; কিন্তু দারুল ইসলামের সঙ্গে অমুসলিম ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যাপারে তাঁরা অধিকতর ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। মালিকী ও যাহিরী আইনবিদগণ মুসলমানদের পক্ষে দারুল হারবে যাওয়া পছন্দ করেননি; কারণ, এর ফলে তারা পৌত্তলিকতা ও দারুল হারবের আইনের

আওতায় আসতে বাধ্য হবেন। ইবনে হাযম এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জেহাদের উদ্দেশ্য কিংবা রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে দৌত্য বা বাণী নিয়ে যাবার জন্য কেবল ইমাম দারুল হারবে গমনের অনুমতি দিবেন। ইমাম মালিক বলেন যে, দারুল ইসলামের সীমান্তে পরিব্রাজকদের গমনাগমন এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের দারুল হারবে যাওয়ার ব্যাপারেও ইমাম কড়া নজর রাখবেন।

তবে অধিকাংশ আইনবিদই বিশেষ করে হানাফীগণ এ ব্যাপারে অনেক বেশী উদারতা দেখিছেন। হানাফীগণ ধর্মাধর্ম পদ্ধতি (আল-হিয়াল আশ-শারিয়া) দ্বারা অনেকগুলো বিধিনিষেধ অতিক্রম করেছেন। আন্তর্জাতিক বিষয়ের মুসলিম আইনবেত্তাগণ এই সব বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন, যেগুলো এখনও বিদ্যমান আছে। বিদেশ হতে কি ধরনের পণ্যদ্রব্য আমদানী করা যাবে এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে দ্রব্য বিনিময়কালে কি পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্রের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি হবে, আর ইসলামী রাষ্ট্র কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে, তা' তারা বিশদভাবে বিবৃত করেছেন।

দারুল ইসলামের ব্যবসায়ের বিধি অনুযায়ী মুসলমানদের শূকরের গোশত ও মদ প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসা এবং সুদের ব্যবসা করতে দেয়া হয় না। যে সব পশু ও উদ্ভিদ যথাক্রমে নোংরা ও ক্ষতিকর, সেগুলোর ব্যবসা থেকেও তাদের বিরত থাকতে হবে; কোন কোন আইনবিদ এই শ্রেণীর বিলাস-উপকরণ ও প্রমোদ জাতীয় দ্রব্যাদির ব্যবসায় না করার পক্ষে মত প্রকশ করেছেন, যেমন হাতীর দাঁত, পুতুল ও বাদ্য-যন্ত্রের ক্রয়-বিক্রয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ, অন্ধ ও দাসদের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, আইনে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও উন্মাদের কোন কিছু বিক্রয়ের আইনানুগ যোগ্যতা নেই। সম্পত্তি দেখতে না পেলে সাধারণ ক্ষেত্রে বিক্রয় অসম্ভব; তাই অন্ধ ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। অবশ্য, তার পক্ষ থেকে অন্য কোন ব্যক্তি তা বিক্রয় করতে পারে। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দাসরা তাদের মালিকের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত বলে এ অধিকার লাভ করেনি।

যে কারণে অমুসলিমকে তার নিজের দেশে (দারুল হারবে) নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে যেতে দেয়া হয় না, ঠিক সেই কারণেই কোন মুসলমান ব্যবসায়ীকে নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ, করারও অনুমতি দেয়া হয় না। মুসলিম সওদাগরকে সাবী (গানিমা হিসেবে প্রাপ্ত মহিলা ও শিশু) এবং লোহা বা লৌহজাত দ্রব্য ও যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দারুল হারবে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় না। তবে নিজের নিরাপত্তার জন্য যদি মুসলিম ব্যবসায়ী তার সঙ্গে দাস-দাসী ও অস্ত্রশস্ত্র বহন করেন এবং দারুল ইসলামে ফিরে আসার সময় যদি তিনি নিশ্চিতভাবে এগুলো তার সঙ্গে

ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেন, তবেই এসব নিয়ে তাকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের বাইরে যেতে দেয়া হয়।

আমান সহ কিংবা আমান ব্যতিরেকে যেইভাবেই হোক, কোন মুসলিম সওদাগর দারুল হারবে পর্যটন বা অবস্থান করলে তাকে দারুল হারবের আইন ছাড়াও নিজ ধর্মের আইন পালন করতে হবে। অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম-মুস্তামিনের ওপর যে সব বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, তাকে তা পালন করতে হবে। যদি তিনি সেখানে অবস্থানকালে অন্য মুসলমানদের ওপরে কোন অন্যায় করেন, তবে দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পর তাকে তার জন্য শাস্তি পেতে হবে। দারুল হারবে অবস্থানকালে মুসলিম মুস্তামিন বিদেশী সরকারকে শুল্ক দিতে পারেন; কিন্তু দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পর তার ওপর অনুরূপ ধরনের কোন শুল্ক ধার্য করা যাবে না। তবে অন্যান্য মুসলমানদের মত সাধারণভাবে তাকেও দারুল হারবে অর্জিত অর্থ সহ তার মোট আয় অনুপাতে কর দিতে হবে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের তাৎপর্য

আইনবিদগণ কর্তৃক মুসলমানদের দারুল হারবে যাতায়াত কিংবা ভ্রমণের ফলে তাদের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশংকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে অমুসলমানদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যই ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ক্ষেত্রে এক বিরাট মাধ্যমরূপে কাজ করেছে। বস্তুতঃ, এর ফলেই মধ্য এশিয়া, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকা ও বিষুবীয় আফ্রিকায় বাণিজ্যপথ ধরে ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটেছে। বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগের মাধ্যমেই ইসলাম-জগত সামরিক বিজয় লব্ধ রাজনৈতিক সীমানার বাইরে বহু দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের আত্ম-প্রতিষ্ঠার পর সিরিয়া ও লেবাননের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। হেনরী পিরিনের মতে, সম্ভবতঃ খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো ইসলামের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে অসম্মত হয় বলেই ইউরোপের সঙ্গে এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়; ইসলামী-রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাকৃত নীতির ফলে এ সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। এর ফলে মুসলিম বাণিজ্য বিভিন্ন পথ ধরে অগ্রসর হয় এবং ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের বিপুল সমৃদ্ধি সাধিত হয়। ক্রুসেড যুদ্ধের আমলে ইউরোপের সঙ্গে আবার লেবাননের বাণিজ্য শুরু হয়। কিন্তু পরে ভারত ও দূরপ্রাচ্যে পৌঁছার জন্য উত্তমাশা অন্ত রীপ ঘুরে নতুন পথ আবিস্কৃত হওয়ার পর পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ সম্পর্ক পুনরায় ছিন্ন হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল অবধি ইউরোপের সঙ্গে সিরিয়া ও লেবাননের সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক এক রকম বন্ধ ছিল। এই শতকে মুসলিম-রাষ্ট্র ও খৃস্টান রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক নব পর্যায়ে উন্নীত হয়।

স্থল ও সমুদ্র—উভয় পথেই বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত থাকে। বহির্বিশ্বের সাথে ইসলামের এই বাণিজ্যিক সম্পর্কের দরুন বিশ্ববাণিজ্যের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কতিপয় বিশেষ রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার বিকাশ সম্ভব হয়।

মুসলমানরা কেবলমাত্র পূর্ব এশিয়া থেকে নতুন নতুন পণ্য-সামগ্রীই (যেগুলো পরে ইউরোপে চালু হয়) আমদানী করেনি, অধিকন্তু তারা চীনাদের নিকট হতে কাগজী মুদ্রার ব্যবহার-প্রণালী আয়ত্ত করে পরে অন্যান্য দেশে এর প্রচলনে সাহায্য করে। ব্যাংকিং পদ্ধতির উন্নয়নেও মুসলমানদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম ব্যাঙ্ক-বিশেষজ্ঞগণই চেক, ঋণপত্র ও হুণ্ডির ব্যবহারকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলেন। বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র (যেমন—বসরা) থেকে মুসলিম ব্যবসায়ীগণ উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব আফ্রিকায় যাতায়াত করতেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, কিভাবে একটি বাণিজ্য-প্রধান নগরের ব্যবসায়ীরা তখনকার দিনে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে বহু দূরবর্তী প্রান্তে স্বচ্ছন্দে পণ্যদ্রব্য বিনিময় করতে পারতেন।

বিংশ অধ্যায়
সালিশী

প্রাক-ইসলাম যুগে সালিশী ব্যবস্থা

সাধারণভাবে স্বীকৃত সামাজিক রীতি ও প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিবদমান পক্ষসমূহের বিরোধ মীমাংসার নীতি হিসেবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সালিশীর ব্যবস্থা চলে আসছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা। তবে প্রকৃতপক্ষে, কোন পক্ষের দাবীর যথার্থতা নিরূপণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে না পৌঁছে, পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ফলে সালিশী অনেকটা মীমাংসাভিত্তিক ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে। বস্তুতঃ, এই ব্যবস্থা এত প্রাচীন যে, খৃস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে (সিরকা-৩১০০) মেসোপটেমীয় নগর-রাষ্ট্র লাগাশের শাসনকর্তা ইয়েনাটম ও মেসোপটেমিয়ার অন্যতম নগর-রাষ্ট্র উম্মার অধিবাসীদের মধ্যে সালিশীর মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা হয়। এ ব্যাপারে উভয়পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে সালিশীর একটি ধারার সংযোজন দেখা যায়। নিকট-প্রাচ্যের প্রাচীন ইতিহাসে সালিশীর অনুরূপ আরো অনেক নজির পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন গ্রীসেই এ ব্যবস্থার ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সীমানা ও নদ-নদী নিয়ে এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিরোধ দেখা দিলে সালিশীর ব্যবস্থা করা হত। বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে ডেলফীর দৈববাণীও অনেক সময় সালিশের কাজ করত এবং এর রায় প্রায় সবাই মাথা পেতে স্বীকার করে নিত। বিবদমান দেশগুলোর বাইরের তৃতীয় কোন রাষ্ট্রকেও সালিশ মানা হত। এই মধ্যস্থ রাষ্ট্র সাধারণতঃ বিরোধের কারণ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করতেন এবং এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিরোধমূলক বিষয় সম্পর্কে রায় প্রদান করতেন।

প্রাক-ইসলাম যুগের আরবে গোত্রের সরদার ও কাহীন (দৈবজ্ঞ বা ভবিষৎ বক্তা) আন্তঃগোত্রীয় বিরোধের ব্যাপারে সালিশ হিসেবে কাজ করতেন। আরবের তা'মীম গোত্রের সরদারগণ প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রসমূহের বিরোধ মীমাংসায় সালিশ হিসেবে তাঁদের সাফল্যজনক ভূমিকার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। অনেক সময় সমাজের উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণও সালিশের কাজ করতেন। উকাযের বার্ষিক মেলায় কিংবা পবিত্র ও শান্তির মাসসমূহে (আশ হুরুল হারাম) সাধারণতঃ এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তি সালিশী

করতেন। আরবের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী এই সব পবিত্র মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। বিভিন্ন গোত্রের দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ব্যাপারেও এই গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সালিশ হিসেবে কাজ করতেন। আরবের ইতিহাস হতে জানা যায় যে, আল-হারিস ইবনে আউফ ও খারিজার মধ্যস্থতায় আবস ও যু'বিয়ান গোত্রের যুদ্ধগত বিরোধের মীমাংসা হয়। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত (সঃ) আরবদের নানাবিধ বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে সালিশ (হাকাম) হিসেবে কাজ করেন। কা'বার ঐতিহাসিক কালো পাথর ওঠানোর ব্যাপারে আরব সরদারদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সালিশীর (তাহকিম) মাধ্যমেই তার মীমাংসা হয়। সে সময়কার আরব গোত্রসমূহের দীর্ঘদিনের বিরোধগুলোর ভেতর মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের বিরোধের বিষয়টি সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই বিরোধে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সালিশ হিসেবে কাজ করেন এবং প্রচলিত আরব-রীতি ও সামাজিক ব্যবহার-বিধি অনুযায়ী এর নিষ্পত্তি করেন। এইভাবে তাঁর মধ্যস্থতায় এই গোত্র দুইটির ঐতিহাসিক শত্রুতার অবসান ঘটে।

ইসলাম ও সালিশী

ইসলাম-পন্থীদের মধ্যে শান্তি ও সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে ইসলামের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে দুইটি বিবদমান মুসলিম দলের মধ্যে আপোষ-রফা কিংবা বিরোধ মীমাংসার মাধ্যম হিসেবে ইসলাম আরবের সালিশী ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দান করেছে। ইসলামের নীতি লঙ্ঘন করা না হলে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যেও সালিশী অনুমোদিত ছিল। আল-কোরআনের নির্দেশ ও হযরত মুহাম্মদের (সঃ) কার্যাবলীতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে হযরত (সঃ) ও ইহুদী গোত্র বানু কোরায়জার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে সালিশীর নজিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে উভয়পক্ষই তাঁদের বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়টি তাঁদের মনোনীত একজন লোকের নিকট মীমাংসার জন্য পেশ করতে সম্মত হন।

এ বিষয়টির কথা উল্লেখ করে আল-শায়বানি বলেন যে, ইমাম সমগ্র যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কিংবা কোন খণ্ড যুদ্ধের অবসানের উদ্দেশ্যে দুই পক্ষের বিরোধ মীমাংসার জন্যে একটি তৃতীয় পক্ষের নিকট বিরোধমূলক বিষয়টি পেশ করতে পারেন। সকলের নিকট সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য একজন ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান মুসলমানকেই সালিশ নিযুক্ত করতে হবে। তাঁকে যদি উভয়পক্ষই স্বেচ্ছায় নিযুক্ত করে থাকেন, তবে তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে তাঁরা বাধ্য থাকবেন। অবশ্য, যদি পূর্বাহ্নে তাঁদের মতামত না নিয়েই তিনি নিযুক্ত হয়ে থাকেন কিংবা তিনি এমন বিবাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, যার সঙ্গে তাঁর মাতা-পিতা, স্ত্রী অথবা তাঁর সন্তান-সন্ততি সংশ্লিষ্ট থাকেন, তবে সে ব্যাপারে তাঁর রায় গ্রাহ্য হবে না।

হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সালিশী

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (খৃস্টাব্দ ৬৫৬-৬৬১) ও সিরিয়ার শাসনকর্তা হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধের অবসানের জন্যে যে সালিশী হয়, সম্ভবতঃ ইসলামের ইতিহাসে সালিশীর ক্ষেত্রে তা-ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাজনৈতিক বিষয়টি এখানে আইনগত দিকের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেভাবে বিষয়টির মীমাংসা করা হয়, তাতে তদানীন্তন যুগের সালিশীর প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণায় পৌঁছা যায়।

আমর-বিন-আল-আস যুদ্ধে মুয়াবিয়ার আসন্ন পরাজয়ের সম্ভাবনার বিষয় বুঝতে পেরে মুয়াবিয়াকে সালিশীর আবেদন জানা ও পরামর্শ দান করেন। আমরের পরামর্শ অনুযায়ী মুয়াবিয়া সালিশীর জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁর সৈন্যদের বর্শার অগ্রভাগে আল-কোরআন তুলে ধরতে নির্দেশ দেন। এর তাৎপর্য এই যে, মুয়াবিয়া তাঁর ও হযরত আলীর মধ্যে কোরআনকে মধ্যস্থ হিসেবে উপস্থাপিত করে যুদ্ধ অবসানের আবেদন করেন। হযরত আলী মুয়াবিয়ার এ চাতুর্যপূর্ণ কৌশল ধরতে পারলেও আল-কোরআনের মাধ্যমে পেশকৃত এ আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তা'ছাড়া, তাঁর অনুগামী ও সমর্থকগণ কোরআনের প্রতি তাদের স্বাভাবিক ভক্তি-শ্রদ্ধাবশতঃ এ আবেদনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ, কোরআনকে মান্য করাটা মুসলমানদের মধ্যে একটা সাধারণ কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত। যাহোক, উভয়পক্ষই স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের পক্ষ হতে একজন সালিশ (হাকাম) নিয়োগে স্বীকৃত হন এবং কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই সালিশকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করেন। হযরত মুয়াবিয়া আমর-ইবনুল-আসকে এবং হযরত আলী আবু মূসা-আল-আশারীকে সালিশ নির্বাচিত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত আলী তাঁর সমর্থকদের চাপের ফলে আবু মূসাকে নিয়োগ করেন। উভয় সালিশকেই জীবন, ধন-সম্পদ এবং তাঁদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। সালিশদের এক বছরের মধ্যে তাঁদের রায় দান করতে বলা হয়। হিজরী ৩৮ সালে (খৃস্টাব্দ ৬৫৯) আধরুহ নামক স্থানে উভয় সালিশ বৈঠকে মিলিত হন এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক যথারীতি স্বীকৃত একটি সন্ধিচুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা শুরু করেন। হুদায়বিয়া চুক্তিকে এই সালিশী চুক্তিটির দলিল প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই পদ্ধতি গ্রহণের ফলে হযরত আলী খলিফার সরকারী পদবী হতে বঞ্চিত হলেন এবং তাঁর মর্যাদা সিরিয়াস্থ তাঁর শাসন-প্রতিনিধি (গভর্নর) মুয়াবিয়ার সমপর্যায়ে নেমে এলো। নীচে চুক্তিটির বিষয়বস্তুর বিবরণ দেয়া হল ঃ

"পরম করুণাময় আল্লাহ'র নামে শুরু করছি।

"আলী-ইবনে-আবুতালিব ও মুয়াবিয়া-ইবনে-আবু সুফিয়ান এতদ্বারা তাঁদের মধ্যে (বিরোধ মীমাংসায় অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে) সালিশীর ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছেন।

আলী কুফাবাসীগণ ও তাঁদের অনুগামী মুমিন মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, আর মুয়াবিয়া শামবাসীগণ (সিরিয়াবাসী) ও তাঁদের অনুগামী মুমিন মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

"আমরা আল্লাহ এবং তাঁর কিতাবের (আল-কোরআনের) নির্দেশিত সালিশীর জন্য আবেদন করছি; কারণ, এছাড়া অন্য কোন পন্থা বা ভিত্তি নেই...এবং উভয় আইনবিদ—আবু মূসা আল-আশারী ও আমর ইবনুল-আস আল্লাহর কিতাবের (আল-কোরআন) নির্দেশিত পন্থার ভিত্তিতে কাজ করবেন...এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবে যদি কোন কিছু না পাওয়া যায়, তবে আইনানুগ সুন্নাহ'র বিধানই তাঁদের কর্মপন্থার ভিত্তি হবে...."

বলাবাহুল্য, চুক্তিটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। সালিশীর উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়াদি সম্পর্কে এতে কোন কিছুর উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র এতে কোরআন ও সুন্নাহকে সালিশীর ভিত্তিরূপে গণ্য করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চুক্তিটির সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতা আমর-ইবনুল-আসকে মূল বিষয়টি হতে দূরে সরে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ দান করেছে; এবং এই সুযোগের মাধ্যমে অন্যতম সালিশ আবু মূসাকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন করে তিনি আলোচ্য বিষয়ের মোড় ঘুরিয়ে দেন ঃ

"আবু মূসা, আপনি কি এটা স্বীকার করেন না যে, উসমানকে (তৃতীয় খলিফা) অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে?"

আবু মূসা সম্মতিসূচক জওয়াব দান করেন।

অতঃপর আমর আবার বলেন ঃ "আপনি কি এটা স্বীকার করেন না যে, মুয়াবিয়া এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন উসমানের উত্তরাধিকারী?"

আবু মূসা এতেও সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

আমর পুনরায় বললেন, আল্লাহ বলেছেন ঃ "......অন্যায়ভাবে যে কাউকেই হত্যা করা হয়, তার উত্তরাধিকারীদের ওপরই আমরা কর্তৃত্ব দান করেছি; হত্যার ব্যাপারে (প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে) সে (উত্তরাধিকারী) যেন সীমা অতিক্রম না করে; এবং (সীমা অতিক্রম না করলে) নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য দান করা হবে"(কোরআন ১৭ ঃ ৩৫)।

এরপর আমর মন্তব্য করলেন ঃ "সুতরাং, এমতাবস্থায় হযরত উসমানের পর মুয়াবিয়া কেন তাঁর উত্তরাধিকারী (অর্থাৎ খলিফা) হবেন না?"

কিন্তু আমর আবার বললেন ঃ "আপনি যদি এই ভয় করেন যে, শাসন-ক্ষমতা পরিচালনার ব্যাপারে মুয়াবিয়ার যোগ্যতা ও অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণ প্রশ্ন তুলবে, তবে আপনি তাদের এই জওয়াব দিতে পারেন যে, মুয়াবিয়া হযরত উসমানের (রাঃ) স্ববংশসম্ভূত এবং উত্তরাধিকারী, আর হযরত উসমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। আপনি আরও বলতে পারেন যে, মুয়াবিয়া রাজনীতিতে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং রাষ্ট্র-

পরিচালনায়ও বিশেষ সুদক্ষ। আর, তা'ছাড়া তিনি রাসূলের (সঃ) অন্যতম সাহাবী ছিলেন।"

আবু মূসা জওয়াবে বললেন ঃ "হে আমর! আল্লাহ্‌কে ভয় কর! হযরত আলী ইবনে আবু তালেব কোরেশদের মধ্যে একজন অতি সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি।"

খলিফা হওয়ার পক্ষে কে সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত, শেষ পর্যন্ত তা' নিয়েই সালিশদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল। ফলে, গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার উপায় বা পদ্ধতির ওপর বিশেষ কোন গুরুত্বই আরোপ করা হল না। আবু মূসা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রাঃ) পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে খলিফা মনোনীত করার বিষয় চিন্তা করেন। পক্ষান্তরে, আমর খলিফার পদে মুয়াবিয়ার পক্ষ সমর্থনের সিদ্ধান্ত করেন।

পরিশেষে আবু মূসাকে লক্ষ্য করে আমর বললেন ঃ "এ ব্যাপারে (খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে) আপনার মত কি?"

আবু মূসা জওয়াবে বললেন ঃ "আমার মত হল, এ দু'জন লোককে (হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়াকে) পদচ্যুত করে মুসলমানদের সাধারণ নির্বাচনের (শুরা বা সাধারণ গণভোট) ওপর বিষয়টি ছেড়ে দেয়া উচিত। তারা তাদের নিজেদের জন্য (তাদের শাসক হিসেবে) তাদের পছন্দ অনুযায়ী যাঁকে খুশী নির্বাচন করবে।" আমর বললেন ঃ "আমার মতও তাই।"

বাহ্যতঃ, অনুরূপভাবে সমঝোতায় পৌঁছে যাবার পর, দু'জন সালিশই সরকারী ভাবে সাধারণ্যে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে প্রস্তুত হলেন। বয়োঃজ্যেষ্ঠ হিসেবে আবু মূসাকে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার জন্য আমর নম্রভাবে অনুরোধ করলেন এবং বললেন যে, তাঁর (আবু মূসার) ঘোষণার পরই তিনি (আমর) তাঁর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করবেন। আবু মূসা একথার পর প্রথম আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং অতঃপর বললেনঃ

"হে লোকগণ! আমরা এই জাতির সমস্যাটি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া উভয়কে অপসারণ করা ছাড়া আর কোন উত্তম সমাধান খুঁজে পাইনি যাতে করে সমগ্র বিষয়টি এই জাতি নিজের হাতে গ্রহণ করবে এবং তাদের যাকে ইচ্ছা, তার ওপর শাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করবে। আমি হযরত আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত করেছি এবং আপনারা যাঁকে যোগ্য মনে করেন, তাঁকে নির্বাচিত করতে পারেন।"

আবু মূসার উপরোক্ত ঘোষণার পর আমর আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন ঃ

"আপনারা এ লোকটিকে (আবু মূসার) বক্তব্য শুনেছেন। তিনি তাঁর বন্ধুকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতের অনুরূপ আমিও তাঁর বন্ধুকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত করেছি। কিন্তু আমি আমার বন্ধু মুয়াবিয়াকে শাসন-পরিচালকের

পদে সমর্থন করছি। কারণ, তিনিই হযরত উসমানের উত্তরাধিকারী এবং এই পদের জন্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি"।

সালিশদের এই ঘোষিত সিদ্ধান্তের মধ্যে তাঁদের পরস্পরের সুস্পষ্ট মতবিরোধ থাকায় স্বাভাবিক কারণেই হযরত আলী এটা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন। তিনি সালিশদের কার্যক্রমের নিন্দাবাদ ও তাঁদের প্রতি দোষারোপ করে বলেন ঃ

"...তাঁরা কোরআনের নীতি থেকে দূরে সরে গেছেন.....এবং কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ না করে তাঁরা প্রত্যেকে নিজের নিজের ইচ্ছামত কাজ করেছে. তাঁদের সিদ্ধান্তের পেছনে কোন প্রামাণ্য ভিত্তি কিংবা কোন পূর্বতন নজির নেই; অধিকন্তু, এই সিদ্ধান্তে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য রয়েছে।...."

আবু মূসার সাথে চাতুরীর জন্য আরব ঐতিহাসিকগণ কঠোর ভাষায় আমরের নিন্দা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ প্রশ্নটিতে তত চাতুর্যপূর্ণ বা প্রতারণামূলক বলে মনে হয় না। কারণ, এতে আসলে বিরোধ-বহির্ভূত একটি সমস্যার ফয়সালায় আবু মূসাকে প্রভাবান্বিত করার ব্যাপারে আমরের বিশেষ দক্ষতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আবু মূসার ক্রটি হল, নির্দিষ্ট বিরোধমূলক প্রশ্নটি (আলী ও মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের অবসানের প্রশ্ন) এবং সালিশ হিসেবে তাঁদের ক্ষমতা-বহির্ভূত অপর প্রশ্নটির (অর্থাৎ খলিফা নির্বাচনের প্রশ্নটি) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থতা। কারণ, মূল বিষয় ও চুক্তির উদ্দেশ্য অনুযায়ী হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধের নির্দিষ্ট প্রশ্ন সম্পর্কে রায় দানের জন্যই আবু মূসা ও আমরকে সালিশ নিয়োগ করা হয়।

সালিশীর তাৎপর্য

অনেক ঐতিহাসিকই প্রাক-ইসলামী যুগ কিংবা ইসলামী যুগে বিরোধ-মীমাংসার পন্থা বা মধ্যম হিসেবে সালিশীর ওপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন; কিন্তু আসলে আরবে কেবলমাত্র গোষ্ঠীগত (এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর) কোন্দল মীমাংসার ব্যাপারেই সালিশী সীমাবদ্ধ ছিল; তাছাড়া, ইসলামের আবির্ভাবের পরে খুব কম ক্ষেত্রেই সালিশীর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। আধরুহ্ সালিশীর ব্যাপারে যেমন ঘটেছে, তেমনি প্রায় ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক সমস্যা থেকে আইনগত সমস্যাকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে, খলিফা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সালিশীর মোকদ্দমার চাইতে কূটনীতি কিংবা যুদ্ধের শরণাপন্ন হতেন। তবে খুঁটিনাটি ব্যাপারে, যেমন গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে হত্যার ক্ষতিপূরণ বা রক্ত মূল্য পরিশোধের প্রশ্নে কিংবা ব্যক্তিগত অথবা আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের বিরোধ-মীমাংসার মত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সালিশীর অনেকটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সাধারণতঃ, জনমত এবং শাসকদের এখতিয়ারাধীন ক্ষমতা বলে সালিশীর বিধানসমূহ কার্যকরী করা হত।

একবিংশ অধ্যায়
কূটনীতি

কূটনীতি সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা

জাতিতে জাতিতে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বহু প্রাচীনকাল থেকেই কূটনীতির রীতি চলে আসছে। কিন্তু ইসলামের রাষ্ট্রীয় আওতার বাইরের অন্যান্য জাতির সঙ্গে যে পর্যন্ত যুদ্ধাবস্থাকে ইসলামের একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক বলে মনে করা হত, সে পর্যন্ত ইসলামে কূটনীতি কেবলমাত্র নিছক শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি। ইসলামের গোড়ার দিকের ইতিহাসে দেখা যায় যে, কূটনীতিকে যুদ্ধের একটা অংশ বা বিকল্প হিসেবেই ধরে নেয়া হত। যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের বাণী প্রচার করার পূর্ব-ঘোষণা হিসেবে কূটনীতি প্রয়োগ করা হত। আবার কূটনীতির মাধ্যমেই যুদ্ধের পরে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের পন্থা নিরূপিত হত। আব্বাসীয় আমলের উপঢৌকন বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ সম্পর্কীয় চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ ব্যাপারে কূটনীতি ব্যবহৃত হত না। এমন কি রাষ্ট্রদূতদের তখনকার দিনে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুপ্তচর বলে সন্দেহ করা হলেও কোন বিশেষ ঘটনা বা সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রদূত পাঠান হত। মোটামুটি রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা ও কূটনীতি প্রায় একই জিনিস ছিল। জাতিতে জাতিতে সম্বন্ধ নির্ধারণের ব্যাপারে তখন কূটনীতির বড় একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। বলতে গেলে কূটনীতি তখন অনেকটা ম্যাকিয়াভেলীয় বা সুবিধাবাদী নীতিভিত্তিক ছিল।

বিদেশী রাজা-বাদশাহদের দরবারে রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অধিকার বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করত এবং এতে কতকগুলো বিশেষ উদ্দেশ্যও হাসিল করা যেত।

রাষ্ট্রদূতগণ রাষ্ট্রীয় বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েই তাঁদের মিশনের সাফল্য ও অসাফল্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে শীঘ্রই তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে ফিরে যেতেন। রাষ্ট্রদূতদের বিশেষ জাঁকজমক ও আদর-আপ্যায়নের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানান হত। তবু তাঁদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর বলে মনে করা হত। তাই, তাঁদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। তাঁরা যাতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদ না পান এবং সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন না করেন, সেদিকেও নজর রাখা হত।

রাষ্ট্রদূত

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞগণ মুসলিম প্রতিনিধিকে রাসূল (বহুবচনে—রুসূল) বা সাফীর (বহুবচনে—সুফারা) বলে অভিহিত করেছেন। রাসূল কথাটি ইরসাল থেকে এসেছে। ইরসাল মানে হল, পাঠানো বা কোন বিশেষ কাজ দিয়ে কোথাও কোন প্রতিনিধি পাঠান। তাই, রাসূল বলতে নবী বা দূত—দুই-ই-বোঝাতে পারে। সাফীর কথাটি সফর থেকে এসেছে। সফর বলতে রাষ্ট্রদূতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সমঝোতা ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কাজও বোঝায়। কিন্তু গোড়ার দিকে এ দুটি শব্দের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি। অবশ্য, পরবর্তী আইনবিদগণ সাফীর বলতে কূটনৈতিক প্রতিনিধি বুঝেছেন এবং রাসূল কথাটি (ধর্ম সম্বন্ধীয়) নবী অর্থে ব্যবহার করেছেন।

মুসলিম রাষ্ট্রদূতগণ খলিফা ও সুলতানের প্রতিনিধিত্ব করতেন। বিশ্বস্ততা এবং জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও নির্ভরযোগ্যতার জন্য খ্যাতিমান ব্যক্তিদের মধ্য হতে রাষ্ট্রদূতদের নিয়োগ করা হত। সাধারণতঃ কার্যদক্ষতা, সাহসিকতা ও উপস্থিত-বুদ্ধির সঙ্গে তাঁদের শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য এবং মানসিক প্রফুল্লতা বিচার করে তাঁদের নিয়োগ করা হত। মধ্যপান তাঁদের জন্যে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল এবং গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক বিধায় নারীদের সংস্পর্শ থেকে তাঁদের দূরে থাকতে হত। খলিফা বা সুলতানগণ প্রায়ই রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করার জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজে পেতেন না। তাই, তাঁরা সাধারণতঃ কূটনৈতিক কাজে দুই বা তিনজনের একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতেন; এর মধ্যে একজন যোদ্ধা ও একজন বিদ্বান ব্যক্তি থাকতেন। তৃতীয়জন সম্পাদক বা সেক্রেটারী নিযুক্ত হতেন।

রাষ্ট্রদূতদের সরকারী চিঠি বহন করতে হত এবং সেগুলো তাঁরা বিদেশী রাষ্ট্র-প্রধানকে সম্বোধন করে পড়ে দিতেন। এ সব চিঠিতে রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র থাকত, যাতে তিনি মৌখিক বাণী নিয়ে পৌছে দিতে পারেন। অনেক সময় এ পরিচয়পত্রে প্রেরিত রাষ্ট্রদূত সম্পর্কে সাধারণ নীতি উল্লেখ থাকত। এতে একথাও লেখা থাকত যে, গোপনীয় তথ্য রাষ্ট্রদূত নিজে মুখে বলবেন।

হযরত মুহাম্মদের (সঃ) আমল থেকে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিদেশে দূত পাঠান হত। মুসলিম ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বাইজান্টীয়াম, মিসর, পারস্য (ইরান) ও আবিসিনিয়ায় ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে দূত (প্রতিনিধি) প্রেরণ করেন। এসব দেশে দূতদের সঙ্গে প্রেরিত পত্রে ব্যবহৃত শব্দ, বাক্য ইত্যাদি সম্পর্কে যে সাধারণ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, দু'একটি বিষয়ে পার্থক্য ছাড়া এগুলো প্রায় একই ধাঁচে লেখা। বাইজান্টীয় সম্রাটের নিকট লিখিত হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পত্রটির ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

"পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের (সঃ) নিকট থেকে রুমের (বাইজান্টীয়ার) সর্বোচ্চ শাসক হেরাক্লিয়াসের প্রতি।

"যাঁরা সত্যকে অনুসরণ করেন, তাঁদের প্রতি শান্তি (সালাম)। আপনাকে আল্লাহর নামে ইসলামে আহ্বান করা আমার কর্তব্য। আপনি যদি (ইসলাম গ্রহণ করেন) মুসলমান হন, তবে আপনি নিরাপদ এবং আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। আপনারা অর্থাৎ কিতাবীরা আমাদের মধ্যে আল্লাহর একই বাণী দেখতে পাবেন। আসুন, আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করি এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন 'ইলাহ' বা উপাস্য গ্রহণ না করি। যদি ঈমান আনেন, তবে বলুন ঃ "আমরা মুসলমান"; আর যদি এতে বিশ্বাস না কারণ, তবে আপনি আপনার লোকদের পাপের জন্যে দায়ী হবেন।"

প্রচলিত বিবরণ হতে জানা যায় যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ ও মিসরের মুকাউকাস হযরতের (সঃ) ইসলামে দাখিল হওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু বাইজান্টীয় সম্রাট জবাব দেন যে, তাঁর প্রজারা ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। আর পারস্যের বাদশাহ হযরতের আহ্বান পত্রটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন এবং পত্রবাহক দূতদের বিতাড়িত করেন। পারস্যের বাদশাহর আচরণের কথা অবহিত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মন্তব্য করেন ঃ "তার সাম্রাজ্যও এমনিভাবেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়বে!"এই কূটনৈতিক আদান-প্রদানের প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ধর্মভিত্তিক।

প্রাথমিক যুগের খলিফাদের (খোলাফায়ে রাশেদা ও উমাইয়া খেলাফত) আমলে বাইজান্টীয়দের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং শুল্ক প্রদানের ব্যাপারেই কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। উমাইয়া খলিফাগণ বিশেষ করে প্রথম মুয়াবিয়া ও আবদুল মালিকের আমলে বাইজান্টীয়দের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং বার্ষিক শুল্ক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এ সময়ে মুসলমানগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আরব ঐতিহাসিকগণ এসব বিষয়ের কোন উল্লেখ করেননি। আর এসব কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা ও চুক্তিগুলোর কোন দলিলও সুরক্ষিত হয়নি।

উমাইয়াদের চাইতে আব্বাসীয় খলিফাগণই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। বাইজান্টীয় সীমান্তে প্রায় বছরই সমর-অভিযান চালান হত। ফলে বন্দী বিনিময় কিংবা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্যে চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাতে হত। তাছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যিক কারণে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তৎকালীন সমসাময়িক প্রায় সকল শাসকের

কাছেই রাষ্ট্রদূত পাঠানোর রীতি ছিল। ফাতেমীয় ও মামলুক শাসকগণ ব্যাপকভাবে এই রীতি অনুসরণ করেন। তাঁরা ইউরোপ এবং মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন।

রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা

বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ নিজেদের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আমান ব্যতিরেকে দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে পারতেন এবং সরাসরি রাজধানীতে উপস্থিত হতে পারতেন। সাধারণতঃ, তাঁদের সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক থাকতেন।

কার্য উপলক্ষে অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রদূতগণ আমান ব্যতিরেকে দারুল ইসলামে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করতেন। একে কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বলা যেতে পারে। যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে এবং নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত থাকলে তাঁরা সাধারণতঃ এই সুবিধা ভোগ করতেন। নিষিদ্ধ কাজগুলো হচ্ছে গুপ্তচর বৃত্তি অথবা দারুল হারবে পাঠানোর জন্যে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা। শাসকদের মধ্যে হিংসাত্মক মনোভাব থাকলে এ সুবিধা সবসময় দেয়া হত না। তবু মুসলিম ও অমুসলিম শাসকগণ কূটনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকে পারস্পরিক মঙ্গলের দিক থেকে কল্যাণকর বলে মনে করতেন।

আব্বাসীয় আমলের শেষের দিকে বিভিন্ন দেশের মর্যাদাবান মুসলমানদের নিকট হতে পাঠানো সরকারী পরিদর্শকদের অভ্যর্থনার জন্য যে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করা হত, তার চাইতে অনেক বেশী জাঁকজমক করা হত বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনায়। মুসলিম শক্তির অবনতির যুগে এ ধরনের জাঁকজমক প্রদর্শন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রদূতগণ সাধারণতঃ খলিফা ও সুলতানদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং ইসলাম জগতের বিভিন্ন রাজধানীতে তাঁদের সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা করা হত। শোভাযাত্রা সহকারে তাঁদের রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হত; রাস্তা বরাবর মিছিল চলত ও দুই পাশে সৈন্যগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। আগমনের পথে থাকত সুসজ্জিত তোরণ। তাঁদের অবস্থানের জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত বাড়ী নির্দিষ্ট করে রাখা হত, যেখানে জমকালোভাবে তাঁদের ভোজ ও আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হত। বাইজান্টীয় রাষ্ট্রদূতগণের বাগদাদ পরিদর্শন সম্পর্কে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

আল-মুক্তাদিরের আমলে হিজরী ৩০৫ সনে (খৃস্টাব্দ ৯১৮) বাইজান্টীয় রাষ্ট্রদূতের বাগদাদ পরিদর্শন সম্পর্কে মুসলিম ইতিহাসে খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া যায়। খলিফা ও তাঁর সুদক্ষ উজির ইবনে আল-ফুরাতের ইচ্ছাক্রমে বাইজান্টীয় রাষ্ট্রদূতকে সাম্রাজ্যের বিস্ময়কর বস্তু, স্থান ও অট্টালিকা এবং অতুলনীয় ঐশ্বর্যের উপকরণসমূহ দেখান হয়। খলিফা আততায়ী ও সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক বুয়াহিদের শাহজাদা অদুদ-

উদ-দওলা কর্তৃক আয়োজিত ফাতেমীয় রাষ্ট্রদূতের অভ্যর্থনা এর আর একটি দৃষ্টান্ত। ফাতেমীয় রাষ্ট্রদূত খলিফার শান-শওকত ও ইযযত-সম্ভ্রম দেখে অবাক হন। কর্ডোভার খলিফা ও মিসরের মামলুক সুলতানগণও বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতেন।

রাজধানীতে অবস্থানকালে রাষ্ট্রদূতদের যে কেবল আদর-আপ্যায়ন করা হত তাই নয়, তাঁদের প্রসিদ্ধ ও মনোরম স্থানগুলো দেখান হত এবং নানারকমের উপহার ও সম্মানী পোশাক দেয়া হত। অতিথিসেবক রাষ্ট্রের আতিথেয়তা এবং এর মার্জিত কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আদাব-কায়দার গৌরব-মহিমার নিদর্শন হিসেবেই এসব উপহার দেয়া হত। উপহার আদান-প্রদান কূটনীতি সম্পর্কীয় অনুষ্ঠানেরই অংশ বিশেষ ছিল।

কাজ শেষ হয়ে গেলে রাষ্ট্রদূতগণ বিদায়ের অনুমতি চাইতেন। এ সময়ও অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানের অনুরূপ অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হত।

কূটনৈতিক মিশনের কার্যাবলী

স্থায়ীভাবে কূটনৈতিক মিশন বিনিময় করার প্রথা সেকালে প্রচলিত ছিল না। তাই, সাধারণতঃ কতগুলো বিশেষ কাজের জন্যে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের বিদেশে পাঠান হত। মুসলিম শাসকদের প্রয়োজন ও অবস্থার ওপরই এ কূটনৈতিক কার্যাবলীর প্রকৃতি নির্ভর করত। ইসলামের উন্মেষ-কালের গোড়ার দিকে প্রধানতঃ শত্রুপক্ষকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানোর মধ্যেই কূটনৈতিক মিশনের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিল। ইসলাম গ্রহণ না করলে এ আহ্বানের মাধ্যমেই শত্রুদের সঙ্গে বিরোধের সূচনা হত বা যুদ্ধ ঘোষণা করা হত। দ্বিতীয়তঃ শত্রুপক্ষ ইসলাম গ্রহণে রাজি হলে বা ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন আপোষে আসতে চাইলে রাষ্ট্রদূতগণ শান্তিচুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে আলোচনা শুরু করতেন।

আব্বাসীয় আমলে যখন ইসলামী রাষ্ট্র সুসংহত হয়ে আসে, তখন রাষ্ট্রদূতদের ওপর অন্যান্য আরও অনেক গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্যভার ন্যস্ত হয়। খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতি চুক্তি ও শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্যই যে কেবল রাষ্ট্রদূত বিনিময় করা হত তাই নয়, উপহার, যুদ্ধবন্দী বিনিময় এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য কিংবা বাণিজ্যের সুবন্দোবস্ত করার জন্যও রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের ব্যবস্থা ছিল। অভ্যর্থনাকারী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করাও কূটনীতিকদের কাজ ছিল। কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, গুপ্তচরবৃত্তি। যে রাষ্ট্র তাঁদের প্রেরণ করত আর যে রাষ্ট্র তাঁদের গ্রহণ করত, তারা সকলেই দূতদের প্রদত্ত বিশেষ সুবিধার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করত; আর একইভাবে সতর্ক থাকত, যাতে অপরপক্ষ বিশেষ কোন সুবিধা করতে না পারে।

মুসলিম শাসকও কার্যতঃ স্বাধীন প্রাদেশিক শাসকদের মধ্যেও রাষ্ট্রদূত বিনিময় করা হত। সরকারী চিঠিপত্র ছাড়াও মোবারকবাদ, সমবেদনা জ্ঞাপন কিংবা শাসক বংশগুলোর মধ্যে বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় করার জন্যও রাষ্ট্রদূত পাঠান হত। বিরোধ এড়ানোর জন্য, যাতায়াতের পথ সুগম করা এবং পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের ব্যাপারে মুসলিম ও অমুসলিম শাসকদের মধ্যে পরস্পর শুভেচ্ছা বাণীও পাঠান হত।

আব্বাসীয় আমলে বাইজান্টীয়দের সঙ্গে বিরোধ লেগেই থাকত এবং প্রতি বছরই নতুন করে গোলমাল বেধে উঠত বলে যুদ্ধবন্দী বিনিময় বা বন্দীমুক্তির ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য রাষ্ট্রদূত পাঠান হত। তাছাড়া, একটি রাষ্ট্রকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবার জন্যও রাষ্ট্রদূতদের পাঠান হত।

মুসলিম কূটনীতি ও বিশ্ব রাজনীতি

আব্বাসীয়দের সময়ে মুসলিম রাষ্ট্র সব চাইতে বেশী সুসংহত হয়। এই সময়ে দুনিয়ায় চারটি বড় বড় শক্তি ছিল। প্রাচ্যে ছিল আব্বাসীয় ও বাইজান্টীয় সাম্রাজ্য। এরা রোম ও পারস্যের বিরোধিতারই যেন জের টেনে চলেছিলেন। একে অপরের রাষ্ট্রে এঁরা হামলা করতেন ও ঘন ঘন শান্তিচুক্তি অমান্য করতেন। আর ইউরোপে ছিল ফ্র্যাঙ্কীয় সাম্রাজ্য ও স্পেনের উমাইয়া সাম্রাজ্য। এই দুই দলেও বিরোধ লেগেই ছিল। এই বিরোধিতার শুরু হয় তুরস্কের যুদ্ধে চার্লস মার্টেলের হাতে আবদুর রহমানের পরাজয়ের মাধ্যমে (৭৩২ খৃস্টাব্দ)।

প্রাচ্যের দুই শক্তি ও পশ্চিমী দুই শক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বহু বছর ধরে চলে। ফলে, তৃতীয় পিপীন (খাটো পিপীন নামে পরিচিত) বাইজান্টীয়দের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছতে চান। তিনি এ উদ্দেশ্যে কন্সট্যানটিনোপলে এক কূটনৈতিক মিশন পাঠান (৭৫৭ খৃস্টাব্দ)। বাইজান্টীয় সম্রাট এতে সাড়া দেন এবং পিপীনের নিকট তাঁর পক্ষ হতে একটি কূটনৈতিক মিশন পাঠান। কিন্তু পোপের নীতি ছিল, ফ্রাঙ্ক ও বাইজান্টীয়দের মধ্যে যাতে কোন রকম চুক্তি না হয়। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই আব্বাসীয়গণ স্পেনকে বশে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সফল হয়নি। এভাবেই দুটো মুসলমান রাষ্ট্র ও দুটো খৃস্টান রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে লাগল। এ জটিল অবস্থার ফলেই শেষ পর্যন্ত ফ্র্যাঙ্কীয় শাসকগণ ও আব্বাসীয় খলিফাগণ পরস্পর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হন। আর এর ফলেই কর্ডোভা ও কন্সট্যানটিনোপলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ল্যাটিন ইতিহাস ও সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও ফ্র্যাঙ্কীয় ও আব্বাসীয় শাসকদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কের কোন বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, মুসলিম ইতিহাসে এর কোন উল্লেখ নেই। এ নীরবতার ফলে 'এ্যাচেন' ও 'বাগদাদের'র মধ্যে যেভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় বলে পশ্চিমী ইতিহাসে বর্ণনা করা হয়েছে, মুসলিম ঐতিহাসিকদের নীরবতার দরুন অনেকে এ সব সম্পর্ক আদৌ স্থাপিত হয়েছিল কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

পশ্চিমী ইতিহাসের সূত্র থেকে জানা যায় যে, ফ্র্যাঙ্ক ও আব্বাসীয়দের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রথমে পিপীনই এগিয়ে আসেন (খৃস্টাব্দ ৭৬৫)। তিনিই প্রথম কূটনৈতিক মিশন পাঠান দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের দরবারে। আল-মনসুর তখন বাইজান্টীয় সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনবছর পর একটি আব্বাসীয় কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল এবং খলিফার প্রদত্ত উপহার সঙ্গে নিয়ে পিপীনের প্রেরিত মিশনটি ফিরে আসে। মুসলিম কূটনীতিকদের পিপীন সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং পরিশেষে তাঁদের মার্সাই হতে ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করে দেন।

পিপীনের পুত্র শার্লম্যানও প্রাচ্যে কয়েকটি মিশন পাঠান। খলিফা হারুনুর রশীদের দরবারে তিনি দুটি (৭৯৭ খৃস্টাব্দ ও ৮০২ খৃস্টাব্দ) ও জেরুযালেমের মহামান্য প্রধান যাজকের নিকট একটি মিশন পাঠান (৭৯৯ খৃস্টাব্দ)। ৭৯৭ খৃস্টাব্দে তিনি দু'জন ফ্র্যাঙ্কিশ প্রতিনিধি ও একজন ইহুদী দোভাষীকে পাঠান। উপরোক্ত দুইজন ফ্রাঙ্ক প্রাচ্য দেশেই মারা যান এবং চার বছর পর দোভাষীটি একটি হাতী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ৮০২ খৃস্টাব্দে শার্লম্যান বাগদাদে দ্বিতীয় মিশন পাঠান। তাঁর মিশনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং শার্লম্যান 'পবিত্র ও মহান রাজশক্তি' রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। বাকলার বলেন যে, এ কূটনৈতিক আদান-প্রদানের ফলে শার্লম্যান জেরুযালেমের ওপর অনেকখানি কর্তৃত্ব লাভ করেন। বাকলার আব্বাসীয়দের অধীনে জেরুযালেমের ওয়ালী হিসেবে শার্লম্যানের পদমর্যাদার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, আল-মাওয়ার্দীর পুস্তকে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে এ ধরনের পদ অমুসলিমের ওপর বর্তাতে পারে।

৭৯৯ খৃস্টাব্দে জেরুযালেমের প্রধান যাজক শার্লম্যানের নিকট একটি মিশন প্রেরণ করেন। শার্লম্যান এর পরিবর্তে প্রাসাদ-সামগ্রী ও উপঢৌকন সহ প্রধান যাজকের নিকট একটি ফিরতি মিশন পাঠান। ৮০০ খৃস্টাব্দে প্রধান যাজকের কাছ থেকে আর একটি মিশন আশীর্বাদস্বরূপ পবিত্র সমাধি ও হযরত ঈসার ক্রুস-স্থানের চাবি ও একটি প্রতীক নিশান নিয়ে শার্লম্যানের দরবারে উপস্থিত হয়।

ল্যাটিন ঐতিহাসিকদের প্রচলিত বর্ণনা মেনে নেয়া হলে একথা বলা চলে যে, দু'জন শক্তিমান শাসকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনই এ সব কূটনৈতিক মিশনের উদ্দেশ্য ছিল। নিজেদের মর্যাদা বাড়াবার জন্যই তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শাসক শার্লম্যান ও হারুন উভয়েই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। কন্সট্যান্টিনোপল ও কর্ডোভার বিরুদ্ধে মিলিত হওয়াও তাঁদের অপর উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী দুই শতাব্দীর ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, শার্লম্যানের পক্ষে ফিলিস্তিনের দখল পাওয়া ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মুসলিম রাজশক্তির পতনের যুগে ক্রুসেড যোদ্ধাগণ ফিলিস্তিন দখল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুসলমানদের কাছে তাদের ঘোর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

জেরুযালেমের প্রধান যাজক ও শার্লম্যানের মধ্যে যে দৌত্যের আদান-প্রদান চলে তার উদ্দেশ্য থেকে বোঝা যায় যে, এটা ছিল একটা নিছক ধর্মীয় ব্যাপার—রাজনৈতিক বিষয় নয়। কারণ, খলিফাকে না জানিয়ে বা তাঁর অনুমতি না নিয়ে ফিলিস্তিনের খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান পাদ্রীর পক্ষে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা চালান সম্ভব ছিল না।

বোধহয়, তিনি শার্লম্যান ও হারুনুর রশীদের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করেন। পশ্চিমী খৃস্টান শাসকদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যাতে করে প্রাচ্য দেশে নৈতিক ও বাস্তব ক্ষেত্রে চার্চের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। প্রধান পাদ্রীর রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করার কোন ক্ষমতা ছিল না। তাই তিনি শার্লম্যানের কাছে উপহার হিসেবে চাবি ও প্রতীক নিশান পাঠিয়েছিলেন।

কূটনীতির গুরুত্ব

যুদ্ধকালে আমান প্রাপ্তির ফলে যেমন সাধারণ লোকের পক্ষে এক দেশ থেকে অপর দেশে যাতায়াত করা সম্ভব হত, তেমনি মুসলিম ও অমুসলিম শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সরকারী পর্যায়ে সংযোগ স্থাপন করা চলত কূটনীতির মাধ্যমে। জেহাদ বা ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ ঘোষণা করার পূর্বে কতকগুলো নীতি মেনে চলতে হত। যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত এর দৃষ্টান্ত। কূটনীতির মাধ্যমেই ইসলামে আহ্বান জানানো সম্ভব হত। তাছাড়া, মুসলমান শাসকদের অমুসলমানদের সঙ্গে দশ বছর পর্যন্ত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা অনুমোদিত ছিল। মুসলিম ও অমুসলিম রাষ্ট্রদূতদের আলাপ-আলোচনার মাধমেই এটা সম্ভব্ হত। কাজেই কূটনীতি ইসলামের যুদ্ধনীতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করত। কূটনীতি ছিল জেহাদের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

জেহাদের শক্তি যখন মন্দীভূত হয়ে আসল এবং যখন ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য জাতির শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠল, তখন শান্তিপূর্ণ ব্যাপারে কূটনীতির গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল। বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে, উপহার বিনিময়ে ও অন্যান্য সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কূটনীতি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করল।

সেকালে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সংযোগের ব্যবস্থা খুব বেশী উন্নত না হওয়ায় রাষ্ট্রদূত প্রেরণের ফলে যে কেবল সংবাদ বিনিময়ে সাহায্য হত তাই নয়,অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনেও কূটনীতি যথেষ্ট সাহায্য করত। কূটনৈতিক কার্যাবলী ছাড়াও রাষ্ট্রদূতগণ তাঁদের সঙ্গে দূর দেশ থেকে বিভিন্ন জিনিসপত্র, বই ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি নিয়ে আসতেন। ফলে তাঁদের দেশের লোক অন্যান্য জাতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করত। অন্য কোন উপায়ে এসব খবরাখবর পাওয়া তখন সম্ভব ছিল না। সে যুগে ইবনে জুবাইর (১১৪৫-১২১৭ খৃস্টাব্দ) ও ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৭ খৃস্টাব্দ) প্রমুখ পরিব্রাজকগণ তদানীন্তন পৃথিবীর অনেক জায়গায় বহুদিন ধরে পরিভ্রমণ করার পর নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তেমনি রাষ্ট্রদূতগণও বিচিত্র ও বিস্ময়কর দেশসমূহ পরিভ্রমণ করে (শার্লম্যানের দূতগণ এর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত) স্বস্ব সম্রাট বা বাদশাহ এবং দরবারের সভাসদদের নিকট তাঁদের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতেন। কাজেই কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নও সম্ভব হয়েছিল।

দ্বাবিংশ অধ্যায়
নিরপেক্ষতা

ইসলাম ও নিরপেক্ষতা

যে রাষ্ট্র সারা দুনিয়ার সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিরোধমূলক সম্পর্ককেই সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করেছে এবং যে রাষ্ট্র কেবল চুক্তির মাধ্যমে অল্পকালের জন্য শান্তি কামনা করে এসেছে, সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে এমন আর একটি রাষ্ট্রের কোন মিল থাকতে পারে না যে রাষ্ট্র পূর্বোক্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে ও তার শত্রুদের সঙ্গে সদ্ভাবমূলক সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। নিরপেক্ষতা বলতে যদি কোন রাষ্ট্রের সেই মনোভাবকে বোঝায়, যার ফলে সে রাষ্ট্র কোন পক্ষ অবলম্বন না করে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে পারে, তবে এ অবস্থা মুসলিম আইনবিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়নি।

মুসলিম শাসনব্যবস্থা মেনে নিয়ে বা অস্থায়ী শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যে রাষ্ট্র ইসলামের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে রাজী হয় না, সে রাষ্ট্রের সঙ্গে আইনগতভাবে ইসলামের যুদ্ধ লেগেই থাকে। মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী আইন অনুযায়ী পৃথিবীকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে; প্রথমটি হল, মুসলিম ভূখণ্ড এবং মুসলিম বিজিত দেশগুলোকে নিয়ে গঠিত দারুল ইসলাম আর দ্বিতীয়টি হল, পৃথিবীর বাকি অংশ নিয়ে গঠিত দারুল হারব। কতিপয় আইনবিদ তৃতীয় একটি বিভাগের কথাও বলেছেন। এটা হল, দারুল আহদ বা দারুস সুলহ বা ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহ। কিন্তু অধিকাংশ আইনবিদই একে দারুল ইসলাম কিংবা দারুল হারবের অংশ বলে গণ্য করেছেন। কোন আইনবিদই ইসলামের আইনের আওতার বাইরে কোন রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের মধ্যবর্তী কোন মর্যাদা দান করেন নি।

ইসলামী আইনের বিধানে নিরপেক্ষতা বলে কোন কিছু নেই। কিন্তু আইন প্রয়োগের বেলায় ধর্মীয় বিধানে ও বাস্তব ক্ষেত্রে কতকগুলো ব্যতিক্রমমূলক বিষয় স্বীকার না করে পারা যায়নি। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে ইসলামী রাষ্ট্র কতকগুলো অঞ্চল একেবারেই আক্রমণ করেনি; ফলে এগুলো জেহাদের আওতা থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সহচরদের প্রতি এসব দেশের সহৃদয় ব্যবহারের পুরস্কার হিসেবেই হোক কিংবা এগুলোর দুর্গমতার দরুনই হোক, এরা জেহাদ থেকে রেহাই পেয়েছে। এসব ভূখণ্ড আর একটি পৃথক বিভাগের গোড়া পত্তন করেছে। বিভিন্ন 'দার' বা বিভাগ দিয়ে বিশ্বের বিভাগীকরণের পদ্ধতি অনুযায়ী এই স্বতন্ত্র বিভাগটিকে "দারুল হিয়াদ" বা নিরপেক্ষ জগত বলে অভিহিত করা যায়।

নিরপেক্ষ জগত কিন্তু বিশ্বের উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ নয়। কারণ, ইসলামের আইন ব্যবস্থায় সব দেশকেই নীতিগতভাবে বিরুদ্ধবাদী বা শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে করা হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের আইনের অনুমোদন বলে যে সব রাষ্ট্র নিরাপত্তা লাভ করে ও জেহাদ থেকে রেহাই পায়, তাদেরই কেবল নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা চলে। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে এই শ্রেণীর রাষ্ট্রকে সত্যিকার নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলা যায় না। কারণ, আধুনিক আইনে একটা রাষ্ট্র দুই বা ততোধিক যুদ্ধলিপ্ত রাষ্ট্রের প্রতি নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করতে পারে। এ শ্রেণীর রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ বা নিরপেক্ষকৃত রাষ্ট্র বলা যেতে পারে; অর্থাৎ এইসব রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা যুদ্ধে ব্যাপৃত রাষ্ট্রগুলোসহ বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়ে থাকে। ইসলামী আইনের বিধানেও নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়েছে। তবে এই আইনে নিরপেক্ষতা বলে বিশেষ কোন সংজ্ঞার অস্তিত্ব নেই। নিরপেক্ষতার রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য বা তাৎপর্য আইন প্রণেতাদের মতামত অপেক্ষা নিরপেক্ষকরণের মধ্যেই অধিকতর সুস্পষ্ট।

আবিসিনিয়ার মর্যাদা

মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে আবিসিনিয়া বহু যুগব্যাপী এক অভূতপূর্ব মর্যাদার আসন লাভ করে এসেছে। অমুসলিম রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে এ দেশ এমন একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে রইল, যাকে ইসলামী রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় জেহাদের গণ্ডীর বাইরে রেখেছে।

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনবিশেষজ্ঞগণ এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত বিশ্লেষণ কালে আবিসিনিয়ার সঙ্গে প্রথম যুগের ইসলামী রাষ্ট্রের গভীর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের নজির এবং এ সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। তাছাড়া কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম বাহিনী আবিসিনিয়ায় অনুপ্রবেশ করেনি। মুসলিম আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আবিসিনিয়ার মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এর ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর কিছুটা আলোকপাতের প্রয়োজন রয়েছে।

ইসলামের উন্মেষ পূর্বে আবিসিনিয়া আরবের ইয়ামেন অঞ্চল আক্রমণ করে এবং সেখানে খৃস্টধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। সাধারণ প্রচলিত বর্ণনা হতে জানা যায় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জন্মের বছরেই (খৃস্টাব্দ ৭৫০) আবিসিনিয়া মক্কা আক্রমণ করে। এই সামরিক অভিযানই যে, আরব ও আবিসিনিয়ার মধ্যে একমাত্র সংযোগ ছিল তাই নয়, এ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কের ফলেই এককালে মক্কায় আবিসিনীয় কলোনী গড়ে ওঠে এবং আরবী ভাষায় বহু আবিসিনীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে।

সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশে ইসলামের জন্ম হয় এবং গোড়া থেকেই প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সাথে পদে পদে সংগ্রাম করে একে অগ্রসর হতে হয়। এ অবস্থায়

প্রতিবেশী দেশ আবিসিনিয়াকে সমর্থক হিসেবে পাবার সম্ভাবনার কথা ভাবা হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ, আবিসিনিয়াবাসীরা পূর্ব হতেই আরবে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে এসেছে। হযরত রাসূলের (সঃ) অনুসারীদের মধ্যে কয়েকজন আবিসিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন মহানবীর প্রিয় মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রাঃ)। আবিসিনিয়ার সঙ্গে মহানবীর সম্পর্কের ইতিহাস অনেকটা প্রবাদ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ সম্পর্ক আবিসিনিয়াকে এক বিরাট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রায় সব মুসলিম ইতিহাস থেকেই জানা যায় যে, ইসলামের গোড়া পত্তনের প্রথম যুগে মক্কার পৌত্তলিকদের অকথ্য নির্যাতন হতে আত্মরক্ষার জন্যে হযরতের (সঃ) বহুসংখ্যক অনুগামী আবিসিনিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। মক্কা হতে মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় এই হিজরতকে "প্রথম আবিসিনীয় হিজরা" বলা হয়। এই হিজরত সংঘটিত হয় ৬১৫· খৃস্টাব্দে। অবশ্য, ইতিহাসে এই হিজরত সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বর্ণনায় কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে। সাধারণ ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মক্কা হতে হযরত রাসূলের অনুগামীদের আবিসিনিয়া হিজরতের অব্যবহিত পরেই আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট মক্কার কোরেশ সরদারগণ মোহাজেরদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানিয়ে এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। কোরেশদের সঙ্গে মোহাজেরদের বিরোধের কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে নাজ্জাশী মোহাজেরদের ডেকে পাঠান। মোহাজেরদের নেতা জাফর বিন আবু তালেব এ ব্যাপারে নাজ্জাশীর প্রশ্নের জওয়াবে যে বক্তব্য পেশ করেন, তা এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করছে। পরবর্তীকালে অনুরূপ অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে মুসলিম প্রতিনিধিগণ এই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। নীচে এই ঐতিহাসিক বিবৃতিটির বিবরণ দেয়া হল ঃ

"হে বাদশাহ! আরবের অন্ধকার যুগে (আইয়্যামে জাহেলিয়া) আমরা এমন এক জাতি ছিলাম যারা অজ্ঞানতার অতলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ছিলাম, মূর্তিপূজায় ব্যাপৃত থাকতাম, হারাম খাদ্য ভক্ষণ করতাম, গর্হিত ও লজ্জাজনক কাজ করতাম, নিজ বংশের অতি নিকটতম আত্মীয়কে হত্যা করতাম; প্রতিবেশীদের দাবী-দাওয়া এবং তাদের সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব অস্বীকার করতাম; আমাদের মধ্যে আমরা যারা সবল ছিলাম তারা দুর্বলদের অধিকার হরণ করতাম এবং অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে তাদের দাবিয়ে রাখতাম। এ অবস্থা অপ্রতিহতভাবে চলতে লাগল...অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের মধ্য হতে আমাদের জন্য একজন নবী পাঠালেন, যাঁর বংশমর্যাদা, সততা, বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা ও মহান গুণাবলী সর্বজনবিদিত। তিনি আল্লাহর একত্বে (তওহিদে) আস্থা জ্ঞাপন এবং আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ ও তাঁর ইবাদাত করার জন্যে আমাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানালেন। এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের অজ্ঞানতার যুগের উপাস্য পাথর ও প্রতিমার পূজা পরিত্যাগ করার জন্যও আহ্বান জানালেন। তিনি আমাদের সত্য কথা বলতে, বিশ্বস্ত

হতে এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করতে বলেছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের গর্হিত কার্যাবলী ও অবৈধ রক্তপাত হতে বিরত থাকতে, লজ্জাজনক কাজ ও মিথ্যাচার বর্জন করতে, এতিমদের হক ও অধিকার হতে বঞ্চিত না করতে এবং ধর্মশীলা ও সাধ্বী নারীদের কুৎসা রটনা হতে দূরে থাকার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আমাদের এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা করতে এবং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করতে, নামাজ আদায় করতে, আর দরিদ্রকে সাহায্য, খয়রাত ও আশ্রয় দান করতে এবং রোজা রাখতে আদেশ দিয়েছেন। ... তাই, আমরা তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আল্লাহ তাঁর নিকট যা (যে সব বাণী বা কালাম) নাযেল করেছেন এবং তাঁকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন, তা অনুসরণ করলাম। আমরা তাই একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করি এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করি না। এবং আমাদের জন্য যে সব কাজ হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে, আমরা তা পরিত্যাগ করেছি; আর যে সব কাজ আমাদের জন্য অনুমোদন (যায়েজ বা হালাল) করা হয়েছে, আমরা তা' পালন করছি। এই সত্য পথ অনুসরণের ফলে আমাদের দেশের অনেক লোক আমাদের শত্রু হল এবং আমাদের ওপর নিপীড়ন চালাতে লাগল; তারা আমাদের এই মহান ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত করে পুনরায় আমাদের পৌত্তলিকতার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করতে লাগল।"

বাদশাহ নাজ্জাশীর সঙ্গে আলোচনায় হযরত জাফর আল-কোরআনের সমর্থন পেশ করেন (কোরআন-১৯ ঃ ১৬-৩৪)। ফলে নাজ্জাশী মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণের সিদ্ধান্ত করেন। মোহাজেরদের বিরুদ্ধে প্রেরিত কোরেশ প্রতিনিধিদের দাবী-দাওয়ায় তিনি কোনরূপ কর্ণপাত করলেন না। বর্ণিত আছে যে, এরপরও মুসলিম মোহাজেরদের একটি বা দুটি দল আবিসিনিয়া হিজরত করেন।

আর একটি ঘটনা মুসলমানদের আবিসিনিয়ার প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন করে তোলে। এই ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বাদশাহ নাজ্জাশীকে ইসলাম গ্রহণের যে দাওয়াত পাঠান, নাজ্জাশী তার অনুকূলে জবাব দান করেন। হিজরী ৮ সালে হযরত বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বানপত্র পাঠান। নাজ্জাশীর কাছেও তিনি অনুরূপ একটি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রে তিনি বলেন ঃ

> "পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের (সঃ) কাছ থেকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর প্রতি।
>
> আপনার প্রতি সালাম। আল্লাহর সব প্রশংসা যিনি এক, মহান ও পবিত্র, করুণাময় এবং নির্ভরযোগ্য হেফাজতকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর রূহ এবং বাণীস্বরূপ। এবং তিনিই (আল্লাহ) তাঁকে মহাআশীষপ্রাপ্ত, মহাসাধবী মরিয়মের কাছে পাঠান এবং তার ফলেই মরিয়মের গর্ভে তাঁর জন্ম হল। তিনি (আল্লাহ) নিজের আত্মা থেকে হযরত ঈসাকে সৃষ্টি করেন—তাঁর নিজেদের প্রশ্বাস দিয়ে তাঁকে জীবনীশক্তি দান করেন। এভাবেই

তিনি হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। আমি আপন লা-শরীক এবং আসমান, জমিন ও শেষ বিচার দিনের মালিক আল্লাহর উপাসনা করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমার রিসালাত মেনে নিন। আমাকে অনুসরণ করুন এবং আমার অনুগামীদের জামাতে দাখিল হোন। কারণ, আমি আল্লাহর রাসূল।...আপনার রাজকীয় সার্বভৌমত্বের গর্ব পরিত্যাগ করুন। আমি আপনাকে ও আপনার প্রজাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদাত মেনে নিতে আহ্বান জানাচ্ছি। আমার কর্তব্য শেষ হল। আমি আমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা, যাঁরা আমার উপদেশ শুনলেন, তাঁরা যেন এর দ্বারা উপকৃত হন। সত্য ধর্মের আলোকের পথে যিনি চলবেন, তাঁর প্রতি সালাম।"

মুসলিম ইতিহাসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, বাদশাহ নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহর (সঃ) পত্রখানি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর মাথায় ও ললাটে স্পর্শ করেন এবং তাঁর (হযরতের) রিসালাত কবুল করেন। তিনি হযরতের নিকট উপহার পাঠান এবং সেই সঙ্গে এই মর্মে তাঁর চিঠির জওয়াব প্রেরণ করেন ঃ

"পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের (সঃ) প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। আল্লাহ তাঁর রহমতের ছায়ায় আপনাকে আশ্রয় দান করুন এবং তাঁর অফুরন্ত আশীষ আপনার ওপর বর্ষিত হোক। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনিই আমাকে ইসলামে দাখিল করেছেন। আপনার চিঠি আমি পাঠ করেছি। আপনি হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সবই সত্য এবং সত্য ধর্মের কথা। কারণ, তিনি তাছাড়া আর অধিক কিছুই বলেননি। আসমান-জমিন ও শেষ বিচার দিনের মালিকের ওপর আমি আমার বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করছি। আপনার মহান উপদেশবলী সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি।....আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল; এবং আমি একথা জাফরের সামনে ঘোষণা করেছি এবং তাঁর নিকট ইসলাম কবুল করেছি। হে রাসূল! জগতসমূহের স্রষ্টা রাব্বুল আলামীনের ইবাদাতের জন্যে আমি নিজকে সমর্পণ করলাম। আমি আমার পুত্রকে আপনার কাছে আমার ব্যক্তিগত দূতরূপে পাঠাচ্ছি। কিন্তু আপনি যদি হুকুম করেন, তবে আমি নিজে গিয়ে আপনার পবিত্র পথ-নির্দেশের পথে নিজকে উৎসর্গ করব। আমি পুনরায় সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনার বাণী সত্য।"

ঐতিহাসিক বাজ বলেন, "আমরা যখন আবিসিনিয়ার খৃস্টানবাদের অতি গোঁড়া ও ধর্মান্ধ প্রকৃতির কথা স্মরণ করি, তখন আরমাহ (নাজ্জাশী) ও তাঁর পাদ্রীদের ইসলাম গ্রহণ খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হয়।" হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নাজ্জাশীর কাছে লিখিত পত্রে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে তাঁর মতামতের ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন; কিন্তু এতে তিনি রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কোন কথাই বলেননি। হয়তো সেই কারণেই বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁর আহ্বান প্রত্যাখান করার কোন কারণ খুঁজে

পাননি। প্রথম থেকেই আবিসিনিয়া মুসলিম আক্রমণ থেকে রেহাই পায়। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে মুসলিম বাহিনী আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করেনি। পরে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলাম আবিসিনিয়ায় প্রবেশ লাভ করে। বিশেষ করে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা লোহিত সাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে আবিসিনিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পান। এর ফলেই শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের পক্ষে আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু শক্তি বলে ইসলাম কখনো আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করেনি।

আবিসিনিয়ার মর্যাদা সম্বন্ধে আইনগত মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে আইনবিদ ও ধর্মবেত্তাগণ অন্যান্য যে কোন বিবেচনা বা প্রসঙ্গ অপেক্ষা প্রথম যুগের মুসলমানদের প্রতি আবিসিনিয়ার মৈত্রীসুলভ মনোভাব সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসগুলো দ্বারাই বেশী প্রভাবান্বিত হয়েছেন। আবিসিনিয়াবাসীদের সততা, সাহস ও সারল্য সম্পর্কে রাসূলে আকরম হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কতকগুলো প্রশংসাসূচক মন্তব্যের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আছে। এ হাদিসটির বার বার উল্লেখ দেখা যায়। এতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মুসলমানদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন ঃ "যতদিন পর্যন্ত আবিসিনিয়াবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোমাদের ওপর আক্রমণ না করবে, ততদিন তাদের শান্তিতে থাকতে দিও।" ইমাম মালিক এ হাদিসটি যথার্থ কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। তবুও তিনি এর নির্দেশ মেনে চলতে মুসলমানদের উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন যে, মুসলমানগণ গোড়া থেকে রীতি হিসেবে আবিসিনিয়া আক্রমণ থেকে বিরত থেকে এসেছেন। আতা ইবনে আবিরাবাহ্ এ মতের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। খৃস্টানদের সম্পর্কে আল-কোরআনের আয়াতের (৬ ঃ ৮৫, ৮৬) উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, কোরআনে মুসলমানদের দৃষ্টিতে খৃস্টানদের একটা বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কোরআনের এই আয়াতগুলো আবিসিনিয়া-বাসীদের লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। কারণ, এদের সঙ্গেই গোড়ার দিকে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) অনুসারীরা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বাস্তব কার্যধারা হাদিসেরই সমর্থন করে এসেছে। মুসলিম রাষ্ট্রের বিস্তৃতির প্রাথমিক যুগে আবিসিনিয়া ছাড়া আর সব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করা হয়। ফলে, জেহাদ থেকে আবিসিনিয়ার অব্যাহতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ইমাম মালিক আবিসিনিয়া সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন যে, মুসলিম শাসকগণ রীতি হিসেবে আবিসিনিয়াকে আক্রমণ থেকে রেহাই দিয়ে এসেছেন।

মুসলিম আইনবিজ্ঞানের বিধান অনুসারে যে দেশ জেহাদ থেকে রক্ষা পাবে, তা হয় দারুল ইসলামের অন্তর্গত হবে, নতুবা ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে 'দারুল আহাদ' হবে। একথা হয়ত বলা চলে যে, বাদশাহ নাজ্জাশী কর্তৃক ইসলাম গ্রহণ তাঁর দেশকে দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করারই শামিল। কিন্তু ইসলামী আইনের রূপায়ণই আসলে ইসলামের মাপকাঠি। সুতরাং, যেহেতু ইসলামী আইন আবিসিনিয়ায় প্রয়োগ

করা হত না, তাই একে দারুল ইসলামের অংশ বলে মনে করা হয়নি। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্‌ যদিও হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) আল্লাহর নবী বলে স্বীকার করেছেন, তবু উপরোক্ত কারণেই এদেশ দারুল ইসলামের অংশ নয়।

আবিসিনিয়া যদি দারুল ইসলাম ও দারুল হারব কিছুই না হয়, তবে একে মাঝামাঝি এক ধরনের একটা কিছু বা 'দারুল হিয়াদ' বা নিরপেক্ষ জগত বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ, এ এমন একটি দেশ যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র একে তার প্রসার এলাকার বাইরে রেখেছে। কাজেই এদেশ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে গণ্য হত। যে পর্যন্ত মুসলমানদের আক্রমণ না করবে, সে পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রও এ রাষ্ট্রকে আক্রমণ না করার আইনগত প্রতিশ্রুতি দেয়।

নুবিয়া

নুবিয়ায় আবিসিনিয়ার মত ঘটনা সংঘটিত হয়নি; ফলে নুবিয়াকে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই নুবিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে নুবিয়ার পারস্পরিক ভিত্তিতে ব্যবসাগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমর বিন-আস কর্তৃক মিসর বিজয়ের পর মুসলমানদের সঙ্গে নুবিয়াবাসীদের একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়। এতে উভয়পক্ষই বুঝতে পারল যে, অহেতুক একে অন্যের ভূখণ্ড আক্রমণ না করে পারস্পরিক সমঝোতায় আবদ্ধ হওয়াই ভাল। অতঃপর মিসরের পরবর্তী শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ-ইবনে-আবি সারাহ একটি চুক্তি সম্পাদনা করেন (খৃস্টাব্দ-৬৫২)। এতে স্থির হয় যে, নুবিয়ার অধিবাসীগণ প্রতি বছর ইসলামী রাষ্ট্রকে ৩৬০ জন দাস এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ গম, যব, ঘোড়া ও পোশাকাদি শুল্ক হিসেবে দান করবে। চুক্তিটির বিবরণ নীচে দেয়া হল ঃ

"এটা সেনাপতি আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে সাদ-বিন-আবি সারাহ্‌ কর্তৃক নুবিয়ার সরদার ও অধিবাসীদের প্রতি অঙ্গীকৃত চুক্তি। এ চুক্তি আসোয়ানের সীমান্ত থেকে আলওয়া পর্যন্ত নুবিয়ার ছোট বড়ো সকল অধিবাসীর প্রতি প্রযোজ্য।

"আব্দুল্লাহ-বিন-সাদ নুবিয়ার অধিবাসী, প্রতিবেশী মিসর রাষ্ট্রের মুসলিম এবং অন্যান্য মুসলিম ও জিম্মীদের মধ্যেও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করছেন।

"আপনাদের নুবীয় জাতি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের (সঃ) রক্ষাকবচের ছায়াতলে নিরাপত্তা ভোগ করবে। যতদিন আপনারা চুক্তিটি পালন করবেন, ততদিন আমরা আপনাদের আক্রমণ করব না বা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব না কিংবা আপনাদের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করব না। সফরকারী হিসেবে আপনারা আমাদের দেশে সফর করতে পারবেন; কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবেন না। আমরাও সফরকারী হিসেবে (স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে নয়) আপনাদের দেশে প্রবেশ করব। মুসলমানগণ ও তাদের মিত্রগণ যখন আপনাদের দেশে প্রবেশ করবেন বা ভ্রমণ করবেন, তখন তারা সে স্থান পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আপনারা তাদের নিরাপত্তার ভার নেবেন।

"আপনাদের দেশে মুসলমানদের কোন দাস পালিয়ে গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া মাত্র আপনারা মুসলিম রাষ্ট্রে ফিরিয়ে দেবেন। আপনারা তার ওপর কোন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। কোন মুসলমান তাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে তাকে আপনারা বাধা দিতে বা ভয় দেখাতে পারবেন না। সে (মুসলিম) ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে আপনাদের সাহায্য করতে হবে। আপনাদের নগরে যদি মুসলমানগণ কোন মসজিদ নির্মাণ করেন, তবে আপনারা তা সযত্নে রক্ষা করবেন। কাউকে সেই মসজিদে ইবাদাত করতে বাধা দিতে পারবেন না। আপনারা মসজিদখানিকে পরিষ্কার করে রাখবেন ; এতে নিয়মিত প্রদীপ দেয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং একে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবেন।

"প্রতি বছর আপনারা মুসলমানদের প্রধান শাসকের নিকট ৩৬০ জন দাস প্রেরণ করবেন। দাস-দাসীগণ যেন মধ্যম প্রকারের এবং সবল ও সুস্থ হয়—অতি বৃদ্ধ বা স্বল্প বয়স্ক শিশু যেন না হয়। এদের আপনারা আসোয়ানের শাসনকর্তার নিকট সমর্পণ করবেন।

"আলোয়া হতে আসোয়ান সীমান্ত পর্যন্ত কোন শত্রু আপনাদের ওপর হামলা চালালে মুসলমানগণ তাকে প্রতিরোধ করতে কিংবা তার আক্রমণ থেকে আপনাদের রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে না। আপনারা যদি মুসলমানদের কোন দাসকে আশ্রয় দেন অথবা কোন মুসলমান বা তার মিত্রকে হত্যা করেন কিংবা আপনাদের নগরে মুসলমানগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ ধ্বংস করেন বা ৩৬০ জন দাস থেকে একজনও কম প্রদান করেন, তবে এ শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে; এবং আবার আমাদের ও আপনাদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ এর বিচার করেন (অর্থাৎ বিরোধের সুরাহা করেন); কেননা, আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

"এই শর্তগুলোর ভিত্তিতেই আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের (সঃ) চুক্তি ও ওয়াদা দ্বারা আবদ্ধ হচ্ছি ; এবং আপনারা আপনাদের ধর্ম বিশ্বাস মতে যাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ও মহত্তম বলে মনে করেন — সেই নবীগণ এবং আপনাদের ধর্ম ও জাতির পরম শ্রদ্ধাভাজন পুণ্যাত্মা মহাপরুষদের নামে আমাদের সাথে এই চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছেন। আমাদের ও আপনাদের মধ্যে সম্পাদিত এই চুক্তিতে আল্লাহ্ সাক্ষী রইলেন।

"উমর-বিন-সুরাহবিল কর্তৃক হিজরী ৩১ সনের রমযান মাসে (এপ্রিল-মে ঃ ৬৫২ খৃস্টাব্দ) চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হল।"

নুবিয়াবাসীগণ মুসলমানদের যে শুল্ক প্রদান করত, তাকে "বাকত" বলা হত। এ শুল্ক জিযিয়া শ্রেণীভুক্ত ছিল না; কারণ, নুবিয়াবাসীগণ জিম্মীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এমতাবস্থায় অনুরূপ বার্ষিক শুল্ক প্রদানকে মুসলমানদের নিকট তাদের আত্মসমর্পণের কোন নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা যায় না। এটা ছিল অনেকটা পারস্পরিক বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বা চুক্তিভিত্তিক একটা ব্যবস্থা। লক্ষ্যণীয় যে, চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে শুল্ক প্রদানের সময়ে নুবিয়াবাসীগণ সম্মানস্বরূপ মুসলমানদের নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত ৪০টির অধিক দাস এবং অন্যান্য উপহার (বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্য পশু, যেমন হাতী,

জিরাফ ও চিতাবাঘ) প্রদান করে। অপরপক্ষে মুসলমানগণ বিনিময়ে তাদের গম, বার্লি, পানীয় দ্রব্য, অশ্ব এবং অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী প্রদান করে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই যে, চুক্তিটির পারস্পরিক বিনিময় ভিত্তিক প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায় তাই নয়, বস্তুতঃ আইনবিষয়ক এবং রাজনৈতিক শর্তেও এটা সুপরিস্ফুট রয়েছে। এই শর্তাদির ভিত্তিতেই মুসলমানগণ ও নুবিয়াবাসীগণ পরস্পরের রাষ্ট্রে ভ্রমণকারীদের সফরের সুযোগ দান, পরস্পরের দেশে মহান নবীগণ এবং পরস্পরের ধর্মমত ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের (যেমন নুবিয়ায় মুসলমানদের মসজিদ) প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং পরস্পরের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে স্বীকৃত হয়। চুক্তির কার্যকালের মেয়াদ সম্পর্কে কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি; ফলে সাধারণ বিধি ও নিয়ম অনুসারে চুক্তিটি দশ বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়নি। তবে 'বাকত' (নির্ধারিত শ্রেণীর শুল্ক) পরিশোধের নিয়ম বার্ষিক হওয়ায়, উভয়পক্ষই সময়ে সময়ে খুব সহজেই চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে নিতেন। এ অবস্থার ফলে কার্যতঃ দেখা যায় যে, মিসরে ফাতেমীয় খেলাফত পর্যন্ত ৬শ' বছরের অধিককাল চুক্তিটি অক্ষুণ্ন ছিল।

মুসলিম আইনে দখলের পূর্বে ইসলামের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ নুবিয়ার মর্যাদার প্রশ্ন আর একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দুটো বিষয়ে আবিসিনিয়া থেকে এর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ, ইসলামী রাষ্ট্র নুবিয়াকে আবিসিনিয়ার মত জেহাদ থেকে রেহাই দেয়নি। অবশ্য, চুক্তিকালীন সময়ে এর ওপর কোন আক্রমণ করা যেত না। তাই নুবিয়াকে যে দারুল হারব থেকে আলাদা করা হল, তা ছিল নিতান্ত অস্থায়ী। উভয়পক্ষের চুক্তি পালনের ইচ্ছার ওপরই এ ব্যবস্থা নির্ভর করত। যদি চুক্তি লঙ্ঘন করা হত কিংবা যে কোন একটি পক্ষ খবর পাঠিয়ে (নাবধ) চুক্তিটির পরিসমাপ্তি চাইত, তবে তখনই নুবিয়া দারুল হারবের অংশ হয়ে যেত; দ্বিতীয়তঃ, ইসলামী রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় নুবিয়াকে দারুল হারব থেকে আলাদা করেনি। বস্তুতঃ অবস্থার চাপে পড়ে অন্ততঃ প্রথম দিকে ইসলামী রাষ্ট্র নুবিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থের দিক হতে ইসলামী আইনের বিধান নুবিয়াকে সাময়িকভাবে জেহাদের আওতার বাইরে রাখতে স্বীকৃতি দান করেছে। কার্যতঃ দেখা যায় যে, দীর্ঘ ছয় শতাব্দীব্যাপী নুবিয়া জেহাদ থেকে মুক্ত থাকে।

জেহাদের আওতার বাইরে থাকা কালে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দিক থেকে নুবিয়া দারুল ইসলাম (কারণ, এখানে ইসলামী বিধান কার্যকরী ছিল না) কিংবা দারুল হারব কোনটাই ছিল না। ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকায় একে 'দারুল আহদের' পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, নুবিয়ার শান্তিচুক্তির প্রকৃতি অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পাদিত শান্তিচুক্তির চেয়ে আলাদা ধরনের। কারণ, চুক্তি অনুযায়ী একে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে ইসলামী রাষ্ট্রকে কোন রাজস্ব দিতে হত না। কেবলমাত্র পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই নুবিয়া ইসলামী রাষ্ট্রকে একটা শুল্ক প্রদান করত। নুবিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির শর্তে এই ব্যবস্থা স্বীকৃত হওয়ায় মুসলিম আইনে একে (নুবিয়াকে) একটা বিশেষ মর্যাদা দান করা হয়। এদিক থেকে কতকাংশে

এর মর্যাদা অনেকটা আবিসিনিয়ার অনুরূপ ছিল। চুক্তির কার্যকালের মেয়াদ পর্যন্ত উভয়পক্ষ এই মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে স্বীকৃত হয়। নুবিয়ার এ মর্যাদাকে (চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত) বিশেষ এক প্রকারের নিরপেক্ষতা বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

সাইপ্রাস

সাইপ্রাস (কুবরাস) উপরোক্ত বিশেষ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার আর একটি দৃষ্টান্ত। ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে মুসলিম আইন ব্যবস্থায় সাইপ্রাস একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে।

প্রথম মুয়াবিয়া যখন ৬৪৮ খৃস্টাব্দে সাইপ্রাস আক্রমণ করেন, তখন সাইপ্রাস ছিল বাইজান্টীয়দের অধিকারভুক্ত দ্বীপ।

এ দ্বীপটি বাইজান্টীয়দের শুল্ক প্রদান করত। সাইপ্রাস দখল করলে মুসলমানদের সঙ্গে বাইজান্টীয়দের আর একটি যুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা ছিল। পূর্ব থেকেই তাদের সঙ্গে মুসলমানদের ভূমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই ছিল। তাই নতুন সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে সাইপ্রাসকে এই দুই বৃহৎ শক্তির (মুসলিম ও বাইজান্টীয়) মধ্যবর্তী একটা রাষ্ট্রে (Buffer State) পরিণত করা হয়। চুক্তিতে স্থির হয় যে, সাইপ্রাসকে প্রতি বছর মুসলমানদের ৭০২০ দিনার প্রদান করতে হবে। বাইজান্টীয়দের সঙ্গে সাইপ্রাসের এ ধরনের শুল্ক সম্পর্কীয় চুক্তি আগে থেকেই ছিল। এখন সাইপ্রাসের অধিবাসীদের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে এ শুল্ক ধার্য হল। স্থির হল, মুসলমান ও তার শত্রুদের মধ্যে সাইপ্রাস কোন পক্ষ অবলম্বন করবে না। তবে মুসলমানদের তারা বাইজান্টীয়দের গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর দেবে। বালাযুরী বলেন, চুক্তিতে এও স্থির হয় যে, "নৌ-অভিযানের সময় মুসলমানগণ সাইপ্রাস দ্বীপের কোন ক্ষতি সাধন করবে না; আবার সাইপ্রাসবাসীগণও তাদের সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না।"

৬৫৪ খৃস্টাব্দে হযরত মুয়াবিয়া আবার সাইপ্রাস আক্রমণ করেন। কারণ, সেই সময়ে চুক্তির খেলাফ করে এক নৌ-যুদ্ধে সাইপ্রাসবাসীরা বাইজান্টীয়দের জাহাজ দিয়ে সাহায্য করে। সাইপ্রাসবাসীগণ চুক্তি লঙ্ঘন করলেও হযরত মুয়াবিয়া পূর্বের চুক্তির শর্তাদি অক্ষুণ্ন রাখেন এবং পুনর্বাসনের জন্যে সাইপ্রাসে ১২,০০০ লোক পাঠান। সেই সময়ে মুয়াবিয়া সাইপ্রাসে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। তাছাড়া, তিনি দ্বীপটিতে একটি নগর নির্মাণ করেন এবং বালবাক থেকে কিছুসংখ্যক লোক ও একদল ফৌজ সেখানে মোতায়েন করেন। পরে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযিদ এদের ফিরিয়ে নেন এবং নগরটা ধ্বংস করতে হুকুম দেন। শেষ পর্যন্ত ৬৪৮ সনের চুক্তির ভিত্তিতে সাইপ্রাসের আইনগত মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

খলিফা আবদুল মালিকের (খৃস্টাব্দ ৬৮৫-৭০৫) অধীনে একটি নৌ-অভিযানের ফলে সাইপ্রাসে মুসলিম প্রভাব অনেকখানি কমে আসে। ৬৮৯ সনে সম্পাদিত এক চুক্তিতে খলিফা বাইজান্টীয় শক্তিকে বার্ষিক শুল্ক দিতে রাজি হন। আরো ঠিক হয়,

সাইপ্রাস থেকে প্রাপ্ত শুল্ক মুসলিম ও বাইজান্টীয়গণ ভাগ করে নিবে এবং সাইপ্রাস উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নিরপেক্ষ থাকবে।

সাইপ্রাসের অবস্থা ছিল সঙ্গীন। প্রাথমদিকে বাইজান্টীয় ও মুসলিম শাসনে সাইপ্রাস ছিল পরাধীন। শেষে এ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি অর্ধেক হারে বার্ষিক শুল্ক ভাগ করে নিয়ে সাইপ্রাসের স্বাধীনতা স্বীকার করতে রাজি হয়।

আব্বাসীয় আমলে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইসলামের নৌ-শক্তির অবনতি, উমাইয়াদের সঙ্গে আব্বাসীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং আফ্রিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী আগলাবিদ ও ফাতেমীয় রাজবংশের অভ্যুত্থানের ফলে পরিস্থিতি অনেকখানি বাইজান্টীয়দের পক্ষে অনুকূল হয়। সাইপ্রাসবাসীদের মুসলিমদের স্বপক্ষে আনবার জন্য খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর (৭৫৪-৭৭৫ খৃস্টাব্দ) বার্ষিক শুল্ক কমিয়ে দিয়ে ৬৪৮ সনের চুক্তিতে নির্দিষ্ট মূল শুল্ক প্রবর্তন করেন। কারণ, উমাইয়া আমলে এ শুল্ক কয়েকবার বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু বাইজান্টীয়দের প্রতি সাইপ্রাসবাসীদের সহানুভূতি থাকায় এতে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি।

সাইপ্রাসের শাসনকর্তা আবদুল মালিক ইবনে-সালেহ ইবনে-আব্বাসের (মৃত্যু ৮১২ খৃস্টাব্দ) আমলে বাইজান্টীয়দের উসকানিতে সাইপ্রাসের এক বিরোধী দল বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল, সাইপ্রাসকে শুল্ক প্রদান থেকে মুক্ত করা। আবদুল মালিক বিদ্রোহ দমন করে দ্বীপটিকে সম্পূর্ণ দখল করে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্ত র্ভুক্ত করতে উদ্যত হন। এ উদ্দেশ্যে সাইপ্রাসের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিটি বাতিল করে দেবার স্বপক্ষে তিনি আইনগত মতামত জানতে চান এবং তদানীন্তন যুগের খ্যাতনামা আইনবিদদের কাছে মতামতের জন্যে পত্র লেখেন। আইনবিদগণ চুক্তিটি বাতিল করে দেবার পক্ষে মত দেননি। সাইপ্রাসের আইনগত মর্যাদা সম্পর্কে আইনবিদদের কতকগুলো মতামত আমাদের আলোচনার দিক থেকে বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। তাই, সেগুলো পুরোপুরি এখানে দেয়া হল।

মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিক-ইবনে-আনাস (মৃত্যু ৭৯৫ খৃস্টাব্দ) এই মর্মে সাইপ্রাসের গভর্নর আবদুল মালিকের পত্রের জবাব দেন ঃ

> "সাইপ্রাসবাসীদের সঙ্গে আমাদের শান্তিচুক্তি বহু দিনের এবং শাসনকর্তাগণ তা পালন করে এসেছেন। কারণ, তাঁরা চুক্তির শর্তগুলোকে সাইপ্রাসবাসীদের পক্ষে অসম্মানজনক ও হেয়কর এবং মুসলমানদের পক্ষে শক্তির উৎস বলে মনে করেছেন। এর ফলে মুসলমানরা শুল্ক ভোগ করতেন ও শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করার সুযোগ পেতেন। তবু, আমি এমন কোন শাসকের কথা জানি না, যিনি চুক্তি ভঙ্গ করেছেন বা তাদের শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই যতদিন তাদের দিক থেকে চুক্তি ভঙ্গের কোন নিদর্শন না পাওয়া যায়, ততদিন আমি তাদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করতে কিংবা চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে যথেষ্ট সংকোচবোধ করি। কারণ, আল্লাহতায়ালা বলেন, "যতদিনের মেয়াদ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে

তোমাদের চুক্তি হয়েছে, ততদিন তোমরা চুক্তিটি পালন কর"; (কোরআন-৯ ঃ ৪); "অতঃপর যদি তারা ঠিকভাবে না চলে, প্রতারণা পরিত্যাগ না করে এবং তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে যদি তোমরা স্থির নিশ্চিত হয়ে থাক, তবে তোমরা তাদের আক্রমণ করতে পার। এ ক্ষেত্রে আক্রমণ করা ন্যায়সঙ্গত হবে এবং তোমরা সাফল্য লাভ করবে। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তারা অপদস্থ ও আপমানিত হবে।"

মুসা ইবনে আয়ুন নিম্নলিখিত মতামত ব্যক্ত করেছেন ঃ

"এ ধরনের ঘটনা পূর্বে ঘটেছে; কিন্তু প্রত্যেক বার শাসনকর্তাগণ তাদের মাফ করে দিয়েছেন। কারণ, আমি প্রাথমিক যুগের শাসকদের মধ্যে এমন একজনকেও দেখিনি, যিনি সাইপ্রাসবাসী বা অন্যান্য কারোর সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। এমনও হতে পারে যে, তাদের নেতাগণ যা করেছেন সাধারণ সাইপ্রাসবাসীদের তাতে কোন হাতই ছিল না। তাই, যাই ঘটুক না কেন, আমি চুক্তিটি ও এর শর্তগুলো পালন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। আল-আউযায়ীকে আমি একটা দৃষ্টান্ত দিতে শুনেছি। এক ব্যক্তি মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পরে অমুসলমানদের কাছে মুসলমানদের গোপনীয় তথ্য সরবরাহ করে। আউযায়ী বলেন—'তারা যদি জিম্মী হয়, তবে তারা এর দ্বারা চুক্তিটি ভঙ্গ করেছে এবং তাদের নিরাপত্তার অধিকার বিনষ্ট করেছে। এ অবস্থায় শাসনকর্তা ইচ্ছা করলে তাদের হত্যা করতে পারেন বা ক্রুসবিদ্ধ করতে পারেন। আর যদি যুদ্ধের পর অধীনতা স্বীকারের ফলে তাদের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে মুসলমানগণ তাদের নিরাপত্তার জন্য দায়ী নয়; এক্ষেত্রে শাসনকর্তা তাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিটি বাতিল করে দিতে পারেন। কারণ, আল্লাহ প্রতারকদের ভালোবাসেন না'!"

ইসমাইল-ইবনে-আয়াশ নিম্নলিখিত মতামত ব্যক্ত করেছেন ঃ

"সাইপ্রাসের অধিবাসীরা তাদের স্ত্রী-পরিবার নিয়ে বাইজান্টীয়দের হাতে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। তাদের এ অবস্থায় আমাদের উচিত তাদের পক্ষাবলম্বন করা এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তাফলিসবাসীদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে হাবিব ইবনে মাসলামা লেখেন ঃ "যদি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা থেকে মুসলমানদের কোন কিছু বিরত করে এবং সে সময়ে কোন শত্রু তোমাদের পদানত করে, এ অবস্থায় তোমরা মুসলমানদের প্রতি অনুগত থাকলে এ ব্যাপারে চুক্তিভঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য হবে না।" তাই আমি বলতে চাই যে, সাইপ্রাসবাসীদের সঙ্গে চুক্তিটি বলবত থাকবে এবং তারা নিরাপত্তা ভোগ করবে। কারণ, আল-ওয়ালিদ ইবনে ইয়াযিদ যখন তাদের সিরিয়ায় বহিষ্কৃত করেন, তখন মুসলমানগণ এ কাজকে অন্যায় বলে মনে করেন এবং আইনবিদগণও এটা অনুমোদন করেননি। ফলে ইয়াযিদ বিন আল-ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি পুনরায় তাদের সাইপ্রাসে

ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। এ নীতি মুসলমানগণ সমর্থন করেছেন এবং এটা ন্যায়ানুগ বলে গণ্য হয়েছে।"

আল-লায়েত ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে ইউয়ানা, ইয়াহইয়া ইবনে হামজা, আবু ইসহাক আল-ফাযারী ও মাখলাদ ইবনে আল-হোসেন প্রমুখ আইনবিদগণ তাঁদের জবাবে বলেন যে, যেহেতু সাইপ্রাসবাসীরা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করেছে, সে অবস্থায় মুসলমানরাও চুক্তিটা নাকচ করে দিতে পারেন এবং তাদের শাস্তির বিধান করতে পারেন।

যে সব আইনবিদ সাইপ্রাস চুক্তি বাতিল করে দেবার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন, তাঁদের জওয়াবে প্রদত্ত কতগুলো বিষয় বিবেচনা করে দেখা উচিত। এতে সাইপ্রাসের আইনগত মর্যাদা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য রয়েছে।

প্রথমতঃ, সাইপ্রাস কেবল ইসলামের অধীনস্থ (শুল্ক দেবার পর) রাষ্ট্র ছিল না; এ দ্বীপ বাইজান্টীয়দের অধীনেও ছিল। কাজেই সাইপ্রাসবাসীগণ কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারটি বাইজান্টীয় অনুশাসনের ওপরও নির্ভর করত।

ইবনে আয়াশের মতে, বাইজান্টীয়দের চাপে সাইপ্রাসবাসীগণ চুক্তিটির শর্ত পালন করতে না পারলে, মুসলমানগণের পক্ষে চুক্তিটি লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে গণ্য হবে না। বাইজান্টীয় ও মুসলিম উভয়পক্ষের যৌথ বাধ্যবাধকতা সাইপ্রাসবাসীদের ওপর প্রযুক্ত রয়েছে বলে মুসলমানদের একক বাধ্যবাধকতা সাইপ্রাস পালন করতে না পারলেও ইসলামী রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে এ দ্বীপটি রক্ষা পাবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিধানে সাইপ্রাস মধ্যবর্তী বা বন্ধনী রাষ্ট্র (Buffer state) বলে গণ্য হত।

দ্বিতীয়তঃ, সাইপ্রাস ইসলামী রাষ্ট্রকে শুল্ক প্রদান করলেও মূসা ইবনে আয়ুনের মতে এখানকার অধিবাসীরা জিম্মী হিসেবে গণ্য হত না। তাই, তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের দুশমনদের গোপনীয় সংবাদাদি প্রেরণ করে, তবে মুসলমানরা চুক্তি নাকচ করে দেবার ওজর খুঁজে পাবেন; কারণ, তাদের নিরপেক্ষতা আর অক্ষুণ্ন থাকবে না। অপরপক্ষে, জিম্মীগণ যদি শত্রুকে খবর সরবরাহ করে, তবে ইসলামের অধীনস্থ সম্প্রদায় হিসেবে তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে; কিন্তু তাদের চুক্তি বাতিল করে দেবার প্রশ্ন এখানে থাকবে না।

দারুল ইসলামের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সাইপ্রাস দারুল ইসলামের অংশ বলে গণ্য হয়নি। কারণ, সেখানকার অধিবাসীরা জিম্মী হিসেবে গণ্য হত না; আর ইসলামী আইনও সে রাষ্ট্রে কার্যকরী ছিল না। অপরপক্ষে, তাকে দারুল হারবের পর্যায়েও ফেলা যায় না। কারণ, মুসলমান ও বাইজান্টীয়গণ সাইপ্রাস আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। আবিসিনিয়াকে ইসলামের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ মনোভাবের জন্য এবং নুবিয়াকে মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য জেহাদের এলাকা থেকে বাইরে রাখা হয়। কিন্তু সাইপ্রাসের বেলায় এসব কিছুই ঘটেনি। সাইপ্রাস এমন সমুদ্র বেষ্টিত

এক ভূখণ্ড, যা মুসলিম ও বাইজান্টীয় নৌ-আধিপত্যের অমীমাংসিত সংগ্রামের কেন্দ্রস্থল ছিল। সাধারণতঃ কোন ভূখণ্ড যদি দুই বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মধ্যে অবস্থিত হয়, তবে তার নিরপেক্ষতা রক্ষার অধিক সম্ভাবনা থাকে। এভাবেই ভূমধ্যসাগরীয় দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে চুক্তির ফলে সাইপ্রাসকেও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয়। মুসলিম আইনে এর মর্যাদা নিরপেক্ষ জগতের শামিল বলে গণ্য হয়।

উপসংহার

একটি হাদিসে আছে যে, সর্বশেষে যে জাতিকে মুসলমানরা আক্রমণ করবে, তারা হবে তুর্কী জাতি। এদের ওপর মুসলিম আক্রমণের এই বিলম্বের কারণ, এ জাতির বলিষ্ঠতা ও এ দেশের ভৌগোলিক পরিবেশ। এ হাদিসটি প্রামাণ্য হোক আর না-ই হোক, এতে অমুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি ইসলামের মনোভাব সু-প্রকাশিত হয়েছে; অর্থাৎ আজ হোক বা কাল হোক, জেহাদ সব দেশের বিরুদ্ধে চালিয়ে যেতে হবে, তা সে দেশের জাতিত্ব ও ভৌগোলিক পরিবেশ যে কোন প্রকৃতিরই হোক না কেন। মুসলিম আইনে আবিসিনিয়া ছাড়া বোধহয় আর কোন দেশকে জেহাদ থেকে রেহাই দেয়া হয়নি। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, নুবিয়া ও সাইপ্রাস এবং সম্ভবতঃ তুর্কীগণ স্থায়ীভাবে জেহাদের এলাকা থেকে বাদ পড়েনি; যতদিন পর্যন্ত তারা চুক্তির শর্ত পালন করে, কেবল ততদিন তাদের নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে আলাদা করে রাখা হয়। কিন্তু আইনের সাধারণ প্রকৃতি অনুযায়ী অল্পকালের মধ্যেই চুক্তিগুলোর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কাজেই এমন একদিন আসবেই যখন এসব দেশকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। দশ বছর অন্তর অন্তর চুক্তির মেয়াদ নতুন করে বাড়িয়ে নিলেও আইনের বিচারে একথাই সত্য।

শান্তি সম্পর্কীয় আইন-বিধির মত নিরপেক্ষতা আইনের দ্বারা সাময়িক উদ্দেশ্য হাসিল হত। সমগ্র পৃথিবীকে ইসলামীকরণের পূর্ব পর্যন্তই ছিল এর সক্রিয় ভূমিকা। পরবর্তীকালে অবশ্য জেহাদ স্তিমিত হয়ে আসে। কাজেই শান্তি সম্পর্কীয় আইন ও নিরপেক্ষতা আইন ততদিন পর্যন্ত বলবত থাকবে যতদিন পৃথিবীতে মুসলিম ও অমুসলিম পাশাপাশি বসবাস করবে বা সহাবস্থান করবে। নিরপেক্ষতা আইন কেবল আবিসিনিয়ার বেলায় এখনো প্রযুক্ত রয়েছে। সাইপ্রাস, নুবিয়া ও তর্কীদের বেলায় আর এ আইন খাটে না। কারণ, নুবিয়া (বর্তমান লিবিয়া) ও তুরস্ক ইসলামেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর সাইপ্রাস ১৫৭০ খৃস্টাব্দে উসমানীয়গণ কর্তৃক অধিকারের পর প্রায় তিন শতাব্দীকাল তাদের দখলে থাকে। আবার ১৮৭৮ সনে সাইপ্রাস খৃস্টানদের দখলে চলে যায়। যদি নিরপেক্ষতা রাখার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তবে নিরপেক্ষতা আইন যে আবার পুনরুজ্জীবিত করা যাবে না, এমন কোন কারণ নেই।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
শেষ কথা

মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের ওপর পাশ্চাত্যের প্রভাব

মধ্যযুগীয় খিলাফতের অবসানের পর আইনের ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন সাধিত হয়, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে সাধারণ মুসলিম আইনবিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের অনুসন্ধান সম্পূর্ণ করা মেটেই অবান্তর হবে না। এসব পরিবর্তনের সময়েই ইসলামী রাষ্ট্র খৃস্টান রাষ্ট্রের সম্পর্কে আসে। এ প্রভাবের ফলে আইনের ক্ষেত্রে অনিবার্য পরিবর্তন এসেছে। এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করতে গেলে একখানি পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন। যে সব মৌলিক পরিবর্তন ও কারণ মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনকে মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা থেকে আধুনিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেছে, কেবল সেগুলো সম্পর্কেই এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করে হবে।

দারুল ইসলামের প্রকৃতিগত বিবর্তন

কার্যতঃ স্বাধীন আঞ্চলিক শাসকগণ এবং কখনো কখনো স্পেন ও মিসরের প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফারা বাগদাদের খলিফার কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ ও অস্বীকার করে। তবু আইনের দৃষ্টিতে দারুল ইসলামের ঐক্য অক্ষুণ্নই ছিল। কারণ, স্বাধীন প্রাদেশিক শাসকগণ আব্বাসীয় খলিফাদের সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নিতেন। কিন্তু স্পেন ও মিসরের খলিফারা নিজ নিজ রাষ্ট্রে কেবল সীমাবদ্ধ আনুগত্যই দাবী করতে পারতেন। ইসলামী জগতের কার্যতঃ স্বাধীন শাসকদের মধ্যযুগীয় খৃস্টান জগতের স্বাধীন রাজাদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এসব স্বাধীন রাজাগণ তাঁদের ক্ষমতা লাভ করতেন সম্রাট বা পোপের নিকট হতে। বাইজান্টিয়ামের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাকে ফাতেমীয় মিসর বা উমাইয়া শাসিত স্পেনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ, যদিও বাইজান্টিয়াম পশ্চিমী সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে, তবু খৃস্টান জগতের আইনগত ঐক্য তার দ্বারা ব্যাহত হয়নি।

খৃস্টীয় ১২৫৮ সনে বাগদাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দারুল ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন থেকেই ইসলামের আইনগত ঐক্যের প্রতীক আর বিদ্যমান রইল না; (অবশ্য ক্রীড়নক আব্বাসীয় খলিফা কায়রোতে অবস্থান করতেন। তাঁর মামলুক প্রভুরা ভিন্ন তাঁকে আর কেউ বড় একটা মানত না)। আর সেই সঙ্গে

শরিয়ত রূপায়িত করার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বও বিলুপ্ত হল। মোঙ্গল অভিযানকারীরা ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননি। তবে, তাঁরা বিদেশী শাসক হিসেবে মুসলিম রাষ্ট্রকে নিজেদের রাষ্ট্রনীতি ও আইন ব্যবস্থার আলোকেই পরিচালিত করেছেন। এমন কি, গজনীর বাদশাহ সুলতান মাহমুদ (খৃষ্টীয় ১২৯৫-১৩০৪) ইসলাম ধর্ম কবুল করার পরও ইসলামী আইন ছাড়া মোঙ্গল আইনের বিধান অনুসারেও ফরমান জারী করতেন। পরবর্তী যুগে সালজুক ও উসমানীয় সুলতানগণ তাঁর এ রীতিরই অনুসরণ করেন। দারুল ইসলামের যে অংশ তাঁদের অধীনে ছিল, সেখানে শরিয়তের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আইন ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে।

আব্বাসীয়-খিলাফতের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং লোকায়ত শাসকের উদ্ভব হয়। এরা দু'শতাব্দী ধরে ক্ষমতার লোভে নিজেদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা করে শেষে বিলুপ্ত হয়। এর ফলে, দারুল ইসলাম কয়েকটি বৃহৎ রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, উসমানীয় সুলতানগণ ইউরোপে তাঁদের প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার পর প্রাচ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান শাসকদের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করেন। ইরানে শাহ্ ইসমাইল সাফাবী (১৫০০-১৫২৫) কর্তৃক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্বদিকে উসমানীয়দের ক্ষমতা বিস্তার ব্যাহত হয়। শাহ্ ইসমাইল শিয়া মযহাবকে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে ঘোষণা করেন। ইরানে শিয়া আইন বিধান রূপায়ণের ফলে ইসলামের অভ্যন্তরীণ বিরোধ আরও জোরদার হতে থাকে। আগে থেকেই এ বিরোধ পাকাপাকি হয়ে এসেছিল। এর ফলে দারুল ইসলাম তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত হয়ে যায় ঃ (১) উসমানীয় রাষ্ট্র (যার মধ্যে ইউরোপের কয়েকটি রাষ্ট্র ও পশ্চিম এশিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল); (২) সাফাবী কর্তৃত্বাধীনে ইরান; এবং (৩) মোগলদের অধীনে মধ্য এশিয়া ও ভারতীয় উপমহাদেশ। দারুল ইসলাম বিভক্ত হবার ফলে মুসলিম-রাষ্ট্রের ধারণাও বিবর্তিত হতে থাকে। এর ফলে সার্বজনীন মুসলিম রাষ্ট্র জাতীয় মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হল। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে পশ্চিমী ধারণা এ প্রবণতাকে আরও অনেকখানি বাড়িয়ে দিল।

দারুল ইসলাম বিভিন্ন রাজনৈতিক ভূখণ্ডে বিভক্ত হবার ফল হল মারাত্মক। এতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পাশ্চাত্য প্রভাব মুসলিম দেশগুলোতে বিস্তার লাভ করতে থাকে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, উসমানীয়দের রাজ্য বিস্তারের ফলে 'ইসলামী' রাষ্ট্রের সীমানা খৃস্টান দেশগুলোতে গিয়ে ঠেকেছিল; এ অবস্থায় দখলীকৃত কতকগুলো জায়গা থেকে ইসলামী রাষ্ট্রকে সরে আসতে হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আবার খৃস্টানদের হাতে স্পেনের পূর্ণ কর্তৃত্ব চলে যায়। অন্যদিকে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে ভারতে গমনের নতুন পথ আবিষ্কৃত হওয়ার পর ভারত মহাসাগরে পর্তুগীজদের গতিবিধি লোহিত সাগরের মাধ্যমে পরিচালিত মুসলিম বাণিজ্যে চরম আঘাত হানে। অতঃপর পূর্ব আফ্রিকা ও পারস্য

উপসাগরে পর্তুগীজগণ কতকগুলো বাণিজ্য কেন্দ্র দখল করে। এতে কয়েকটি মুসলিম ভূখণ্ড তাদের অধীনে এসে পড়ে। ফ্রান্স ও বৃটেন পর্তুগীজদের পদাংক অনুসরণ করে এবং খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরে তাদের তৎপরতার ফলে আরও কতিপয় মুসলিম দেশ তাদের অধীনে চলে আসে। ফরাসী কর্তৃত্ব উৎখাত করার পর বৃটেনই ইরানের পূর্বদিকের সমস্ত মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর শাসন ক্ষমতা লাভ করে (মধ্য এশিয়া পরে রাশিয়ার অধীনে চলে যায়)। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ শাসনের মাধ্যমে বৃটেন পারস্য উপসাগর, আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ উপকূল ও পূর্ব আফ্রিকায় তার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা ও শেষে পতনের ফলে আরও কতকগুলো মুসলিম রাষ্ট্র বৃটেনের করতলে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ভারত মহাসাগর থেকে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়; তবে উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকায় কর্তৃত্ব বিস্তার করে।

উসমানীয় শাসন ঃ ইসলাম কর্তৃক খৃস্টান জগতের আইনগত স্বীকৃতি

উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলিম আন্তর্জাতিক আইনের বিবর্তনে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। উসমানীয় সুলতানগণ উদারপন্থী হানাফী মযহাবকেই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দান করেন। তাছাড়া, তাঁরা তুর্কী আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির ওপর ভিত্তি করে ফরমান জারী করার প্রাচীন তুর্কী প্রথাও চালু রেখেছিলেন। এ ফরমানগুলোর আইনগত মর্যাদা নিতান্ত সামান্য ছিল না। ফরমানগুলো প্রায়ই আইন পুস্তকে সংযোজিত হত। এগুলোকে বলা হত 'কানুন-নামা'। শরিয়তের পাশাপাশি এই কানুনগুলো আইনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করত। আইনের ব্যাপারে কানুন শরিয়তকে ছাড়িয়ে যেতে পারত না। কিন্তু কার্যতঃ, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার তাগিদে শরিয়ত কানুন দ্বারাই অনেকখানি পরিবর্তিত হয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে সুলতানগণের পক্ষে বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে নতুন রীতি-নীতি প্রবর্তন করা সম্ভব হয়।

পশ্চিমী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উসমানীয় সুলতানগণ খৃস্টান জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদার নীতি অবলম্বন করেন। কারণ, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে যাবার নতুন পথ আবিস্কৃত হওয়ায় ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্যে ভাঁটা পড়তে থাকে। মিসরের মামলুকগণ ও বিজয়ী বীর মুহাম্মদ পূর্বেই পশ্চিমী সওদাগরদের প্রতি ঔদার্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করেন। তাই ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত চুক্তি পশ্চিমী ব্যবসায় এবং উসমানীয় (মুসলিম) রাষ্ট্রে বিদেশীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কিত সাধারণ নীতি প্রচলিত ব্যবস্থাকেই জোরদার করে।

ইসলামের সঙ্গে খৃস্টান জগতের সম্পর্ক নির্ণয়ে এ চুক্তি কতকগুলো নতুন বিষয়ের অবতারণা করে। চুক্তির প্রস্তাবনায় ফ্রান্সের রাজা ও তার প্রতিনিধিদের সুলতান সুলেমান ও তার প্রতিনিধিদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে স্বীকৃতি দান করা হয়। চুক্তিটির প্রথম ধারায় সুলতান ও ফরাসী রাজার মধ্যে তাঁদের জীবদ্দশায় আইনগত ও অব্যর্থ শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা রয়েছে। এতে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রে নাগরিকদের (অর্থাৎ ফরাসী ও উসমানীয়) পারস্পরিক অধিকারের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফরাসীরা জিযিয়া থেকে রেহাই পেলো এবং তাদের নিজেদের ধর্ম পালন করার অধিকারসহ নিজেদের কনস্যুলেট দ্বারা আইনের অধীনে বিচারের অধিকার লাভ করল। ফ্রান্সের রাজাকেও এই সব অধিকার দেয়া হল ঃ

> "ফরাসী দেশের রাজা কন্সট্যান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) বা পেরা বা সাম্রাজ্যের অন্য যে কোন স্থানে আলেকজান্দ্রিয়াস্থ তাঁর বাণিজ্য প্রতিনিধির অনুরূপ একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবেন। উপরোক্ত প্রতিনিধিকে সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা করতে হবে ও যথোপযুক্ত কর্তৃত্ব দান করতে হবে যাতে তিনি তার অঞ্চলে কর্তব্য সম্পাদনে অন্যান্য বিচারক বা কাজী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হন; এবং তিনি তাঁর নিজের ধর্ম ও আইনের আলোকে ফরাসী সওদাগর ও ফরাসী রাজার প্রজাদের মধ্যে সংঘটিত বিরোধের ব্যাপারে সব দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা ও মোকদ্দমার বিচার করতে পারবেন। সওদাগরগণের অনুরোধ সত্ত্বেও সুলতানের কাজী বা অন্যান্য কর্মচারীগণ ফরাসী বণিক ও ফরাসী রাজার প্রজাদের মধ্যে মামলার মীমাংসা করতে পারবেন না। আর যদি কাজীগণের আদালতে কোন মামলার শুনানী হয়, তবে তাদের রায় বেআইনী বলে গণ্য হবে।" (দ্বিতীয় ধারা)।

স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন শত্রুর সঙ্গে দশ বছরের বেশী মেয়াদে শান্তি স্থাপন করা অনুমোদন করে না। উসমানীয় কার্যবিধি এ নিয়মের পরিবর্তন সাধন করে এবং সুলতানের জীবদ্দশা অবধি এর মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া, ১৫৩৫ সনের চুক্তি উভয়পক্ষের সাম্য ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তি স্বীকার করেছে। অনেক লেখকের মতে এটা হল ফরাসী রাজার প্রতি প্রদত্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার নজির। পরে অবশ্য অন্যান্য খৃস্টান রাজাদেরও অনুরূপ মর্যাদা দেয়া হয়। চুক্তির ১৫ ধারায় অবশ্য লেখা আছে যে, এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য রাজাদেরও দেয়া হবে। এ ধারাটি এইরূপ ঃ

> "ফ্রান্সের রাজা প্রস্তাব করেছেন যে, মহামান্য পোপ, ইংল্যান্ডের রাজা ও তাঁর ভাই, স্থায়ী মিত্র এবং স্কটল্যান্ডের রাজা স্বেচ্ছায় এ শান্তিচুক্তিতে মিত্র হিসেবে শরিক হতে পারেন। চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে তাঁদের অবশ্যই আট মাসের মধ্যে মহান সুলতানের কাছে চুক্তি সম্পর্কে তাঁদের অনুমোদনপত্র পাঠাতে হবে এবং তাঁর স্বীকৃতি লাভ করতে হবে।"

উপরোক্ত রাজাগণ এ চুক্তিতে শরিক না হলেও (ইংল্যান্ড সুলতানের সঙ্গে ১৫৮০ সনে এক পৃথক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়) সুলতান এই নীতি প্রতিষ্ঠা করলেন যা অন্যান্য খৃস্টান রাজাদের প্রতিও প্রযোজ্য হবে।

১৫৩৫ সনের চুক্তি ইসলামী আইনের আর একটি নীতিকে বদলে দেয়; তা হল, অমুসলমানদের (এক বছরের বেশী দারুল ইসলামে বাস করলে) জিযিয়া থেকে রেহাই দেয়া। ১৮৩৯ সন পর্যন্ত সুলতানের অমুসলিম প্রজাগণ এ শুল্ক প্রদান করে আসে। ওই শুল্ক তুলে দেয়া হয়। বিচারের ক্ষেত্রে ফরাসীদের নিজেদের কনস্যুলেটের অধীনে আসবার অধিকারের ব্যাপারে চুক্তির মধ্যে আইনের ব্যক্তি সম্পর্কিত দিকটায় সাধারণ নীতিই পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে কতকগুলো চুক্তির দ্বারা এ নীতি পাল্টে যায় (বিশেষ করে ১৭৪০ সনের চুক্তি)। এ নতুন পরিবর্তন অনুসারে বিদেশীদের সঙ্গে মুসলমানগণ যে সব মামলা-মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট, তা বিদেশী কনস্যুলেটের আওতায় এসে পড়ে। ফলে এসব ব্যাপারে ইসলামী আইন প্রযোজ্য হওয়ার সাধারণ নীতি অনেকখানি বদলে গেল।

১৫৩৫ সনের চুক্তিটি এমন সময়ে সুসম্পন্ন করা হয়, যখন সবেমাত্র আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ শুরু হয়েছে। এ চুক্তিটি বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ণয়ে খৃস্টান ও মুসলিম আইনের সমন্বয়ের ব্যাপারে এক অভূতপূর্ব সুযোগ দান করে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পর ঐতিহাসিক বিবর্তনে খৃস্টান জগত ও ইসলামী জগতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারার সৃষ্টি হয়। ফলে এ দুই জগতের মধ্যকার আইন ব্যবস্থাও আলাদা হয়ে যায়। নীচে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি খৃস্টান জগতের মনোভাব

খৃস্টান জগত ও ইসলামী জগতে বিরোধমূলক স্বার্থের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বনের উপযুক্ত মুহূর্ত ছিল ১৫৩৫ সনের চুক্তি সম্পাদনের সময়। চুক্তিটির বাণিজ্য সম্পর্কীয় ধারাগুলো পশ্চিমী ব্যবসায়ীদের কাছে খুব বেশী আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু যেসব রাজনৈতিক কারণে চুক্তিটির জন্ম হয়, তার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্কের কোন সম্বন্ধ ছিল না। ফরাসী-রাজ ফ্রান্সিসের তাঁর খৃস্টান প্রতিদ্বন্দ্বী পঞ্চম চার্লসের বিরুদ্ধে সমর্থন লাভের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আর অন্যদিকে ভিয়েনা আক্রমণে অকৃতকার্য (১৫২৯) হওয়ার পর খৃস্টান রাজাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে সুলেমান তাঁর বিরুদ্ধে জোট ভেঙ্গে দেবার চেষ্ট করেন। অন্যান্য খৃস্টান রাষ্ট্রের জন্যেও এ চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার দ্বার খোলা রাখা হলেও ইসলামী জগত ও খৃস্টান জগতের মধ্যে মোটেই সমঝোতা সম্ভব হয়নি। কোন খৃস্টান রাজাকে সুযোগ-সুবিধা দানের আইনগত ভিত্তি সাম্যনীতি ও পারস্পরিক স্বার্থের ওপর নির্ভর করত না। আইনের

ব্যক্তি সম্পর্কিত ভিত্তির ওপরেই ছিল এর প্রতিষ্ঠা। এর ফলে মুসলিম রাষ্ট্রে বাস করার সময় অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকগণও কতকগুলো সুবিধা লাভ করতেন।

যে সব ধর্মীয় বিষয় খৃস্টানদের জীবনের মূল নিয়ামক ছিল, সেগুলোতে কোন অখৃস্টান শক্তির যোগদানকে সংস্কার আন্দোলনের (Reformation) যুগে ইউরোপের লোকেরা বরদাশত করতে চায়নি। উসমানীয় সাম্রাজ্য ছিল একটা "মুসলিম" রাষ্ট্র। তাই খৃস্টান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তা বিদেশী উপকরণ বলে গণ্য হত। কোন কোন খৃস্টান রাজা ১৫৩৫ সনের চুক্তিকে খৃস্টান ধর্মের আইনের খেলাফ বলে মনে করতেন, যদিও সম্রাটের অধীনে ও খৃস্টান আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মধ্যযুগীয় সার্বজনীন খৃস্টান রাষ্ট্রের চিন্ত াধারা তখন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে।

যে সব ইউরোপীয় আইনবেত্তা ও আন্তর্জাতিক আইনবিদ ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব ও জাতিসমূহের সাম্যের ওপর ভিত্তি করে নতুন আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করার জন্যে সুপারিশ করেছেন, উসমানীয় সুলতানদের প্রতি তাঁদের মনোভাবে বিশেষ কোন পরিবর্তন আসেনি। খৃস্টান জগতের সাধারণ প্রচলিত মতানুসারে একথা ধরে নেয়া হয় যে, উসমানীয় সাম্রাজ্য নব বিবর্তিত আন্তর্জাতিক আইনের এলাকার বাইরে। আলবেরিকাস জেন্টিলিস (১৫৫২-১৬০৮) তথাকথিত ধর্মীয় যুদ্ধ পছন্দ করতেন না; এবং তিনি রেড ইণ্ডিয়ানদের ওপর স্পেনের আক্রমণের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি কিন্তু তুর্কীদের সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তুর্কীদের সঙ্গে মিত্রতামূলক চুক্তি সম্পাদনের জন্য তিনি প্রথম ফ্রান্সিসের সমালোচনা করেন। কারণ, তাঁর মতে খৃস্টান ও অখৃস্টান বাদশাহদের মধ্যে সমঝোতা বরদাশত করা যায় না। এমন কি, আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের বিশিষ্ট দিকপাল গ্রোসিয়াস পর্যন্ত অখৃস্টান রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে পার্থক্যমূলক ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন; অথচ তিনি প্রাকৃতিক নিয়মকে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তিতে খৃষ্ট ধর্মের বিরোধী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন তিনি মেনে নিতেন। তবু তাঁর মতে খৃস্টান শাসকগণ খৃষ্টধর্মের দুশমনদের বিরুদ্ধে এক জোট হয়ে কাজ করবেন। তাই গোড়ার দিকে কেবল খৃস্টান জাতিগুলোর সম্পর্ক নির্ণয়ের তাগিদেই আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের আদর্শ ও বুনিয়াদ গড়ে ওঠে, যা খৃস্টান সভ্যতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ইউরোপে তুর্কী সমস্যা ভাবপ্রবণ ইউরোপীয় লেখকদেরও উদ্বেগের কারণ ঘটে এবং এ নিয়ে তাঁরা অনেক পানি ঘোলা করেন। এঁরা খৃস্টান জগতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। খৃস্টান রাজাদের বিরোধ দূর করে শান্তি স্থাপনের জন্য খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কতকগুলো পরিকল্পনা পেশ করা হয়। মধ্যযুগের ডুবীয় (Dubois) পরিকল্পনার মত প্রায় সবগুলোতেই খৃস্টান রাজাদের কাছে এই আবেদন জানানো হয়েছে যে, তাঁরা যেন নিজেদের মধ্যকার সব বিরোধ ভুলে গিয়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে সমবেত হন। ডব্লিউ, পেন (W. Penn) বলেন, ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর শান্তি

পূর্ণ পারস্পরিক সমঝোতার প্রাথমিক ভিত্তি হল তুর্কীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা। লিবনিয (Lebnitz) চতুর্দশ লুইকে হল্যান্ড আক্রমণ না করে মিসর দখলের পরামর্শ দেন। অবশ্য, এমেরিক ক্রুস (Emeric Cruce) ও অ্যাবে ডি সেন্ট পিয়ার (Abbe De Saint Pierre) তাঁদের সম্মিলিত রাষ্ট্রসংস্থার পরিকল্পনায় তুর্কীদের বাদ দেননি। সেন্ট পিয়ার বলেন যে, এ ধরনের সম্মিলন হলেই যে সব ধর্মেও মিলন হবে, এমন নয়। তবে এতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। তুর্কীদের বাদ দিয়ে খৃস্টান জগতের মধ্যে শান্তি স্থাপনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা হল কার্ডিন্যাল আলবেরনীর (Alberoni) পরিকল্পনা। আলবেরনী স্পেনের উজীরে আযম ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি ১৭৫৩ সনে লুজানে একখানা বই প্রকাশ করেন। এর নাম হল ঃ Testament Politique du Cardinal Jule Alberoni. এতে তিনি ইউরোপের সব খৃস্টান-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে এক সাধারণ পরিষদ গঠন করার প্রস্তাব করেন যাতে খৃস্টান জগতের সমস্ত সাধারণ সমস্যা নিয়ে এখানে আলোচনা করা যায়। কিন্তু কার্ডিন্যাল আলবেরনী মনে করতেন যে, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার পূর্বে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলোকে একত্রিত হয়ে ইউরোপ থেকে তুর্কীদের বিতাড়িত করতে হবে। তিনি জার্মান ও ইংরেজী ভাষাতেও একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এর নাম হল ঃ Cardinal Alberoni's Scheme for Reducing the Turkish Empire to the Obedience of Christian Princes (London, I736). "শান্তি" সম্পর্কীয় তাঁর সাধারণ পরিকল্পনায় তিনি বলেন ঃ

> "মনে হয়, খৃস্টান ইউরোপের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্যেই উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁদের ভূখণ্ড রক্ষার্থে জার্মানীর সম্রাটদের খুব বেশী মনোযোগী হওয়া উচিত এবং সেদিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত। সব খৃস্টান রাজাকে একত্রিত করে তুর্কী সাম্রাজ্য জয় করা সম্ভব হবে। জার্মানীর অস্ট্রীয় রাজবংশের অধীনে যে সব ভূখণ্ড আছে, তার কিছু কিছু এ সব রাজাদের দিতে হবে। প্রাচ্য দেশে অগ্রসর হওয়ার জন্যেই তাদের এ পুরস্কার দেওয়া হবে।...
>
> "মনে হয়, এ পরিকল্পনা রূপায়িত হলে অস্ট্রীয় রাজবংশ ও বুরবন রাজবংশের মধ্যকার সমস্ত কলহ ও বিবাদ দূর হয়ে যাবে। ফলে তারা খৃস্টান জগত থেকে বিধর্মীদের বিতাড়িত করতে পারবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সব বিরোধের মীমাংসা করতে পারবে, সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, জাতিসমূহের মধ্যে শিল্প প্রসারের তাগিদে সাম্যের ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন করতে পারবে; এবং শান্তিপূর্ণভাবে তারা যদি নিজস্ব রাষ্ট্রের ওপর অধিকার পায়, তবে অনিশ্চয়তা ও হিংসাপূর্ণ অবস্থার ফলে উদ্ভূত যুদ্ধ ও যুদ্ধ-ভীতি থেকে তাদের প্রজাদের বাঁচাতে পারবে। তারা নিজেদের শক্তি সংগঠন এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সমর-

কৌশল প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ করবে; আর খৃস্টানদের রক্তক্ষয় থেকে রেহাই পেয়ে বিবেকের দংশন থেকেও তারা মুক্তি পাবে। প্রকৃতপক্ষে, অস্থিরচিত্ততাই পরবর্তী যুগে কয়েক শতাব্দী ধরে খৃস্টানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য দায়ী।"

এ থেকে এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নের খাতিরে সাম্য ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে ইসলামী জগত বা খৃস্টান জগত কোনটিই এককভাবে বিষয়টির মোকাবেলা করতে চায়নি এবং একটি সাধারণ সমবায়ে মিলিত হয়ে তাদের ধর্মীয় নীতিতে একে খাপ খাইয়ে নিতে চায়নি। অবিশ্বাস ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাবের ফলে ইসলামী জগত ও খৃস্টান জগতের মধ্যে সমঝোতা সম্ভব হয়নি। বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা ম্যাকিয়াভেলীয় ও জোর-জবরদস্তিমূলক নীতি অনুসরণ করতেন। উসমানীয় সুলতানদের দরবারে প্রেরিত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ উৎকোচ ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করতেন। আবার উসমানীয় উজীরগণ ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতদের ভীতি প্রদর্শন করে ও অসদ্ব্যবহার করে তাঁদের কাছ থেকে জোর করে রাষ্ট্রীয় তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালাতেন। এ পরিস্থিতির ফলে খৃস্টান জগত ও ইসলামী জগতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুলেমান ও প্রথম ফ্রান্সিসের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের চেয়ে বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি।

উসমানীয় সাম্রাজ্য ও আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের উন্নয়নের ধারাটি আরও জোরদার হতে থাকে। এ সময়ে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন (Reformation) সার্বজনীন রাষ্ট্রের ধারণাকে বরবাদ করে দেয়। তখন যে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম হয়, তা শক্তি সাম্যের (Balance of power) ভিত্তিতে ও আন্তর্জাতিক আইনের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হত। উসমানীয় সাম্রাজ্য ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জের বাইরেই ছিল। এর কারণ আগেই বলা হয়েছে। পরবর্তী দু'শতাব্দী ধরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এ ব্যবস্থা দ্বারাই নির্ণীত হয়েছে। ইউরোপীয় আইন ব্যবস্থার মধ্যে যদি উসমানীয় সাম্রাজ্যকে একীভূত করে নেয়া সম্ভব হত, তবে গোড়া থেকেই আন্ত র্জাতিক আইন সার্বজনীন পর্যায়ে উঠতে পারত।

ইউরোপের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি আর আইন ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষীকরণের সঙ্গে সঙ্গে উসমানীয় শক্তির পতন ঘনিয়ে আসে। সুলতানগণ তুরস্কে পাশ্চাত্যের অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক কলাকৌশল অতিসত্বর চালু করেন; কিন্তু সেইভাবে পাশ্চাতের রাষ্ট্রনীতি এবং আইনের নতুন নতুন প্রত্যয় ও ধারণা তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা এগুলো গ্রহণ করতে পারলে "ইসলামী" জগত তখনই আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হ'তে পারত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে 'ইসলামী' জগতের সংঘর্ষে ইসলামের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের কাছে এ

পরাজয় অনেকটা আশ্চর্যজনক বোধ হয়েছিল। কারণ, তাঁরা সহজেই সামরিক ও কূটনৈতিক বিজয় লাভ করেন। ১৫৩৫ সালের চুক্তিটি ১৭৪০ সালে যেভাবে রদবদল করা হয়, তা থেকেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চুক্তির পরিবর্তন উসমানীয়দের পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক ছিল না। ১৭৭৪ সালে কুচুক কায়নরাজার সন্ধির ফলে সুলতানের খৃস্টান প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষমতা ফ্রান্স ও রাশিয়াকে দেয়া হয়। এর কারণ হল এই যে, মুসলিম সমাজের অবনতি এত দূর গিয়ে পৌঁছে যে তারা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলতে পারেনি। ইউরোপীয়গণ মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে খুব বিস্ময় বোধ করে। তাদের মতে, ইসলামী সভ্যতা এত "নীচু-দরের" হওয়া সত্ত্বেও কেন মুসলমানরা ইউরোপীয়দের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উৎকর্ষতা ও মুসলমানদের নিজেদের অবনতির কথা বুঝতে পারে না। এমতাবস্থায় ইউরোপীয় জাতিগুলো সরাসরি সুযোগ-সুবিধা লাভ করার জন্যই বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে; তারা ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কে সাম্য ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে সম্পর্ক নির্ণয় করার দিকে কোন খেয়ালই করল না। আন্তর্জাতিক আইন-বিধি ও কার্যধারা দূরে ফেলে দিয়ে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কূটনীতির আশ্রয় নিতে লাগল। আবার কূটনীতি ব্যর্থ হলে তারা শক্তি প্রয়োগে মেতে ওঠে। ফলে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যেমন মুসলিম দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক আইনের আওতার বাইরে বলে মনে করতেন, তেমনি ইউরোপীয়দের কবলে মুসলমানদের কোন ভূখণ্ড হস্তান্তরিত হয়ে থাকলে সেখানকার খৃস্টান শাসন মুসলমানরা স্বীকার করে নেননি। পক্ষান্তরে, ইউরোপীয়গণ আরো মনে করতেন যে, অনগ্রসর এলাকা হিসেবে এ সব মুসলিম অঞ্চলে যুদ্ধ আইনের নীতিগুলো প্রযোজ্য নয়। খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা দেবার মত মুসলিম ভূখণ্ড দখল করাও ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রশংসাজনক কাজ বলে মনে করা হত।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ নিয়ে যখন ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয় এবং এর ফলে ইউরোপে শান্তিভঙ্গের আশংকা ঘটে, তখন আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় তুর্কী সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষার্থ উসমানীয় সুলতানকে ইউরোপীয় জাতিপুঞ্জের মধ্যে সাদরে আহ্বান জানানো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ভিয়েনা কংগ্রেসে (১৮১৪-১৫) যখন এ আমন্ত্রণের কথা ওঠে, তখন রাশিয়া তাতে আপত্তি জানায়; কারণ, তুরস্ক নাকি "বর্বর" দেশ।

অনেকদিন ধরে তুরস্ক ইউরোপের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এসেছে। তবু তুরস্ককে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আনা সম্পর্কে আইনবিদগণ একমত হতে পারেননি। ইউরোপীয় রীতিনীতির মানের তুলনায় তুর্কী তার কর্তব্য সমাধা করতে পারবে কি না সে সম্পর্কে অনেক আইনবেত্তাই সন্দেহ প্রকাশ করেন। Hurtige Hane নামক বইতে স্যার উইলিয়াম স্কট বলেন যে, আন্তর্জাতিক আইন পুরোপুরিভাবে ইউরোপের বাইরের দেশগুলোর ওপর প্রয়োগ করা অনুচিত। কারণ, তাঁর মতে, "যে

সব লোক মরক্কো রাজ্যে বাস করে, তাদের পক্ষে ইউরোপীয় রাষ্ট্রে অনুসৃত আন্তর্জাতিক আইনের সব নিয়ম-কানুন পালন করা খুবই কঠিন হবে। অনেক দিক থেকেই তাদের ইউরোপীয় বণিকদের সমপর্যায়ভুক্ত মনে করা যায় না। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের কোন কোন বিষয়ে নীতিগুলো অনেকখানি শিথিল করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নিবিড় ও অবিরাম আদান-প্রদানের ফলেই এ রীতি-নীতি গড়ে উঠেছে।"

স্যার উইলিয়ম স্কট তাঁর The Madonna del Burso নামক বইতে আরও সাধারণভাবে ওই একই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন ঃ

"ওই সব দেশের (উসমানীয় সাম্রাজ্যের) অধিবাসীরা আমাদের আন্তর্জাতিক আইনের রীতি-নীতি পালন করে না। তাদের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতির কথা বিবেচনা করেই আদালত আইনের (Public Law) কঠোর নিয়ম নিগড়ে তাদের বাঁধতে চাননি। এটা বহুবার ঘটেছে। কিন্তু ইউরোপীয়গণ বহুদিন ধরে পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয়ে এ সব আইনের বিধানই প্রয়োগ করে এসেছেন।"

লরিমার বলেন ঃ

"ইউরোপ ও এশিয়ায় অবস্থিত তুরস্ক আংশিক রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করবে। এছাড়া, এশিয়ার যে সব রাষ্ট্র ইউরোপের অধীনে আসেনি, তারাও আংশিক স্বীকৃতি পাবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ইরান ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, চীন, শ্যাম (থাইল্যান্ড) ও জাপান।"

লরিমার আরও বলেন ঃ

"এ সব দেশে কোন আইনবিদ পরিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ করতে পারেন না;...কিন্তু তিনি এটা নির্ধারণ করবেন যে, কোন্ বিষয়ে ও কোন্ কোন্ দিকে বর্বর ও অসভ্য মানুষরা আংশিক স্বীকৃতির আওতায় আসে।"

আইনগত অস্বীকৃতির ভিত্তি পর্যালোচনা করে লরিমার দেখিয়েছেন যে, এ বিষয়গুলোই অস্বীকৃতির কারণ নির্দেশ করে ঃ অপরিণত বয়স, শারীরিক ও মানসিক দৌর্বল্য, অপরাধ-প্রবণতা ও জাতিতে জাতিতে ধর্মীয় বিরোধ। তিনি বলেন ঃ "যে ধরনের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক হতে পারে, তুর্কী জাতি সম্ভবতঃ সেদিক দিয়ে অনুপযুক্ত।" কিন্তু ধর্মীয় বিরোধের ওপরই তিনি বেশী জোর দেন।

টি. ই. হল্যান্ড ও ডব্লিউ ই. হল ধর্মকে বাদ দিয়ে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের ওপর ভিত্তি করেই পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতির বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। তাঁরা বলেন যে, এ অবস্থা কেবল অন্তর্বর্তীকালীন সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে। কেননা, শেষ পর্যন্ত ইউরোপের বাইরে অবস্থিত দেশগুলোকে জাতিপুঞ্জের সদস্য হিসাবে গণ্য করতে হবে।

অপর একটি মতবাদের আইনবিদগণ বলেন যে, যেহেতু উসমানীয় সাম্রাজ্য কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও চুক্তি সম্পাদন করে এসেছে, তাই মোটামুটি আন্তর্জাতিক আইন তাদের প্রতি প্রযোজ্য। তবু উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলমান জাতিগুলো যে আন্তর্জাতিক আইনের পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছিল, এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৪৫ সনে হোয়েটন এ কথাই বলেছিলেন ঃ

> "খৃস্টান ও মুসলিম শক্তিবর্গের পরস্পর সম্পর্ক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কখনও কখনও খৃস্টানগণ মুসলমানদের আইন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। আবার কখনও-বা তাঁরা মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে খৃস্টান আন্ত র্জাতিক আইনে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ক্ষতিপূরণ দিয়ে বন্দী মুক্তি দেয়া বা রাষ্ট্রদূতদের অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমানদের আইনই গ্রহণ করা হয়। বহুদিন ধরে অবিরাম আদান-প্রদানের ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে সব বিশিষ্ট রীতি-নীতি গড়ে উঠেছে, সেগুলো শিথিল বা অসম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, তুরস্ককে আন্তর্জাতিক আইনের এলাকার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা ক্রমপ্রসারণশীল জাতিপুঞ্জের সাথে সামঞ্জস্যহীন। ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হিসেবে তুরস্ক এমন এক আইনের আওতায় আসলো, যা ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে পূর্বেই বিকাশ লাভ করেছে। ১৮১৫ সনে ইউরোপীয় জোটের সদস্য হিসেবে যোগ দিতে না পারায় তুরস্ক আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় পূর্ণাঙ্গরূপে আসতে পারল না। কিন্তু ১৮৫৬ সনের জোটে যোগদান করতে পারায় এ আইনের সুযোগ-সুবিধা তুরস্ক পরিপূর্ণরূপে ভোগ করার অধিকার পেল। (অবশ্য নিজস্ব রাষ্ট্রে বিদেশীদের অধিকার (Capitulatory rights) তখনও বিদ্যমান ছিল; ১৯২৪ সনে এ অধিকার বিলুপ্ত হয়)। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ধীরে ধীরে এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছেন এবং ইউরোপীয় জোটে তুরস্কের প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে হোয়েটনের লেখা থেকে এ কথারই নজির মিলে ঃ

> "ইউরোপের খৃস্টান জাতিসমূহ এবং এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলমান ও পৌত্তলিক জাতিসমূহের মধ্যে সাম্প্রতিক আদান-প্রদানের ফলে মুসলমান ও পৌত্তলিকগণের মধ্যে নিজেদের বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির পরিবর্তে খৃস্টান জগতের নিয়ম-কানুন গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তুরস্ক, ইরান, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রদূত পাঠাবার ও পারস্পরিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রদূত আদান-প্রদান করার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ইউরোপের শক্তি-সাম্যের ব্যবস্থায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও ঐক্য

অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য হয়েছে। কাজেই এ অধিকার সম্প্রতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের সাথে এ সাম্রাজ্যের সাধারণ নিয়ম-কানুনের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। ফলে উসমানীয় সাম্রাজ্য খৃস্টান আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় এসে গিয়েছে।"

প্যারিস চুক্তির (১৮৫৬) ৭-ধারায় তুরস্কের "ইউরোপীয় আইন ও জোটে" প্রবেশ করা সম্পর্কে যে কথা আছে, তার অর্থ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য আইনবিদদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। অধিকাংশ আইনবিদ বলেছেন যে, এ ধারাটির মাধ্যমে তুরস্ক আন্তর্জাতিক আইনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে। এর দ্বারা শুধু তুরস্ক ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে স্থান পেয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে শরীক হবার বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন কথা খুব কম আইনবিদই বলেছেন। ধীরে ধীরে উসমানীয় সাম্রাজ্য আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্যারিসে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাতে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক আইনের বাইরে থাকার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্ন

উসমানীয় সাম্রাজ্যের পক্ষে ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হিসেবে স্থান পাবার বাধা-বিপত্তি আর রইল না। কিন্তু ইসলামকে ইউরোপীয় আইন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার সমস্যাটি অমীমাংসিতই রয়ে গেল। পশ্চিমের হিতৈষী ও মুসলিম উদারপন্থীগণ বহুদিন ধরে উসমানীয় সুলতানকে অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংগঠনের উপদেশ দিয়ে এসেছেন। তাঁরা মনে করতেন যে, এর ফলে উসমানীয় সাম্রাজ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে এবং আধুনিক রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে সুলতান তাঁর কর্তব্য সমাধা করতে পারবেন। কিন্তু সুলতান পাশ্চাত্যের নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক কৌশল গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন; কিন্তু তিনি পাশ্চাত্যের আইনের প্রত্যয় ও ধারণা গ্রহণ করতে চাননি। কারণ, তার ফলে মুসলিম আইন ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানাদি অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে যাবে বলে তিনি আশংকা করেন। এ সময়ে প্রাদেশিক অভ্যুত্থান, আঞ্চলিক স্বাধীনতার দাবী ও উদারনৈতিক দল কর্তৃক সংস্কারের দাবী অভ্যন্তরীণ সংকটের সৃষ্টি করে। রক্ষণশীলদের সন্তুষ্ট করা যেমন সুলতানের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, তেমনি রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিমী হিতৈষীদের পরামর্শও তিনি ফেলে দিতে পারেননি। উসমানীয় সাম্রাজ্যকে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক পন্থায় আধুনিকীকরণ করে শক্তিশালী করার গঠনমূলক নীতি মোটামুটিভাবে "তানযিমাত"বা সংস্কার আন্দোলন নামে পরিচিত। সুলতান ও নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রনীতিকদের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সংস্কার সাধন না করলে সাম্রাজ্য ধ্বংস পড়বে।

বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনায় সুলতান ইতিমধ্যেই কতকগুলো সাধারণ ইসলামী রীতি-নীতির পরিবর্তন করেন ও পশ্চিমী নিয়ম-কানুন গ্রহণ করেন। আধুনিক যুগের গোড়ার দিক থেকেই ইউরোপে স্থায়ী কূটনৈতিক মিশন পাঠানোর রীতি চলে আসছে। কিন্তু ষষ্ঠদশ শতক পর্যন্ত সুলতানের শুধু বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদেরই প্রবেশ করতে দেয়া হত। অষ্টাদশ শতকে সুলতান পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কূটনৈতিক প্রতিনিধি পাঠাবার রীতি স্বীকার করে নেন। ১৭৯২ সনের পর সুলতান নিজেই প্যারিস, লণ্ডন, ভিয়েনা ও বার্লিনে স্থায়ী কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

পাশ্চাত্যের রীতি অনুসরণ করে সুলতান দার্দানেলিস ও বসফরাস প্রণালীতে রাশিয়াকে প্রথম অবাধ নৌ-চলাচলের অধিকার দান করেন (কুচুক কাইনারজা চুক্তি, ১৭৭৪)। এরপর অন্যান্য শক্তিবর্গও এ অধিকার লাভ করে। প্রথমতঃ, বাণিজ্য জাহাজকেই এ অধিকার দেয়া হয়; কিন্তু পরে এ নিয়ম শিথিল করা হয়। ক্রমে ক্রমে অস্ট্রিয়া (১৭৮৪), ইংল্যান্ড (১৭৯৯), ফ্রান্স (১৮০২) ও প্রুশিয়া (১৮০৬) এ অধিকার লাভ করে। দার্দানেলিস ও বসফরাস প্রণালীতে বিদেশী যুদ্ধ জাহাজ প্রবেশ করতে না দেয়া উসমানীয় শাসকদের প্রাচীন রীতি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে কূটনৈতিক চাপের ফলে সুলতান এ অধিকার দিতে স্বীকৃত হন।

পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের চাপে খৃস্টান প্রজাদের অবস্থার উন্নয়নের ব্যাপারে উসমানীয় শাসনে আরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। খৃস্টান প্রজাদের 'রা'য়া' বলা হত ('জিম্মী'র বদলে 'রা'য়া ব্যবহৃত হত)। ফ্রান্স (১৭৪০), রাশিয়া (১৭৭৪) ও অন্যান্য রাষ্ট্র এ প্রজাদের রক্ষাকবচের অধিকার পায়। মহান সুলতানের দরবারে এদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করার ক্ষমতাও তাদের দেয়া হয়। "তানযিমাত" ফরমানের মধ্যে এসব দাবী দাওয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'খত-ই-শরীফ-গুলখানা' (৩ নভেম্বর, ১৮৩৯) থেকে শুরু করে অন্যান্য আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ নীতি রূপায়িত হয়। পরিশেষে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ এ সব অধিকারের চূড়ান্ত স্বীকৃতি দান করে একটি রাষ্ট্রীয় সনদে এগুলোকে সংযোজিত করেন (২৩ ডিসেম্বর, ১৮৭৬)। এ সব রাষ্ট্রীয় বিধানের মধ্যে বিবিধ আইনগত সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তানযিমাত বিধানসমূহ কিংবা ক্ষণস্থায়ী 'মিধাত-গঠনতন্ত্র' (১৮৭৬) কার্যকরী করা যায়নি। পাশ্চাত্য আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি গতানুগতিক ইসলামপন্থীদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে এসব সংস্কার আন্দোলন টিকে থাকতে পারেনি।

পাশ্চাত্যের নিয়ম-কানুন গ্রহণ করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সংস্কার সাধন সম্ভব হল না। কারণ, ইসলামের নামে সুলতানের স্বৈরাচারী শাসন চালানোর বিরুদ্ধে অনেক মুসলিম চিন্তানায়ক অধৈর্য হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা মুসলিম রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করতে লাগলেন। হামিদীয় আমলের (১৮৭৬-১৯০৯) শেষ নাগাদ নতুন যুব সম্প্রদায় পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। এঁরা আশা করছিলেন

যে, পাশ্চাত্যের ভাবধারা গ্রহণ করলে উসমানীয় রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। উদারপন্থীগণ বলতে লাগলেন যে, আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে ধর্ম অচল হয়ে গেছে এবং জাতীয়তাবাদই কেবল এর ভিত্তি হতে পারে। এ আন্দোলন গোপনে দানা বেঁধে ওঠে। আন্দোলনকারীরা সুলতান আবদুল হামিদকে ১৮৭৬ সনের অস্থায়ী শাসনতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করতে বাধ্য করেন। সুলতান আবদুল হামিদের সিংহাসনচ্যুতির (১৯০৯) সঙ্গে সঙ্গে প্যান ইসলামী যুগের অবসান হয়। "নব্য-তুর্কী দলের" (Young Turks) নতুন শাসনে জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত হয় এবং মন্ত্রিসভা কর্তৃক পরিচালিত দায়িত্বশীল সরকারের হাতে ক্ষমতা প্রদান করা হয় ও আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা হয়। এ কথাও ঘোষণা করা হয় যে, ধর্মের ভিত্তিতে কোন পার্থক্য নির্দেশ করা চলবে না এবং আইনের চোখে সব নাগরিকই স্বাধীন ও সমান বলে বিবেচিত হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র থেকে জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিতে এই পরিবর্তন ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা করে। কারণ, জাতীয়তাবাদ পশ্চিমী চিন্তাধারা থেকে জন্ম নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্ম দেয় এবং জাতিই যে ক্ষমতার উৎস এ নীতির প্রবর্তন করে। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় শরিয়তের একাধিপত্য লোপ পায়। কিন্তু এ পর্যায়ে ধর্মীয় ক্ষমতা থেকে লোকায়ত ক্ষমতা আলাদা করার কোন চেষ্টা করা হয়নি। আইন ও ক্ষমতা সম্পর্কে ভাবধারার সাথে ইসলামের সমন্বয় সাধনের বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনাও করা হয়নি।

ধর্মীয় ভিত্তি পরিত্যাগ করে জাতীয় ভিত্তি গ্রহণ করায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সূত্রপাত হল। উসমানীয় শাসনে দারুল ইসলামে এক সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদ এ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা ত-দূরের কথা, তাকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে ফেলে। দারুল ইসলামের বিচ্ছিন্নতা আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল, জাতীয়তাবাদ একে আরো ত্বরান্বিত করে দেয়। জাতীয়তাবাদের প্রভাবে নতুন রাষ্ট্রগুলোও আইনের ভিত্তিরূপে ইসলামকে পরিত্যাগ করল। তুরস্ক যেমন সম্পূর্ণভাবে শরিয়ত থেকে দূরে চলে গেল, তেমনি আরবীয় উপদ্বীপে শরিয়ত একই অবস্থায় রয়ে গেল। উর্বর হেলালী দেশগুলো (সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ইরাক ও ফিলিস্তিন) ও মিসর ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে গণ্য করে ইসলামের প্রতি মৌখিক আনুগত্য জানিয়ে একটা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। একই সঙ্গে এরা জাতীয় সরকার গঠন করে এবং বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে। বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আওতায় এসব রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে জাতিপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আইন ও রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষকরণ

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই আইন ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ভাবধারা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু মুসলিম আইন সংশোধনের বা মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলোর বিলোপ সাধনের কোন চেষ্টাই করা হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর উসমানী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং এর ফলে এক নব যুগের সূচনা হয়। তুরস্কে ও অন্যান্য নতুন রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের বিজয় নিশান উড়তে থাকে ও মুসলিম জগত "খিলাফত" সমস্যার সম্মুখীন হয়। মুসলমানরা ক্ষমতার ধর্মনিরপেক্ষকরণ পদ্ধতি গ্রহণ বা বর্জন করবে, এ মৌলিক প্রশ্ন খিলাফতের সঙ্গেই জড়িত ছিল।

গোড়ার দিকে কামালপন্থী সংস্কারবাদীগণ আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা আলাদা করার চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদকে (Grand National Assembly) দেয়া হয় এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতা খলিফার হাতেই থাকে। ১৯২৩ সালে সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদ কর্তৃক "খিলাফত ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব" নাম দিয়ে যে পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়, তাতে বলা হয়েছে যে, সত্যিকার খিলাফত খোলাফায়ে রাশেদার পর বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং পরে উমাইয়াগণ একে বাদশাহীতে পর্যবসিত করে। তাই, এক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদের কার্যক্রমের মধ্যে নতুন কিছু নেই। কারণ, কয়েক শতাব্দী ধরে খলিফাগণ সত্যিকার খলিফার গুণগত বৈশিষ্ট্য বর্জন করেন। তাছাড়া, (এ পুস্তিকার যুক্তি অনুসারে) আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পার্থক্য নির্দেশ একটা হাদিস থেকেও সমর্থিত হতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলে গেছেন যে, তাঁর ওফাতের পর খিলাফত মাত্র ত্রিশ বছর বহাল থাকবে; তারপর শুরু হবে বাদশাহী শাসন। নাসাফী এ হাদিসটির উল্লেখ করেছেন। কাজেই নব্য তুরস্ক গতানুগতিক খিলাফত জিইয়ে রাখার কোন আইনসঙ্গত বিধান খুঁজে পায়নি। রক্ষণশীলগণ এ ব্যাখ্যায় খুশী হতে পারেননি। তাই, তাঁরা কামালপন্থী সংস্কারপন্থীদের ঘোর সমালোচনা করতে থাকেন। অবশ্য খলিফা ঘোষণা করেন যে, তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না। ফলে সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদ এক বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণ করে খিলাফত বিলুপ্ত করে (১৯২৪); আর এর সঙ্গে সঙ্গে শরিয়তের বিধানও উঠে যায়। এভাবে তুরস্ক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

তুরস্কের কর্মপন্থা মেনে নেয়া হবে, না নতুন খলিফা নিয়োগ করা হবে, এ প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ, এককভাবে তুরস্ক কর্তৃক খিলাফতের বিলোপ সাধনের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু করেন। এ ব্যাপারে ১৯২৬ সনের মে মাসে কায়রোতে একটি 'খিলাফত সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় এবং ইসলামে খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করে একটা প্রস্তাব পাশ করা হয়। কিন্তু এ প্রস্তাব রূপায়ণের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। মক্কা (১৯২৬) ও জেরুযালেমেও (১৯৩১) আরও দুটো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—কিন্তু খিলাফতের প্রশ্নটি সম্বন্ধে কোন আলোচনা আর হল না।

বোধহয়, সমস্যাটি তখন পুরানো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিষয়টির ভবিষ্যতে আর কোন গুরুত্ব নেই মনে করলে ভুল হবে।

খিলাফতের বিলোপ সাধনে ইসলামী রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষকরণ করা হবে কিনা এ প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়ায়। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মিসরের শরিয়ত আদালতের বিচারক শেখ আলী আবদুর রাযিকের 'ইসলাম ও রাষ্ট্রনীতি' (ইসলাম ওয়া উসুলুল হুকম) বইখানা এ প্রসঙ্গেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সমর্থন ও খিলাফতের বিলোপ সাধনের স্বপক্ষে আবদুর রাযিক বলেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ইসলামকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন না। অবশ্য রাসূল (সঃ) রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তব্য পালন করে গেছেন। কিন্তু নবী হিসেবে তাঁর ধর্মীয় কার্যধারা এসব কাজ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। আল-কোরআন, হাদিস ও ইজমায় খিলাফতের ভিত্তি নিহিত রয়েছে বলে যে মতবাদ আছে, তিনি তা নস্যাৎ করে দেন। তিনি বলেন যে, খিলাফত সম্পর্কে বহু বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রমাণ্য-সূত্রে এর কোন মীমাংসা হয়নি। কাজেই ধর্মের সঙ্গে খিলাফত জুড়ে রাখা ও এর বিলোপ না করার যৌক্তিকতা তিনি অস্বীকার করতেন। কারণ, রাজনৈতিক কারণেই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আবদুর রাযিকের মতবাদের তাৎপর্য এই যে, এর ফলে শরীয়তের সীমার বাইরে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা করার ক্ষমতা লাভ করেন। এ ব্যাখ্যা যে কেবল কামালপন্থীদের কার্যধারাকে সমর্থন জানিয়েছে তাই নয়, যে দেশের (মিসর) আলেমদের "নিয়ন্ত্রণ পরিষদ" তাঁর মতবাদকে অগ্রাহ্য করেছে তার বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার সমর্থনও এর মধ্যে পাওয়া যাবে। আবদুর রাযিকের মতবাদ আলেমগণ নস্যাৎ করে দিয়েছেন ও তাঁর নাম ওলামা পর্যায় থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য, তখন এর বিরুদ্ধে কোন গঠনমূলক সমালোচনা করা হয়নি।

আবদুর রাযিকের মতবাদ নিয়ে বাকবিতণ্ডা কালে এক নব্য মিসরীয় যুবক প্যারিসে আইন পড়তেন। তিনি তাঁর ডক্টরেটের বিষয় হিসেবে "খিলাফতঃ প্রাচ্যদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের দিকে এর ক্রমোন্নয়ন" (The Caliphate : Its Development Toward an Oriental League of Nations) গ্রহণ করেন। ইনি হলেন ড. সানহুরী। রাজনৈতিক ক্ষমতা ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, আবদুর রাযিকের এ মতবাদ ড. সানহুরী খণ্ডন করেছেন। আধুনিক জীবনধারার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম আইন বিবর্তিত হতে পারে না বলে তিনি মনে করেন না। পূর্বেও খিলাফতের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে বিবর্তিত হয়ে তা প্রাচ্যদেশীয় জাতিপুঞ্জে রূপান্তরিত হতে পারে। ইসলাম থেবে রাজনৈতিক ক্ষমতা আলাদা করা সম্পর্কে তিনি আবদুর রাযিকের মতের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তিনি

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভিত্তি মেনে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আন্তর্জাতিক সমাজে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পূর্ণ ভূমিকা তিনি স্বীকার করেছেন।

তুরস্কের মত সর্বাঙ্গীন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থেকে শুরু করে আরবীয় উপদ্বীপের মত শরিয়তপন্থী রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রায় সব মুসলিম রাষ্ট্রই তাঁদের বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সম্মেলন, জাতিপুঞ্জ (The League of Nations) ও সম্মিলিতজাতিপুঞ্জ তাদের প্রত্যক্ষভাবে যোগদানের ফলে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের শান্তিমূলক সম-অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালতে দু'জন মুসলিম আইনবিদের নিয়োগের ফলে সমগ্র মুসলিম জগতে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। মুসলিম দেশগুলো আন্তর্জাতিক কমিশনগুলোতে কাজ করার অদম্য স্পৃহা দেখিয়েছে। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ মেনে নিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সমাজে একত্রিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এমন কি যে সব মুসলিম আইনবিদ ও ধর্মবেত্তা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ধর্মনিরপেক্ষকরণের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরাও ইসলামের বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ণয়ে গতানুগতিক মুসলিম আইন থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেছেন।

উপসংহার

রক্ষণশীলদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আইন ও ক্ষমতার ধর্মনিরপেক্ষকরণ এগিয়ে চলেছে। তবু কয়েকজন মধ্যমপন্থী চিন্তানায়ক তাঁদের জীবদ্দশায় যে সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে, সে সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেছেন। নিজেদের গৌরবময় অতীতের দিকে ফিরে তাকানো দোষণীয় নয়। কারণ, এতে মানসিক অসুস্থতা দূর হয় ও ভবিষ্যতে নব উদ্যমে কাজ করার যথেষ্ট উদ্দীপনা পাওয়া যায়। কোন কোন আধুনিক লেখক পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও রীতি-নীতি গ্রহণ করার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। কারণ, এর ফলে জাতীয় ঐতিহ্য, বর্তমান পরিবেশ ও অবস্থার দিকে মোটেই খেয়াল করা হয় না। পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে যে ফল পাওয়া গেছে, তা আশানুরূপ হয়নি। তাই এ চিন্তাধারা আরও জোরদার হয়েছে। অনেক সমালোচক পাশ্চাত্যের প্রভাবের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে তৎপর হয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন নতুন সামাজিক পরিবেশ পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা পত্তন করলে, তা পাশ্চাত্য দেশের মত ফলপ্রসূ না হবার সম্ভাবনাই বেশী। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে এঁরা মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের অনুপ্রবেশ ও পৃথিবীতে ইসলামের মর্যাদার অবনতির কথাও বলেন। কারণ, জাতীয় ভিত্তিতে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে এদের সংহতি বিনষ্ট হয়েছে ও কূটনৈতিক ব্যাপারে এরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি।

আধুনিক জগতে বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ায় ইসলামের সম্ভাব্য অবদান সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ ধরনের চিন্তাধারা দানা বেঁধে উঠেছে। এ চিন্তাধারাকে 'নব প্যান' ইসলামবাদ বলা চলে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ চিন্তাধারা একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সালের সিরীয় গঠনতন্ত্রে (১৯৫৩ সনের রূপান্তরিত গঠনতন্ত্রেও পুনরায় একথা উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সিরিয়া, মিসর ও ইরাকের দেওয়ানী আইন বিধিতে শরিয়ত আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এসব বিষয়ে এ ভাবধারাই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ গঠনতন্ত্র ও আইনবিধি রচনার সময় ড. সানহুরীর বই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৫৩ সালে ২ নভেম্বর তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এমন কি, তুরস্কও বর্তমানে ধর্মের বিরুদ্ধে বিধি নিষেধ শিথিল করেছে। ফলে ইসলামী পুনর্গঠনের অনুকূলে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইসলামী সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রনীতিকদের সফর বিনিময় ও আঞ্চলিক চুক্তি সম্পাদনে এক পুণর্জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সমাজে মুসলিম জোট হিসেবে সহযোগিতা করার বাসনা আজ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলো অবশ্য এটা ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন যে, বর্তমানে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক নীতি অনুসরণের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, আন্ত র্জাতিক সম্পর্কের সঙ্গে ধর্মীয় পরিবেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এবং তা জীবনের পরিবর্তিত পরিবেশে ইসলামের নিজস্ব কল্যাণ-পথের দিশারী হয়েছে।

পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলমানগণ দেখাতে চেয়েছেন যে, ইসলামী ও খৃস্টান জাতিগুলোর পারস্পরিক তাগিদে শরিয়ত আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের বিবর্তনে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার গোড়ার ইতিহাস এবং এর ক্রমপ্রসারের ধারার সংগে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার মৌলিক সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমাজ-ব্যবস্থার পতন ও বিকাশের যোগসূত্রের ধারাবাহিক পর্যালোচনাই এই বইটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ দিতে গিয়ে কাদ্‌দুরী প্রমাণ করেছেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে পাশ্চাত্য দার্শনিক টমাস হব্‌সের তিনশ' বছর আগে মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খাল্‌দুনই মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ-ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। ইসলামের আন্তর্জাতিক রূপ ও ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটা সামগ্রিক ছবি এ বইটিতে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি ও যুদ্ধের প্রশ্নটি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তু, প্রামাণ্য-সূত্র ও তথ্যাদি প্রধানত: গৃহিত হয়েছে— আল-কোরআন, হাদীস, ইসলামী-ইতিহাস ও রাষ্ট্র-দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, বিভিন্ন মায্‌হাবী বিধান ও ফিকাহ্ শাস্ত্র হতে। বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সুন্নাহ্ ও বিভিন্ন সনদ, সাহাবী ও খলিফাদের কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সময়কার পরিবর্তিত আইনের বিধান ছাড়াও ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম ইবনে হাম্বল, ইমাম বোখারী, ইমাম মোসলেম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইব্‌নে খালদুন, ইব্‌নে তাইমিয়া, ইব্‌নে হিশাম, বালাযুরী, আবু রুশ্‌দ, মাওয়ার্দী, নাসাফী, তাবারী, সারাখ্‌সী, ওয়াকিদী, ইয়াকুবী, তুরতুশী, শায়েবানী প্রমুখ প্রখ্যাত ইসলামী শাস্ত্রবেত্তা ও দার্শনিক মনীষিদের লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থাদি এবং অভিমত হতেও তথ্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে।